HISTORY OF EUROPE AND WORLD
1760 AD TO 1871 AD

BA [History]

Fifth Semester

[BENGALI EDITION]

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr Manvendra Kumar
Associate Professor, Aligarh Muslim University, Aligarh

Authors

Dr Syed Mubin Zehra
Units: (1.3-1.4, 2.2, 3.3, 4.2-4.3) © Dr Syed Mubin Zehra, 2017

Dr M Waseem Raja
Units: (1.5, 3.2, 3.4) © Dr M Waseem Raja, 2017

Jaideep Majumdar
Units: (2.4-2.5) © Reserved, 2017

Dr Shreeparna Roy
Units: (2.6-2.7, 4.4-4.5) © Dr Shreeparna Roy, 2017

Vikas Publishing House
Units: (1.0-1.2, 1.6-1.10, 2.0-2.1, 2.3, 2.8-2.12, 3.0-3.1, 3.4.1-3.4.2, 3.5-3.9, 4.0-4.1, 4.6-4.10) © Reserved, 2017

Translator: Arijit Nag, Assistant Professor of Mahadebananda Mahavidyalaya

Books are developed, printed and published on behalf of Directorate of Distance Education, Tripura University by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই - ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বই - ম্যাপিং
প্রথম একক **অষ্টাদশ শতকের ইউরোপ**	**(পৃষ্ঠা 1-47)**
দ্বিতীয় একক **শিল্প বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং চীনও জাপানের অগ্রগতি**	**(পৃষ্ঠা 49 - 125)**
তৃতীয় একক **ঊনবিংশ শতকে ফ্রান্স ও রাশিয়ার অগ্রগতি**	**(পৃষ্ঠা 127 - 156)**
চতুর্থ একক **ইতালি ও জার্মাণীর ঐক্যসাধন এবং চীন ও জাপানের অগ্রগতি**	**(পৃষ্ঠা 157 - 195)**

সূচীপত্র

প্রথম একক **(পৃষ্ঠা 1-47)**

অষ্টাদশ শতকের ইউরোপ

১.০. ভূমিকা

১.১. একক উদ্দেশ্য

১.২. অষ্টাদশ শতক জ্ঞানদীপ্তির যুগ - বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব

১.২.১. জ্ঞানদীপ্তির পটভূমি

১.২.২. শিল্পকলার অগ্রগতি

১.২.৩. স্থাপত্য - ভাস্কর্য অগ্রগতি

১.২.৪. সঙ্গীত কলায় অগ্রগতি

১.২.৫. সাহিত্যে জ্ঞানদীপ্তি যুগের প্রতিফলন

১.৩. ফরাসী বিপ্লব : কারণ, সন্ত্রাসের রাজত্ব ও পতন

১.৩.১. ফরাসী বিপ্লবের কারণ

১.৩.২. বিপ্লবের গতি

১.৪. নেপোলিয়ন বোনাপার্ট : উত্থান, সংস্কার কার্যবলী ও পতন

১.৪.১. নেপোলিয়নের সম্রাজ্য

১.৪.২. নেপোলিয়নের ব্যর্থতার কারণ

১.৫. রক্ষণশীলতার যূগ : ভিয়েনা কংগ্রেস ও মেটারনিখ ব্যবস্থা

১.৫.১. ১৮১৫ সালের পর ইউরোপের প্রতিক্রিয়া

১.৬. সংক্ষিপ্তসার

১.৭. শব্দপরিচিতি

১.৮. উত্তরের সাহায্যে অগ্রগতির পরিমাপ

১.৯. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দ্বিতীয় একক (পৃষ্ঠা 49 - 125)

শিল্প বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং চীন ও জাপানের অগ্রগতি

২.০ ভূমিকা

২.১. একক উদ্দেশ্য

২.২. ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব : কারণ ও ফলাফল

- ২.২.১. বস্ত্রশিল্পে বিপ্লব
- ২.২.২. লৌহ ও কয়লা শিল্প
- ২.২.৩. শিল্প বিপ্লবের ফলাফল

২.৩. আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ

- ২.৩.১. আমেরিকার বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিক ভাবনা
- ২.৩.২. আমেরিকার বিপ্লব ও স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ
- ২.৩.৩. আমেরিকার বিপ্লব ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনাবলী
- ২.৩.৪. আমেরিকার বিপ্লবের ফলাফল ও তাৎপর্য

২.৪. দাসপ্রথা

- ২.৪.১. দাসপ্রথা অবসানের আদিকথা
- ২.৪.২. আব্রাহাম লিঙ্কন ও দাসপ্রথার অবসান

২.৫. আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ও আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা

- ২.৫.১. রাষ্ট্রসংঘের পরাজয়ের কারণ
- ২.৫.২. উপসংহার

২.৬. চীনের আদিম যুদ্ধ

- ২.৬.১. প্রথম আফিম যুদ্ধ
- ২.৬.২. দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ
- ২.৬.৩. আফিম যুদ্ধের কারণ
- ২.৬.৪. অসম চুক্তিসমূহ

২.৭. ঊনবিংশ শতকে জাপানের অগ্রগতি

- ২.৭.১. জাপানের উন্মুক্তকরণ, কমোডর পেরি এবং শোগুনতন্ত্রের উপর প্রভাব
- ২.৭.২. অসম চুক্তিসমূহ

২.৮. সংক্ষিপ্তসার
২.৯. শব্দপরিচিতি
২.১০. উত্তরের সাহায্যে অগ্রগতির পরিমাপ
২.১১. প্রশ্নাবলী

তৃতীয় একক (পৃষ্ঠা 127 - 156)

ঊনবিংশ শতকে ফ্রান্স ও রাশিয়ার অগ্রগতি

৩.০. ভূমিকা
৩.১. একক উদ্দেশ্য
৩.২. ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব : কারণ ও ফলাফল
    ৩.২.১. বিপ্লবের উদ্দেশ্য
    ৩.২.২. ইউরোপে বিপ্লবের প্রভাব
৩.৩. ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ফ্রেবরুয়ারী বিপ্লব : কারণ ও ফলাফল
    ৩.৩.১. বিপ্লবের ফলাফল
৩.৪. ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সে রাজনৈতিক অগ্রগতি
    ৩.৪.১. প্যারিস কমিউন
    ৩.৪.২ রাশিয়া : দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে আধুনিকীকরণ
৩.৫. সংক্ষিপ্তসার
৩.৬. শব্দপরিচিত
৩.৭. উত্তরের সাহায্যে অগ্রগতির পরিমাপ
৩.৮. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

চতুর্থ একক (পৃষ্ঠা 157 - 195)

ইতালি ও জার্মাণীর ঐক্যসাধন এবং চীন ও জাপানের অগ্রগতি

৪.০. ভূমিকা
৪.১. একক উদ্দেশ্য
৪.২. ইতালির ঐক্যসাধন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

৪.২.১. যোসেফ ম্যাৎসিনি
৪.২.২. মাভুরের উত্থান
৪.২.৩. দক্ষিণ ইতালির আন্দোলন ও গ্যারিবল্ডীর ভূমিকা
৪.৩. জার্মানীর ঐক্যসাধন
৪.৩.১. বিসমার্কের ভূমিকা
৪.৪. উপনিবেশিকতাবাদের প্রতি চীনাদের প্রতিক্রিয়া : তাইপিং বিদ্রোহ
৪.৪.১. তাইপিং বিদ্রোহ
৪.৪.২. তুং চি পুনপ্রতিষ্ঠা
৪.৫. জাপান : মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা
৪.৫.১. মেইজি সংবিধান
৪.৫.২. মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রভাব
৪.৬. সংক্ষিপ্তসার
৪.৭. শব্দপরিচিতি
৪.৮. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

ভূমিকা

বেশিরভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তি ভাবাদর্শ যখন অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছিল তখন থেকেই আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসের সূচনা হয় এবং ইউরোপ মহাদেশে রাজতন্ত্রের পতনের সময় তা সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়। ফ্রান্সে বুঁরবো রাজতন্ত্রের পতনের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসনসংক্রান্ত নতুন ভাবাদর্শের উদ্ভব ঘটেছিল। ফ্রান্স থেকেই এই ভাবাদর্শ সমগ্র ইউরোপে একাধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এই বিপ্লবগুলিই আধুনিক বিশ্বের ভিত্তি গঠন করেছিল এবং ইউরোপে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী শ্রমিক, কৃষক, অভিজাত, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছিল । এছাড়া আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে অনেক ট্র্যাজিডিও পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সময়পর্বে ইউরোপে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যা বহু মানুষের প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছিল।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র চীন ও জাপানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের পদার্পনের সাথে সাথে নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এশিয়ার এই দুই দেশে অতীত কাল থেকেই এক সুমহান সভ্যতা ছিল। বলাবাহুল্য, ইউরোপ ও পশ্চিমের উত্থানে এই সুমহান সভ্যতাদ্বয়ের পতন ঘটেছিল । এই পতনের ফলশ্রুতিতে ঊনবিংশ শতকে চীন ও জাপান পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের পুতুল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। যদিও ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে চীন ও জাপান উভয় রাষ্ট্রেরই রাজনৈতিক মঞ্চে পুনরুত্থান ঘটেছিল । এই বইটিতে ছাত্রছাত্রীরা অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে ইউরোপ, জাপান এবং চীনে যেসব পরিবর্তণ ঘটেছিল তা অণুধাবন করতে পারবে।

এই বইটি স্ব-নির্দেশনায় রচিত হয়েছে এবং এই বইটি চারটি এককে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রতিটি এককের সূচনা হয়েছে বিষয়গত ভূমিকা দিয়ে এবং তারপর এককের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর এককের বিষয়বস্তু সহজ, সরল বোধগম্য ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তু আলোচনার পর শিক্ষার্থীর কতটা বোধ হয়েছে তা জানার জন্য 'অগ্রগতি পরিমাপ কর' শিরোনামে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে সংক্ষিপ্ত ও রচণাভিত্তিক প্রশ্ন রয়েছে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের বোঝার সুবিধার্থে সংক্ষিপ্তসার ও শব্দপরিচিতি বিভাগটিকে এককের আলোচনার শেষে যুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম একক

অষ্টাদশ শতকের ইউরোপ

টিপ্পনী

১.০. ভূমিকা

১.১. একক উদ্দেশ্য

১.২. অষ্টাদশ শতক জ্ঞানদীপ্তির যুগ - বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব

১.২.১. জ্ঞানদীপ্তির পটভূমি

১.২.২. শিল্পকলার অগ্রগতি

১.২.৩. স্থাপত্য -ভাস্কর্য অগ্রগতি

১.২.৪. সঙ্গীত কলায় অগ্রগতি

১.২.৫. সাহিত্যে জ্ঞানদীপ্তি যুগের প্রতিফলন

১.৩. ফরাসী বিপ্লব : কারণ, সন্ত্রাসের রাজত্ব ও পতন

১.৩.১. ফরাসী বিপ্লবের কারণ

১.৩.২. বিপ্লবের গতি

১.৪. নেপোলিয়ন বোনাপার্ট : উত্থান, সংস্কার কার্যবলী ও পতন

১.৪.১. নেপোলিয়নের সম্রাজ্য

১.৪.২. নেপোলিয়নের ব্যর্থতার কারণ

১.৫. রক্ষণশীলতার যূগ : ভিয়েনা কংগ্রেস ও মেটারনিখ ব্যবস্থা

১.৫.১. ১৮১৫ সালের পর ইউরোপের প্রতিক্রিয়া

১.৬. সংক্ষিপ্তসার

১.৭. শব্দপরিচিতি

১.৮. উত্তরের সাহায্যে অগ্রগতির পরিমাপ

১.৯. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

১.০. ভূমিকা

বিখ্যাত ফরাসী কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার ভিক্টর হুগো (Victor Hugo) একসময়ে উক্তি করেছিলেন - "There is one stronger than all the armies in

টিপ্পনী

the world, and that is an idea whose time her come." অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে বৈপ্লবিক ভাবধারা তদানিন্তন সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনেনি বিপ্লবের ফলপ্রসূত 'স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী'র নতুন আদর্শ পরবর্তি বহু দশক ধরে জাতিকে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। বর্তমানে ফরাসী বিপ্লবপ্রসূত ভাবধারা প্রায় সমগ্র বিশ্বে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর রূপ পরিগণিত।

সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে যে ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল তার অভিঘাত পরিলক্ষীত হয় বিংশ একবিংশ শতকেও । বলাবাহুল্য এই পরিবর্তনের পিছনে মূল চালিকাশক্তি ছিল যুক্তিবাদ এর । এই যুক্তিবাদের লক্ষ্য ছিল সমাজ পরিবর্তন এবং নতুন জ্ঞানের অন্বেষণ ও আবিষ্কার সাধন। যুক্তিবাদের হাত ধরেই যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ঘটেছিল তা চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যযুগীয় অসহনশীল ধ্যানধারণার বিরোধীতা করেছিল এবং চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল তার অস্তিত্বকে।

অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানদীপ্তির দর্শন মানুষকে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করেছিল এবং প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে ও বৌদ্ধিক - সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে মানুষকে সামিল হতে উৎসাহিত করেছিল।

১৭৮৯ খ্রীঃএ বিপ্লব পরবর্তী ফ্রান্সে প্রবাদ প্রতিম ব্যাক্তি ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট । নেপোলিয়ান সন্ত্রাসের রাজত্বের পরিসমাপ্তির পর বিপ্লব পরবর্তী বিশৃঙ্খল ফ্রান্সে শৃঙ্খলতা ফিরিয়ে এনেছিলেন। শুধু তাই নয় ফরাসী সম্রাটের উপাধি ধরনের পর তিনিই হয়ে উঠেছিলেন ঊনবিংশ শতকে আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে এক অণ্যতম মুখ্য রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব।

অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংল্যান্ড এই শক্তি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধ (নেপোলিয়নীর যুদ্ধ) সংগঠন করে তাঁর সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিল এবং নেপোলিয়নের পতনের পর তারা ভিয়েনা সম্মেলনে মিলিত হয়েছিল । এই সম্মেলন চলেছিল ১৮১৪ খ্রীঃ এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৮১৫ খ্রীঃ এর জুন মাস পর্যন্ত । বলাবাহুল্য ভিয়েনা সংগ্রামে নেপোলিয়ন পরবর্তী ইউরোপে শান্তি ফিরিয়ে আনা, প্রাক বিপ্লব যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ও ইউরোপে শক্তি সাম্য বজায় রাখার জন্য খসড়া তৈরি করা হয়েছিল। তবে এই ভিয়ানা সংগ্রামের রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই সম্মেলনে ইউরোপে শক্তি সাম্য ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজবংশগুলির ন্যায্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। অন্যদিকে সমাজিক দিক দিয়ে এই কংগ্রেস অধিকাংশ দেশের বিদ্রোহ ও আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করে দিয়েছিল । এতসত্ত্বেও ভিয়েনা কংগ্রস ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়কালে ইওরোপে শান্তি বজায় রাখতে অনেকাংশেই সফল হয়েছিল।

অষ্ট্রিয়া প্রধানমন্ত্রী ও ভিয়েনা কংগ্রেসের অষ্ট্রিয়ার প্রতিনিধি মেটারনিখ ফ্রান্সকে সংযত রাখতে চেয়েছিলেন যাতে ফ্রান্স পুনরায় শক্তি অর্জন করে ইওরোপের শান্তি বিনষ্ট করতে না পারে। তাই ভিয়েনা কংগ্রসে ওশক্তি সাম্য নীতির অজুহাতে ফ্রান্সকে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে দুর্বল করে রাখার জন্য ফ্রান্সের চারপাশে শক্তিশালী রাষ্ট্রবেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছিল। এছাড়া মেটারনিখ প্রাক বিপ্লব যুগে উইরোপের বিভিন্ন দেশে যেসব রাজবংশ রাজত্ব করত সেখানে তাদের শাসনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বৈধতাদানে সচেষ্ট হয়েছিলেন । এর পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্পেন, নেপলস্-এ বুরবোঁ বংশের আর এক শাখার কর্তৃত্ব ফিরে পায় । হল্যান্ড, সার্ভিনিয়া, টাস্কানি এবং মভেনা ডেও পুরনো রাজবংশ ক্ষমতায় ফিরে আসে । এছাড়া রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও ইংল্যান্ড এই চতুঃশক্তি পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ইউরোপে শান্তি বজায় রাখতে একটি শক্তি সমবায় গঠন করে। এরই প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে ১৮২০ খ্রীঃ স্পেনে একটি গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হলে শক্তি সমবায়ের উদ্যোগে ফরাসী বাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করেছিল । এছাড়া ঐ একই বছর নেপল্স এর বিদ্রোহ দমনের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল।

এই এককে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ও বিকাশ, জ্ঞানদীপ্তির পটভূমি এবং জ্ঞানদীপ্তির কালে সাহিত্য, কলা, স্থাপত্য ও সঙ্গীত শিল্পে আধুনিকতার প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আলোচিত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ফরাসী বিপ্লব ও তারপর ফ্রান্সে ও ইউরোপে বিপ্লবের তাৎক্ষণিক প্রভাব এবং বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ প্রভৃতি । এককের পরিসমাপ্তিতে ভিয়েনা সংগ্রাম ও মেটারনিখ ব্যবস্থা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

টিপ্পনী

১.১. একক উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠের পর যে বিষয়গুলি বোধগম্য হবে তা হল -

জ্ঞানদীপ্তির যুগ হিসাবে অষ্টাদশ শতক

জ্ঞানদীপ্তি যুগের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব

ফরাসী বিপ্লবের কারণ ও ব্যর্থতা

ভিয়েনা কংগ্রেস

মেটারনিখ ব্যবস্থা

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
3

১.২. জ্ঞানদীপ্তির যুগ হিসাবে অষ্টাদশ শতক : বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব

ইউরোপীয় চিন্তার ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক জ্ঞানদীপ্তির যুগ হিসাবে পরিচিত অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির (Enlightenment) সূচনা

হয়েছিল। জ্ঞানদীপ্তি ভাবাদর্শের সাথে যুক্ত বহু গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্‌রা ছিলেন মুখ্যত ফ্রান্সের মানুষ।

যুক্তির যুগে (Age of Reason) যেসব ধারনার উৎপত্তি হয়েছিল সেগুলিকে জনপ্রিয় করেছিল জ্ঞানদীপ্তি দর্শন। জ্ঞানদীপ্তি দর্শনে যুক্তি ও তথ্যের নিরিখে সবকিছু গ্রহণ করার আদর্শ স্থান পেয়েছিল। এইদর্শন অনুযায়ী যুদ্ধ, দারিদ্র্য, অবিচার প্রভৃতি মানুষের পাপের ফলস্বরূপ ঈশ্বর প্রদত্ত দন্ড নয় বরং তা অপশাসনের পরিণাম মাত্র। মানুষের উচিত অত্যাচারী সরকারের হয় সংস্কার সাধন নয় তার উচ্ছেদ সাধন। এরফলে সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও দূরীভূত হতে পারে। নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি বিদ্যার সহায়তায় দারিদ্র্য হ্রাস করা যেতে পারে। ওনতুন ঔষধের সাহায্যে রোগব্যাধির মোকাবিলা করা যেতে পারে। সার্বজনীন গণশিক্ষার মাধ্যমে অজ্ঞতা দূরীকরণ সম্ভব। সর্বপরি মানুষ যদি তার ইচ্ছাশক্তি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে প্রয়োগ করে তাহলে আদর্শ মানব সমাজ গঠন সম্ভব।

ফরাসী জ্ঞানদীপ্তি চিন্তাবিদরা 'ফিলজফ' (philosophe) নামে পরিচিত ছিলেন। ফিলজফ কমিটি ঠিক পুরোপুরি দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত নয়। কোনো বিশেষ হাতিয়ার ছাড়াই যাঁরা প্রায় সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগে সত্যের অনুসন্ধানে রত, ব্যাপকার্থে তাঁদের সকলকেই এই সংজ্ঞায় আনা যায়। যাইহোক, ফরাসী ফিলজফদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) গ্রন্থমালার প্রকাশনা। যাঁর এই বিশ্বকোষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন বা প্রবন্ধের জোগান দিয়েছিলেন তাঁদের বলা হল বিশ্বকোষ প্রণেতা (Encyclopaediast)। বলাবাহুল্য ফরাসী জ্ঞানদীপ্তির আলোচনায় ফিলজফ ও বিশ্বকোষ প্রণেতাদের প্রায় এক অর্থেরই ব্যবহার করা হয়।

জ্ঞানদীপ্তি যুগের চিন্তাবিদদের রচনায় মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে নতুন ভাবনাচিন্তা প্রকাশ পেয়েছিলেন। বিশেষত নতুন সমাজ গঠনের প্রতি তাঁরা বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা সমাজকে দেখেছিলেন মানুষের সকল কর্মকান্ডের একটা নির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে। এর ফলে মানুষের ইতিহাস, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপ এবং সামাজিক যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে নতুন অনুসন্ধানের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল।

জ্ঞানদীপ্তি দর্শনে প্রধানত বুদ্ধি ও যুক্তির উপর নির্ভরশীল। তাই জ্ঞানদীপ্তির যুগে কুসংস্কার ও পশ্চাদ্‌বতী ধারণার পরিবর্তে যুক্তি দিয়ে সবকিছুর অনুসন্ধান ও বিচার বিশ্লেষণ শুরু হয়েছিল। প্রচলিত ধারণা থেকে মুক্তির চেষ্টা ও লক্ষ্যণীয় ছিল। এছাড়া জ্ঞানদীপ্তি দর্শনের পরিধি ছিল অনেকটা বৃহৎ। জ্ঞানদীপ্তি যুগের এক পন্ডিত, হ্যামিলটন জ্ঞানদীপ্তি দর্শনের মধ্যে যে মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেছেন তা হল -

টিপ্পনী

যুক্তি (Reason) :

যুক্তির নিরিখেই সমস্ত কিছু বিচার বিশ্লেষণ ও জ্ঞান আহরণ।

ব্যবহারিকবাদ (Empericism) :

এই ভাবাদর্শে মনে করা হয় সামাজিক ও প্রাকৃতিক জগতে সকল জ্ঞানের উৎস প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ঘটনা প্রত্যক্ষ করা ও প্রমাণসিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা এর থেকেই জন্ম নিয়েছিল ব্যবহারিকবাদ। জ্ঞানদীপ্তি দর্শন বাহুলাংশে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

বিজ্ঞান (Science) :

সপ্তদশ শতক বৈজ্ঞানিক বিপ্লব-এর সময় যে সব পদ্ধতি (পরীক্ষামূলক ওপ্রভৃতি) আবিষ্কৃত হয়েছিল তার মাধ্যমেই মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়েছিল। তাই জ্ঞানদীপ্ত দর্শন ছিল বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞান মনস্ক।

সার্বজনীনবাদ (Universalism) :

এই ভাবাদর্শ অণুযায়ী যুক্তি এবং বিজ্ঞান সব অবস্থায় অকাট্য এবং জগতের সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা এর মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব। বিজ্ঞান কার্যত সার্বজনীন সূত্রের সন্ধান করে।

অগ্রগতি (Progress) :

জ্ঞানদীপ্তি যুগের মুখ্য ধারণা হল অগ্রগতি। জ্ঞানদীপ্তি দর্শন বিশ্বাস করা হয় যে, মানুষ যুক্তি ও বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে নিজের প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) :

এই ধারণা অনুযাবী ব্যাক্তি নিজেই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা যুক্তিবোধ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত।

সহনশীলতা (Toleration) :

এই ধারনা অনুযায়ী জগতের সমস্ত মানুষ সমান এবং ইউরোপীয় খ্রীষ্টানধর্ম থেকে অন্য সংস্কৃতি বা জাতি নিকৃষ্ট এমন ধারণা অমূলক।

স্বাধীনতা (Freedom) :

স্বাধীনতা হচ্ছে বিশ্বাস, ভাবপ্রকাশ, বাণিজ্যক, সামাজিক আদান প্রদান প্রভৃতি বিষয়গুলির চিরাচরিত বাধানিষেধ এর বিপরীত ভাবনা।

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) :

জ্ঞানদীপ্তি দর্শনের আর এক অন্যতম মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল ধর্মনিরপেক্ষতা। এই

চিন্তাভাবনা চিরাচরিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং অধিবিদ্যাকে অনুমানের বিরোধিতা করে।

যাজক-বিরোধী মানসিকতা (Anti clericalism) :

চার্চ, সংগঠিত ধর্ম এবং ধর্মীয় উৎপীড়নের বিরোধীতা থেকে উদ্ভুত হয়েছিল যাজক বিরোধী মানসিকতা বা Anti clericalism এর।

টিপ্পনী

প্রযুক্তিবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অগ্রগতিতে উৎসাহ :

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রযুক্তি ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে তার বাস্তবিক প্রয়োগ ব্যাপক ভাবে উৎসাহিত হয়েছিল।

রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইচ্ছা ও সংস্কার :

জ্ঞানদীপ্তি চিন্তাবিদরা গণতান্ত্রিক ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা চেয়েছিলেন রাষ্ট্রের এক সংবিধানিক ও বৈধ সংস্কার।

অভিজ্ঞতালব্ধ ও বস্তুগত জ্ঞানের সর্বোৎকৃষ্ঠতার প্রতি বিশ্বাস :

ইহা একধরনের সমাজ যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তার প্রকৃত কারণ জানার এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে চেতনা।

জ্ঞানদীপ্তি ছিল মূলতঃ তিনপ্রকারের চিন্তাবিদ্‌দের মতাদর্শের ফসল। এর মধ্যে প্রথম প্রজন্মেরমধ্যে ছিলেন ফরাসী ভলতেয়ার (১৬৯৪ - ১৭৭৮ খ্রীঃ) এবং মন্তেজু (১৬৮৯ - ১৭৫৫ খ্রীঃ)। এই প্রজন্মের চিন্তাবিদরা ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক দার্শনিক জনক ও বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের রচনার দ্বারা গভীরভাবে অণুপ্রাণীত হয়েছিলেন। এঁদের কাছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে যুক্তিবাদী অনুসন্ধান এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যায়ন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। দ্বিতীয় প্রজন্মের চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে ছিলেন স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম (David Hume) এবং ফরাসী দার্শনিক রুশো ও দিদেরো (Diderot)। এঁরা প্রথম প্রজন্মের চিন্তাবিদ্‌দের কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিয়ে দিয়েছিলেন। এঁরা ছিলেন অনেক বেশি চার্চ বা প্রতিষ্ঠান বিরোধী। অন্যদিকে তৃতীয় প্রজন্মের চিন্তাবিদের মধ্যে ছিলেন জার্মান দার্শনিক কান্ট (Kant) এবং স্কটিশ দার্শনিক অ্যাডাম স্মিথ ও অ্যাডাম ফার্গুসন (Adam Ferguson)।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
6

এই সকল চিন্তাবিদ্‌দের মাধ্যমেই জ্ঞানদীপ্তি দর্শন সার্বজনীন হয়ে উঠেছিল এবং এর সূত্রেই জ্ঞান চর্চার নতুন শাখা ও আত্মপ্রকাশ করেছিল। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology), অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা, রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy)।

অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানদীপ্তি দর্শন পুরোপুরি সঙ্গতপূর্ণ ছিল না ; কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সময়কাল প্রথাগতভাবে জ্ঞানদীপ্তির যুগ নামে পরিচিত। এটা নিশ্চিতভাবে বলা

যায় যে এই যুগেই অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার যুগ থেকে আলোর দিকে উত্তোরণ পরিলক্ষীত হয়েছিল।

১.২.১. জ্ঞানদীপ্তির পটভূমি :

জ্ঞানদীপ্তির যুগে ধ্যানধারণায় যে পরিবর্তন এসেছিল তার মূলে ছিল বিজ্ঞানের অগ্রগতি। বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্যই আলোচ্য পর্বে নতুন দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হয়েছিল। এই পর্বের চিন্তাবিদ্‌রা সমাজের সকল ক্ষেত্রে বিপ্লবের সাথে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এক যুক্তিবাদী বিশ্বাস। এছাড়া তাঁরা সমাজ বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন।

জ্ঞানদীপ্তি যুগের চিন্তাবিদ যুক্তিবাদী চিন্তা সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারু কলার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আলোচ্য সময় সাহিত্য ও সঙ্গীতকলায় নব্যধ্রুপদীবাদের (Neoclassiciasm) অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এর ফলে নব্য ধ্রুপদী শৈলীর স্বার্থে ব্যারাক (Baroque) ও রোকোকো (Rococo) শৈলী ক্রমশ গুরুত্ব হারিয়েছিল।

জ্ঞানদীপ্তি যুগের সমস্ত চিন্তাবিদ্‌রা যে একই কথা বলেছিলেন বা একইভাবে ভেবেছিলেন তা নয়। তবে তাঁদের চিন্তার মূলগত একটা ঐক্য ছিল এবং তাঁরা যে চিন্তাভাবনা করেছিলেন তা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী পর্বের চিন্তাবিদ্‌দের থেকে কিছুটা আলাদা ছিল। যাইহোক, তাঁদেদর চিন্তাভাবনার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল 'যুক্তিবাদ' (Rationalism)। এই যুক্তিবাদের দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়ে তাঁর নতুন সত্যের আলোকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরোধীতা করেছিলেন এক ইউরোপের চিন্তা চেতনার আলোড়ন তুলেছিলেন।

জ্ঞানদীপ্তি যুগের একেবারে গোড়ার দিকে এক অন্যতম চিন্তাবিদ ছিলেন বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রেনে দেকার্তে (Rene Descartes)। দেকার্তে বিশ্বপ্রকৃতিকে একটি যন্ত্রের রূপে দেখেছিলেন। এবং এই যান্ত্রিক জগতের সাথে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় বিশ্বাসের এক সমন্বয় করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রসঙ্গত দেকার্তে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যুক্তিবাদী ও গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। এই দুই এর উপর ভিত্তি করে তিনি যে জগৎ তৈরি করেছিলেন সেখানে ঈশ্বর ও পরমাত্মার (Soul) স্থান ছিল। তিনি তাঁর Discourse on Method' এ উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি একদিনেই তাঁর যুক্তিবাদী বিশ্বজগৎ তৈরি করেছিলেন এবং তাঁর চিন্তাভাবনা অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি বরং তা অন্তর্চেতনা থেকে উদ্ভুত হয়েছিল।

দেকার্তের চিন্তাভাবনা বহুল্যংশে বারুচ স্পিনেগো (Baruch Spinoza) কে প্রভাবিত করেছিল। তিনি তাঁর 'Ethicis' (১৬৬৩) এ একটা গাণিতিক দর্শন রচনা করেছিলেন। জ্ঞানদীপ্তি যুগের আর এক অন্যতম চিন্তাবিদ ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon) পর্যবনেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্যের অনুসন্ধানে সচেষ্ট

টিপ্পনী

হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন একমাত্র পরীক্ষিত তথ্যের উপরেই নির্ভর করে দার্শনিক তত্ত্বের প্রস্তাবনা সম্ভব।

১.২.২. শিল্প কলায় অগ্রগতি :

টিপ্পনী

ইউরোপের শিল্পকলা অর্থাৎ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কণন, জ্ঞানদীপ্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। শিল্পকলার সপ্তদশ শতকের সূচনায় ব্যারোক (Baroque) শৈলীর প্রভাব ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের সূচনা থেকে ব্যারোকম শৈলী ক্রমশ রোকোকো (Rococo) শৈলীর অনুসরণের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। তবে এই শতাব্দীর মধ্যভাগে ফর্মালিজম (Formalism) এবং নব্যধ্রপদীবাদ (Neoclassicism) এদর স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্যকরা যায়। নব্যধ্রুপদীবাদের অনুসরণ কারীরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমাণ শৈলীকে নতুন করে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। চিত্রাঙ্কণে রোকোকো শৈলীর মধ্যে অতি সৌন্দর্যারণের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত বিবসনা নারীকে যখন শিল্পীরা ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতেন। রোকোকো শৈলীর চিত্রশিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন Autoine Watteau এবং তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের চিত্রশিল্পী ফাঁসোয়া বাউচার (Francois Boucher) ও জাঁ ফ্রোর্গোনার্ড (Jear Fargonard)। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী চিত্রাঙ্কনে এঁরা যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। এঁদের ছবির বিষয়গুলির মধ্যে ফরাসী রাজদরবারের বিলাসিতার চিত্ররূপ যেমন ছিল তেমনি নসর্গিক সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতেও তাঁরা পিছপা হন নি। ফরাসী রোকোকো শৈলী প্রভবিত করেছিল ইতালি ও ইংল্যান্ডের শিল্পীদেরও । ইতালির চিত্রশিল্পী গিওবন্নি তেইপোলো (Giovanni Tiepolo) এবং ইংল্যান্ডের চিত্রশিল্পী স্যার যোসূয়া রেনল্ডস্ (Sir Joshua Reynoolds) ও থমাস গেইনসবোরো (Tthomas Gainsborough) এর চিত্রকর্ম রোকোকো শৈলীর প্রভাব পরিলক্ষীত হয়।

নিওক্ল্যাসিকাল ঘরনার শিল্পীরা তাঁদেদর কাজেদর মাধ্যমে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের চরম অতৃপ্তি ওন সমালোচনার নিদর্শন রেখেছিলেন। শিল্পী জ্যাকুইস লুই ডেভিড (Jacques louis David, 1748 -1825) তাঁর বিখ্যাত ছবি সক্রেটিসের মৃত্যু (Death of Socrates) এর মধ্য দিয়ে গ্রীকে রোমান ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। এছাড়া ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুই এর পত্নী মারী আঁতোয়ানেৎ (Maria Antoinette) এর স্কেচ যেখানে রাণীকে মৃত্যুদন্ডের জন্য গিলোটিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এর মধ্য দিয়ে বিপ্লবের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
৪

অষ্টাদশ শতকে ইওরোপে মহিলা চিত্রশিল্পীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু তাঁদের নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যেমন ফ্রান্সের মহিলা শিল্পীরা নগ্ন মডেলদের নিয়ে কাজ করার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ফলে

প্রতিকৃতি শিল্পী হিসাবে তাঁরা তাঁদের দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেন নি। যাইহোক, অষ্টাদশ শতকে দুই জন বিখ্যাত মহিলা শিল্পী ছিলেন র‍্যাচেল রুইচ (Rachel Ruysch) এবং রোসালবা ক্যারইরা (Rosalba carriera)। এঁরা দুই জনেই রোকোকো ধারায় ছবি এঁকেছিলেন। প্রসঙ্গত রোসালবা ক্যারেইরা ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসী অ্যাকাডেমী (French Academy) -তে ক্লাস করার অনুমতি পেয়েছিলেন। এঁরা ছাড়াও ফ্রান্সের দুই জন বিখ্যাত প্রতিকৃতি শিল্পী ও অ্যাকাডেমীর সদস্য ছিলেন Vigce Le Brun (1755 - 1842) এবং Adelaide Labille Guiard (1749 - 1803)। সুইজারল্যান্ডের চিত্রশিল্পী Angelica Kautmann (1741-1807) তাঁর বেশিরভাগ ছবি এঁকেছিলেন ইংল্যান্ড ও ইতালিতে এবং তিনি ফরাসী শিল্পীদের ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। যাইহোক অষ্টাদশ শতকে এই তিন মহিলা শিল্পী নব্যধ্রুপদী শৈলীর চিত্রাঙ্কনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

টিপ্পনী

১.২.৩. স্থাপত্য ও ভাস্কর্য অগ্রগতি :

জ্ঞানদীপ্তি যুগে নব্যধ্রুপদীবাদের প্রভাব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপর ও পড়েছিল। আলোচ্য সময়ে স্থাপত্যের মধ্যে ফুটে উঠেছিল "the noble simplicity and tramquil loftiness of the ancients" বলা বাহুল্য গথিক ও করিন্থীয় শৈলীকে এই সময় স্থাপত্য রীতিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল ইওরোপ এবং স্পেনীয় উপনিবেশ আমেরিকায়। প্যারিসের ম্যাভলেইন (The Modeleine of Paris) চার্চ রোমান মন্দিরের অনুকরণে তৈরি হয়েছিল এবং বার্লিনে ব্রন্ডেনবুর্গ দ্বার (Brandenburg Gate in Berlin) এর শৈলীতে গ্রীক প্রভাব পড়েছিল। উপনিবেশীয় আমেরিকায় নিওক্ল্যাসিকাল ধারার স্থাপত্য কর্মের বিখ্যাত নিদর্শণ হল মাউন্ট ভার্ণন (Mount Vernon)। জ্ঞানদীপ্তির যুগে ভাস্কর্যেও গ্রীক ও রোমান প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। আলোচ্য সময়ে ভেনাসের প্রতিমূর্তি (Statue of Venus) যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত জ্ঞানদীপ্তির যুগে দুইজন বিখ্যাত ফরাসী প্রশংসিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত জ্ঞানদীপ্তির যুগে দুইজন বিখ্যাত ফরাসী নিওনক্ল্যাসিকাল ভাস্কর ছিলেন Claude Michel (1738 - 1814) এবং Jean Houdon (1741 - 1828)। এঁরা তাঁদের শিল্পজকর্মের জন্য বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বলাবাহুল্য Houdon এর ভলতেয়ারের প্রতিমূর্তি (Portrait of Voltaire)-র জগৎজোড়া খ্যাতি ছিল।

১.২.৪.সঙ্গীতকলায় অগ্রগতি :

ইওরোপের ধ্রুপদী সঙ্গীত অষ্টাদশ শতকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিল। এই পর্বে কয়েকজন অসামান্য প্রতিভাবান সঙ্গীতস্রষ্টা তাঁদের রচনা (Composition) -র মাধ্যমে এই যুগকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে এই সময় সিম্ফনি, সোনাটা, কনসার্ট এবং চেম্বার মিউজিক সঙ্গীতের আঙ্গিককে বদলে দিয়েছিল। সঙ্গীতে ব্যারোক

টিপ্পনী

শৈলীর প্রয়োগ ঘটনত অপেরা (Opera) সঙ্গীতে যা ছিল খুবই সুর সমৃদ্ধ এবং আবেগপূর্ণ। বিখ্যাত জার্মান সুরস্রষ্টা জোহান সিবাস্টিয়ান বাঘ (Johann Sefestion Bach, 1645 - 1750) এর নাম প্রথমেই উল্লেখ্য। বাঘ এর সমসাময়িক অপর বিখ্যাত সঙ্গীত স্রষ্টা ছিলেন জর্জ ফ্রিডারিক হ্যান্ডেল (Goeorge Frideric Handel 1689-1759)। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে সঙ্গীতের গভীর ব্যাঞ্জনাময় ব্যারোক-এর ধাঁচে থেকে বেরিয়ে এসে সহজ এবং কিছু পরিমাণ লৌক ঐতিহ্যের মিলন ঘটতে দেখা যায় এবং শেষ পর্যন্ত এক রোম্যান্টিক প্রভাব ইওরোপীয় সঙ্গীতকে আচ্ছন্ন করেছিল। দুই বিখ্যাত অষ্ট্রীয় সঙ্গীত স্রষ্টা ফ্র্যানজ যোসেফ হেডেন (Franz Joseph Hayden, 1732-1809) এবং উলকগাং আমাদিউস মোজার্ট (Waltgang Amadeus Mozant, 1756-1791), ইওরেপের সঙ্গীতকে এক বিশাল উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। হেডেন ছিলেন শতাধিক সিম্ফনির রচয়িতা এবং মোজনার্ট এর রচনার সংখ্যা ছিল ছশোর বেশী যেখানে সিম্ফনি, অপেরা এবং স্ট্রিংকোয়ার্টেট উল্লেখযোগ্য। মোগার্টেদর তিনটি বিখ্যাত অপেরার নাম Marriage of Figaro (1786), Don Giovanni (1787) এবং The Magic Flute (1791)। অষ্টাদশ শতকের শেষে যাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভার বিচ্ছুরণ ইওরোপীয় সঙ্গীত জগতে এক বিপ্লব এনেছিল তিনি ছিলেন লুডউইগ ডন বিটোভেন (Ludwig Von Beethoven, 1770 - 1827)। স্থবির ধ্রুপদী ধারা থেকে বিটোভেন তাঁর সোনাটা এবং সিম্ফনির মাধ্যমে রোম্যান্টিকতার জয়যাত্রা সূচনা করেছিলেন।

১.২.৫. সাহিত্যে জ্ঞানদীপ্তি যুগের প্রতিফলন :

অষ্টাদশ শতকে নব্যধ্রুপদীবাদ এর প্রভাব শিক্ষাকলার তুলনায় সাহিত্যে অধিক পরিলক্ষিত হয়েছিল। বস্তুত, আলোচ্য সময়ে নতুন দর্শনের সূত্রগুলি প্রকাশ করার জন্য প্রায়শই কবিতা, নাটক, গদ্য প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।

যুক্তির যুগে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত কবি ছিলেন আলেকজান্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪) তিনি তাঁর জনপ্রিয় সাহিত্যকর্ম 'An Essay on Man' (1733) -তে যুক্তিবাদকে সমর্থন করেছিলেন এছাড়া তিনি নিউটনের বিশ্বপ্রকৃতিকেও ব্যাখ্যা করেছিলেন যুক্তি দিয়ে।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
10

জ্ঞানদীপ্তির যুগে অপর দুই উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন অ্যানে ফিঞ্চ (Anne Finch, 1661-1720) এবং ফিলিস হুইটলি (Phyllis Wheatly 1753-1784)। ইংল্যান্ডের কবি অ্যানে ফিঞ্চ তাঁর কবিতায় যুক্তিবাদ ও নারীজাতির সমতার কথা তুইলে ধরেছিলেন। অন্যদিকে ম্যাসাচুসেটস্ এর ক্রিতদাসী ফিলিস হুইটলি যে ছন্দোবদ্ধ কবিতাগুলির রচনা করেছিলেন তার মধ্যে পোপের কাব্যশৈলীর সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক তিনি তাঁর কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে একই সাথে দাসত্বর বন্ধন

থেকে মুক্তি এবং আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার কথা তুলে ধরেছিলেন।

আলোচ্য সময়ে বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ার তাঁর শ্রেষ্ঠ বিদ্রুপাত্মক রচনা 'কাঁদিদ' (Candide, 1759)-এ ব্যাঙ্গের কষাঘাতে প্রচলিত সমাজের অসাম্য ও অবিচারকে উন্মুক্ত করেছিলেন ও তাঁর তীব্র নিন্দা কনরেছিলেন। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বিদ্রুপাত্মক সাহিত্য রচয়িতা জোনাথন সুইফট (Jonathon Swift, 1667-1745) তাঁর 'Gulliver's Travels' (1726) এ তদানিন্তন সমাজব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন ব্যাঙ্গত্মক ভাষায়।

অষ্টাদশ শতকে সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে উপন্যাস রচনা শুরু হয়েছিল । প্রসঙ্গত, প্রথমে ফ্রান্স ও তারপর ইংল্যান্ডের উপন্যাস রচনা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বলাবাহুল্য ড্যানিয়েল ডিফো (Daniel Defoe 1659 - 1731) এর 'Robinson Crusoe' (1719) কে ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। এই সময়ে উপন্যাসের সহজ গদ্যরূপ এবং তার সহজবোধ্য ও যুক্তিগ্রাহ্যতা মানুষ কে আকৃষ্ট করে ছিল । যাইহোক স্যামুইয়েল রিচার্ডসন (১৬৮৯ - ১৭৬১) এর 'Pamela' (1740-41) এবং হেনরি ফিল্ডিং (Henruy Fielding, 1707-1754) এর 'Tom Jones' (1749) অষ্টাদশ শতাব্দীর উপন্যাসের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড দুই দেশেই রোমান্টিক উপন্যাস লেখা শুরু হয়েছিল। এই উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে বহু দিন ধরে বঞ্চিত নারীরা তাঁদের প্রতিভা বিকাশের উজ্জ্বল এক রাস্তার সন্ধান পেয়েছিলেন। বলাবাহুল্য এই উপন্যাসগুলিতে নারীরা তাঁদের নারীসত্ত্বা এবং গৃহের অভ্যন্তরীন জগতে তাঁদের পরিস্থিতি ব্যক্ত করেছিলেন। আলোচ্য ফরাসী মহিলা রোমান্টিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন Modame de Graffigny (1695-1758) ও Madame de Tenun (1681-1749)। প্রসঙ্গত Graffigny-র 'Litters Dune Peruvienne' (1700) বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অন্যদিকে Tencin - এর 'The Siege of Calais' ছিল বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইংল্যান্ডে মহিলা রোমান্টিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ফ্যানিবার্নি (Fanny Burney, 1753 - 1840)। তাঁর প্রথম উপন্যাস ছিল 'Eveline' (1778)। এছাড়া ছিলেন Aphra Behn (1640 - 1689), যাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ছিল 'Oroonoko' (1688)।

টিপ্পনী

অগ্রগতি পরিমাপ কর :

১. ফিলজফ্ কাদের বলা হত ?

২. Paradigm বলতে কি বোঝ ?

৩. জ্ঞানদীপ্তি ভাবাদর্শের যে কোন দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

৪ . অষ্টাদশ শতকে দুইজন মহিলা লেখকের নাম উল্লেখ কর।

১.৩. ফরাসী বিপ্লব : কারণ, সন্ত্রাসের রাজত্ব এবং পতন :

টিপ্পনী

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব যে নতুন ভাবাদর্শের জন্ম দিয়েছিল তা সমগ্র ঊনবিংশ বিংশ শতক জুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণগুলি ইওরোপের অন্যান্য দেশের সমাজব্যবস্থার মধ্যে ও নিহিত ছিল। তাই ফরাসী বিপ্লব সংঘটনের প্রকৃত কারণ বুঝে গেলে অষ্টাদশ শতকের সমগ্র ইওরোপের সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোকে বোঝা প্রয়োজন।

অষ্টাদশ শতকে ইওরোপীয় সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল অসাম্য এবং অভিজাত প্রভাবিত। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে বুরবোঁরাজ ষোড়শ লুই, স্পেনে তৃতীয় চার্লস এবং রাশীয়াতে ক্যাথোরিন দ্যা গ্রট এর শাসন চলছিল । এমনকি গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেন্টে ও বহুলাংশে তৎকলালীন রাজা তৃতীয় জর্জ ও ইংরেজ অভিজাত পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত ছিল। বলাবাহুল্য, অষ্টাদশ শতকের ইওরোপীয় রাজন্যবর্গ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক (Enlightened Despots) রূপে পরিচিত ছিল । এই রাজন্যবর্গ তাঁদের আত্মীয় অভিজাত পরিবারগুলির সাথে ইওরোপের বেশিরভাগ জমির মালিকানা ভোগ করতেন এবং সেই জমিতেই সাধারণ মানুষ জীবন নির্বাহের জন্য কর্মে নিযুক্ত ছিল। ইউরোপের অভিজাততন্ত্রের উপর সাধারন মানুষের কোন নিয়ন্ত্রন বা প্রভাব ছিল না । বেশিরভাগ মানুষই ছিল সার্ক এর মতো, যাদের নিজস্ব কোন অধিকার ছিল না । এর ফলে ইউরোপের সাধারণ মানুষের মধ্যে অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল।

সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টির জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় সমস্তরকম করের বোঝা দরিদ্র মানুষের উপরেই পড়ে এবং দরিদ্র মানুষের অর্থের উপর ভিত্তি করেই অভিজাতরা সমস্তরকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। বলাবাহুল্য ইউরোপের সামন্ত ভূস্বামীরা স্বদেশে অগণিত সাধারণ মানুষের উপর প্রভুত্ব করলেও সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য শুধু কর আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহাই শাসক ও প্রজার মধ্যে আত্মিক বন্ধনকে ভেঙে দিয়েছিল এবং ভূস্বামীদের হাতে সার্কদের শোষণ দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে উঠেছিল । ধর্মীয় সংগঠন চার্চ ও দরিদ্র মানুষের পাশে ছিল না । বস্তুত চার্চ অভিজাতদের শোষণমূলক কার্যকলাপকে বৈধতা দিয়েছিল । এছাড়া ইওরোপের অনেক রাজার মধ্যেই নিজেকে সর্বশক্তিশালী বলে মনে করার প্রবণতা ছিল । ঐতিহাসিক চার্লস ডাওনার হ্যাজেন এর মতে "The old regime in Europe was disloyal to the very principles on which it rested .'

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
12

সমকালীন পরিস্থিতির সাথে রেনেসাঁস প্রসূত ধ্যানধারনাও ইউরোপের

মানুষজনের মধ্যে ক্রমশ একটা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেই সময় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রসার ঘটেছিল এবং ধর্মীয় মতাদি সংক্রান্ত অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ছাপাখানার আবিষ্কার মহান চিন্তাবিদ্‌দের ভাবাদর্শগুলির প্রসারে সহায়তা করেছিল। চার্চকে আক্রমণ করে প্রকাশিত হয়েছিল অনেক প্রচারপুস্তিকা ও জার্নাল। এছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, এই সময় রাজার স্বর্গীয় অধিকারত্ত্বের বিরুদ্ধেও প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছিল। আর এই সমস্ত কিছু বিষয় একত্রে অষ্টাদশ শতকের শেষে এক অভ্যুত্থান সংঘটনে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

টিপ্পনী

১.৩.১. ফরাসী বিপ্লবের কারণ :

ফরাসী বিপ্লব বিশ্বের ইতিহাস এমন এক যুগান্তকারী ও সুদূরপ্রসারী ঘটনা যা কেবলমাত্র ইউরোপের পরিবর্তন ঘটায়নি, এই বিপ্লব প্রসূত ভাবধারা এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল। রাশিয়ার চিন্তাবিদ ও লেখক পিটার ক্রোপটকিন (Peter Kropotkin) তাঁর 'The Great French Revolution' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে দুটি তরঙ্গ ফরাসী বিপ্লবের পটভূমি তৈরি করেছিল। প্রথম তরঙ্গটি ছিল ভাবধার যা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে মধ্যবিত্ত মানুষের চিন্তাভাবনার সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং দ্বিতীয় তরঙ্গটি ছিল মানুষের ক্রিয়াকান্ডের, যার মাধ্যমে কৃষক এবং শহুরে শ্রমিক উভয়ই চেয়েছিল তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান উন্নয়ন। বলাবাহুল্য এই দুই তরঙ্গের মিলিত ফলই ছিল বিপ্লব।

ফরাসী বিপ্লবের পিছনে যে সমস্ত সক্রিয় ছিল তাদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা - সামাজিক ও রাজনৈতিক।

ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক কারণ :

বেশিরভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন 1789 খ্রীঃ এর বিপ্লব সংঘটনের মূলে স্বৈরতন্ত্র ততটা দায়ী ছিল না যতটা দায়ী ছিল সামাজিক বৈষম্য। বস্তুত প্রাক্ বিপ্লব ফ্রান্সে আর্থ সামাজিক অসঙ্গতি ও ত্রুটির মধ্যেই ফরাসী বিপ্লবের কারণ নিহিত ছিল। বলা বাহূল্য অষ্টাদশ শতকে ফরাসী সমাজ মুখ্যত সুবিধা ভোগী ও সুবিধাহীন শ্রেনী এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সুবিধা ভোগী শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল যাজক ও অভিজাত গোষ্ঠী এবং এরা ছিল ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার মাত্র এক শতাংশ। প্রসঙ্গত সুবিধা ভোগী শ্রেণী যেখানে রাষ্ট্রের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করত সেখানে ফ্রান্সের নিরানব্বই শতাংশ মানুষ ছিল শোষিত ও দুর্দশাগ্রস্ত।

অষ্টাদশ শতকে ফরাসী পূর্বতন সমাজে তিনটি এস্টেট বা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। যথা - যাজক সম্প্রদায় (প্রথম এস্টেট), অভিজাত সম্প্রদায় (দ্বিতীয় এস্টেট) এবং সাধারণ মানুষ (তৃতীয় এস্টেট)। মধ্যযুগ থেকেই সমাজে এই তিনটি এস্টেটের পার্থক্য স্বীকৃত ছিল এবং এই পার্থক্যের ভিত্তি ছিল কর্ম।

টিপ্পনী

প্রথম এস্টেট :

ফরাসী সমাজে প্রথম এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল সমগ্র যাজক সম্প্রদায়। অধিকার ও মর্যাদার দিক দিয়ে যাজকদের মধ্যেও উচ্চযাজক ও নিম্ন বা গ্রামীন যাজক এই দুটি ভাগ ছিল। উচ্চ যাজকরা ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় এস্টেট তথা অভিজাত শ্রেনী থেকে উদ্ভুত এবং সকল সুবিধাগ্রস্ত সম্প্রদায়।

দ্বিতীয় এস্টেট :

ফরাসী সমাজে দ্বিতীয় এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল অভিজাত সম্প্রদায়। তবে ফরাসী রাজ দ্বিতীয় এস্টেটভুক্ত ছিলেন না, কারণ তিনি এস্টেট প্রথার বাইরে ছিলেন। যাইহোক, দ্বিতীয় এস্টেটভুক্ত অভিজাতদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী প্রশাসন ও বিচার বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিল এবং অপর গোষ্ঠী সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অধিকার করে রেখেছিল।

তৃতীয় এস্টেট :

ফরাসী সমাজে যাজক ও অভিজাত শ্রেণী বাদে ফ্রান্সের আপামর জনসাধারণ ছিল তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্ভূক্ত। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের জনসংখ্যার প্রায় পঁচানব্বই শতাংশেরও বেশি মানুষকে নিয়ে গঠিত ছিল তৃতীয় এস্টেট। এই সম্প্রদায়ের মানুষজনের দুই ভাগে ভাগ করা যায়ম, যথা - শহুরে ও গ্রামীণ। শহুরে মানুষদের মধ্যে তৃতীয় এস্টেট যুক্ত ছিল অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী বুর্জোয়া, শ্রমিক এবং সাঁকুলেৎ বা ভবঘুরে প্রমিখেরা। অন্যদিকে তৃতীয় এস্টেটভুক্ত গ্রামীন মানুষজন তথা কৃষকরা ছিল আর্থিক দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল অথচ তারা অনান্য এস্টেটের তুলনায় অনেক বেশি কর দিতে বাধ্য থাকত। বস্তুত প্রথম ও দ্বিতীয় এস্টেটভুক্ত মানুষেরা এই তৃতীয় এস্টেটের শ্রম ও উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল ছিল।

বুরবোঁ রাজ ষোড়শ লুই এর রাজত্বকালে ফ্রান্সে একটা কথা প্রচলিত ছিল যে, 'অভিজাতরা যুদ্ধ করে, যাজকরা প্রার্থনা করে আর সাধারণ মানুষ কর দেয়।' অষ্টাদশ শতকে ফরাসী সমাজে নব্বই শতাংশের বেশি মানুষ কৃষি কাজের সাথে যুক্ত ছিল, অথচ তাদের হাতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল খুব কম। অণ্যদিকে অভিজাত, চার্চ ও এস্টেটের অণান্য বিত্তশালী মানুষের জন্মসূত্রে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। তাদের রাষ্ট্রকে কোন কর দিতে হত না। অভিজাতরা সামন্ততান্ত্রিক সুযোগ সুবিধাও ভোগ করত। তারা কৃষকদের কাছ থেকে বকেয়া অর্থ (feudal dues) আদায় করত। কৃষকেরা সামন্ত প্রভুর জমি ও বাড়িতে শ্রম দিতো, সেনাবাহনীতে যোগ দিতে কিংবা রাস্তা নির্মাণের কাজে শ্রম দিতে বাধ্য থাকত। ষোড়শ লুই এর রাজত্বকালে চার্চ ও সেনাবাহিনীর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অভিজাতদের কুক্ষিগত ছিল। অভিজাতদের মতো যাজকরাও নানা ধরণের সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। উচ্চতর যাজকদের দূর্গ,

গীর্জা ও প্রাসাদ ছিল। এদের অনেকে গ্রামে সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতেন। এদের আর্থিক ক্ষমতার এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল 'টাইথ' (Tithe) নামক ধর্মকর। এছাড়া তারা নানভাবে অর্থ উপার্জন করত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল যে, প্রথম ও দ্বিতীয় এস্টেট বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হলেও রাষ্ট্রীয় করের সমস্ত বোঝা একাকী বহন করতে হয় তৃতীয় সম্প্রদায়কে।

তৃতীয় এস্টেটভুক্ত সাধারণ মানুষজনকে বিশেষত কৃষকদের রাজা সামন্তপ্রভু ও চার্চকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নানাবিধ কর দিতে হত। রাজাকে প্রদেয় প্রত্যক্ষ করের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল টেইলি (Taile) বা আয়কর, ক্যাপিটেশন (Capitation) বা উৎপাদন ভিত্তিক আয়কর, ভিংটিয়েমে (Vingtiemes) বা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি উপর আয়কর প্রভৃতি। অণ্যদিকে পরোক্ষ কর ছিল গ্যাবেল বা লবণ কর এবং কর্ভী বা পথ কর প্রভৃতি। উল্লেখ্য এই সমস্ত কর প্রদানের পর একজন ফরাসী কৃষকের হাতে তার সম্পূর্ণ আয়ের মাত্র কুড়ি শতাংশ অবশিষ্ট থাকত। ঐতিহাসিক Leo Gershoy এর মতে অষ্টাদশ শতকে কৃষকদের ক্রমশ ভাগ্য বিপর্যয়ের পিছনে মুখ্যত তিনটি বিষয় সক্রিয় ছিল, যথা (ক) ক্রমান্বয়ে ব্যাপক হসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি , (খ) মূল্যবৃদ্ধি এবং (গ) কৃষি সংস্কারে ফিজিওক্র্যাটদের (Physiocrats) অনুপ্রেরণা। বলা বাহুল্য, 1715 খ্রিঃ এ ফ্রান্সের জনসংখ্যা 23 মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 1789 খ্রিঃ 28 মিলিয়ন হয়েছিল। এরফলে ফ্রান্সে খাদ্যশষ্যের চাহীদা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়নি। এরফলে ফ্রান্সে ধনী ও দরীদ্রের মধ্যে প্রভেদ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছিল দুর্ভিক্ষের জন্য।

ফরাসী সমাজে কৃষকের মতো বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও তৃতীয় এস্টেটভুক্ত ছিল। অধ্যাপক, আইনজীবি, চিকিৎসক, ব্যাঙ্কার ও বণিকরা ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত। প্রসঙ্গত বিত্ত বা অর্থসম্পদের মাপকাঠিতে বুর্জোয়ারা অভিজাত শ্রেণীর থেকে কোন অংশে কম ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বুর্জোয়াদের কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। বুর্জোয়ারা শিক্ষিত হওয়ায় তারা এক শ্রেণীর মানুষের জন্মসূত্রহেতু বিশেষ সুযোগ সুবিধা লাভের ধারনাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। জনলক এর 'Two Treaties of Government' এবং জাঁ জ্যাক রুশো (Jean Jacques Rousseau) এর 'The Social contract' গ্রন্থদ্বয়ে অনুপ্রানীত হয়ে বুর্জোয়ারা এমন সমাজের কল্পনা করেছিল যেখানে স্বাধীনতা, আইনের সমতা এবং সকলের জন্য সমান সুযোগের অধিকার থাকবে। বলাবাহুল্য বুর্জোয়া শ্রেনীর এই সামাজিক জাগরণেই ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারাকে পূর্ণতা দিয়েছিল। এই জন্য অনেকে ফরাসী বিপ্লবকে বুর্জোয়া বিপ্লব বলে অভিহিত করেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণ :

১৭৮৯ খ্রিঃ এর ফরাসী বিপ্লবের পিছনে ফরাসী রাজতন্ত্রের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই (১৬৪৩ -১৭১৫) পরবর্তী শাসকদের অপদার্থতা বহুলাংশে দায়ী ছিল। প্রসঙ্গত অষ্টাদশ শতকে ফরাসী রাজতন্ত্র বুরবোঁ রাজবংশের অধীন ছিল এবং ভার্সাই ছিল বুরবোঁ রাজতন্ত্রের রাজদরবার। রাজার হাতেই রাষ্ট্রের সকল প্রশাসনিক কাজকর্ম, বিচার বিভাগ এবং উচ্চপদে রাজকর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। বলাবাহুল্য বুরবোঁ রাজতন্ত্র যদি দক্ষ হত তাহলে ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণ নীতি হয়ত ফলপ্রসূ হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বুরবোঁ প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে অদক্ষ ছিল। রাষ্ট্রে প্রচলিত বুরবোঁ আইন কানুন ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। খুব সাধারণ অপরাধের জন্য প্রজাদের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হত। এই সমস্ত কিছুর ফলে ফরাসী বাসীদের দুর্দশা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তবে বুরবোঁরাজ চতুর্দশ লুই তাঁর রাজত্বকালে দক্ষতার সাথে ফ্রান্সের প্রশনাসনিক ব্যবস্থাকে সংগঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পর তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য বিপুল করের বোঝা এবং এক দুর্বল অর্থনীতি রেখে দিয়েছিলেন।

বুরবোঁরাজ পঞ্চদশ লুই (১৭১৫ - ১৭৭৪) এর রাজত্ব কালে ফ্রান্স বেশ কিছু বৈদেশিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। এর উপর পঞ্চদশ লুই এর অমিতব্যয়িতা ও বিলাসী জীবনদর্শন ফরাসী রাজতন্ত্রের অবক্ষয় ডেকে এনেছিল। প্রসঙ্গত পঞ্চদশ লুই এর রাজসভার কথা লিখতে গিয়ে অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত কমতি দ্যা মার্সি বলেছিলেন - রাজদরবারে (প্যারিসের) বিভ্রান্তি কলঙ্ক আর অবিচার ছাড়া কিছুই ছিল না।" শিকারের শখ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সুখের আগ্রহ পঞ্চদশ লুইকে আচ্ছন্ন করে রেখছিল। তাঁর রাজত্বকালে রাষ্ট্র পরিচালনায় দেখা দিয়েছিল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং অভিজাতদের সীমাহীন অনাচার, দুর্নীতি ও স্বজনপোষন রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্রকে প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছিল। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন পঞ্চদশ লুই এর রাজত্বকালে গৃহীত পদক্ষেপগুলি বহুলাংশের তাঁর মৃত্যুর পনেরো বছর পর ফরাসী বিপ্লব সংঘটনে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল। বস্তুত সার্বিকভাবে পঞ্চদশ লুই তাঁর রাজত্বকালে ফরাসী রাজকোষকে দুর্বল করে দিয়েছিলেন এবং তার সাথে ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের ধারণাকে কলঙ্কিত করেছিলেন।

পঞ্চদশ লুই এর মৃত্যুর পর ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ষোড়শ লুই (১৭৭৪-১৭৯২)। ষোড়শ লুই এর রাজত্বের শুরুর দিকে ফ্রান্সে এক আশার আলো দেখা দিয়েছিল। কারণ, তিনি রাজত্বের শুরুতেই ভলতেয়ারের বন্ধু ও বিশ্বকোষ রচয়িতা অ্যানে রবার্ট জ্যাক তুর্গো (Anne Rofert Jacques Turgot) কে ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রী ও ক্রম্পট্রলার জেনোরাল (Comptroller - General) পদে নিয়োগ করেছিলেন। আসলে ষোড়শ লুই তাঁর রাজত্বকেলে ফ্রান্সে এক নতুন গতিআনতে

চেয়েছিলেন । তাই জ্ঞানদীপ্তি ভাবধারা অনুসরণ করে ষোড়শ লুই ফ্রান্সে নৃশংসপীড়ন, ভূমিদাস প্রথা ও ভূমিকরের অবসান ঘটিয়েছিলেন এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । এছাড়া তাঁর রাজত্বকালে তুর্গোর প্রচেষ্টায় ফ্রান্সে অবাধ শিল্প ও বানিজ্য নীতি গৃহীত হয়েছিল এবং তিনি ফ্রান্সের নিম্নশ্রেণীর মানুষজনের করভার লাঘব করে অভিজাত ও যাজকদেরও করব্যবস্থার আয়তায় আনতে চেয়েছিলেন। যদিও এই সমস্ত পদক্ষেপ যাজক ও অভিজাতদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত করলে তারা এর তীব্র প্রতিবাদে সেচ্চার হয়ে উঠেছিল। শেষপর্যন্ত অভিজাতদের চাপে ষোড়শ লুই ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তুর্গো কে পদচ্যুত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

তুর্গো পরবর্তী ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রীর নানাবিধ সংস্কারের প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই প্রচেষ্টার মধ্যে সমাজ সংস্কার অপেক্ষা ফ্রান্সকে দেউলিয়া থেকে মুক্ত করার প্রবণতা বেশী ছিল । ষোড়শ লুই এদর রাজত্বকালে একজন অণ্যতম অর্থমন্ত্রী ছিলেন জেনেভির ব্যাঙ্কমালিক জ্যাক নেকার (Jacques Necker)। মেকার ১৭৪১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত প্রতিবেদন Compte rendu তে রাণী মারী আতোয়ানেৎ ও তাঁর প্রিয়জনদের অমিতব্যায়িতার কথা তুলে ধরেছিলেন । বলাবাহুল্য মারী আতোয়ানেৎ ছিলেন অষ্ট্রীয়ার রাণী মারিয়া থ্রেসা (Maria Theresa)-র কন্যা। তাই একদিকে বিদেশী এবং অণ্যদিকে ফ্রান্সের শত্রুরাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে ফরাসী জণগণ আতোওয়ানেৎ কে অত্যন্ত ঘৃনা করত । এর উপর তাঁর অমিতব্যায়িতা এবং তাঁকে ঘিরে প্রচলিত নানা বিধ গুজব ফরাসীবাসীকে রাজতন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল । যাইহোক, রাণীর প্রিয়জনদের অভিযোগেই শেষপর্যন্ত নেকার অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হয়েছিলেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন চার্লস আলেকজান্ডার ভি ক্যালোন (Charles Alexandre de-caolnne) ক্যালোন ফ্রান্সের পূর্ববর্তী অর্থমন্ত্রীরদের পন্থা অণুসরণ করেন নি । তিনি ফরাসী অভিজাতদের অমিতব্যায়িতাকে সমর্থন করেছিলেন।

ফরাসী অর্থনীতির দেউলিয়া অবস্থা ফরাসী বিপ্লবের বারুদে অগ্নি সংযোগ করেছিল । ফরাসী অর্থনীতির দেউলিয়া অবস্থা লক্ষ্য করে বিদেশী ব্যাঙ্ক মালিকরা ফরাসীরাজকে ঋণ দিতে অস্বীকার করে । পরিস্থিতির আরও অবণতি ঘটে যখন প্যারিস পার্লামেন্ট (রাজকীয় আদালত) একইসাথে রাজতন্ত্র এবং নতুন করন প্রচলনে বিরোধীতা করতে শুরু করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ষোড়শ লুই শেষ অবলম্বন হিসাবে স্টেটস জেনারেল (Estates General) এর অধিবেশন আহ্বান করেন । প্রসঙ্গত ফ্রান্সে স্টেটস জেনারেল এর শেষ অধিবেশন হয়েছিল ১৬১৪ খ্রিঃ এ। যাইহোক স্টেটস জেনারেল এর প্রতিনিধিরা ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মে মাসে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ভার্সাইতে মিলিত হন। যদিও এই অধিবেশনে প্রতিনিধিরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। অধিবেশন চলাকালে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিরা উপলব্ধি করেছিল যে অন্য দুই এস্টেটের প্রতিনিধিরা কেবল মাত্র করের ব্যাপারে আলোচনাতেই উৎসাহী। কিন্তু তৃতীয় এস্টেট চেয়েছিল স্টেটস জেনারেল এর কার্যপদ্ধতি ও প্রত্যেক প্রতিনিধির মাথাপিছু ভোটদানের ব্যাপারে আলোচনা করতে। যাইহোক, কিছুদিন অধিবেশন চলার পরই তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিরা অধিবেশন ত্যাগ করে এবং 'জাতীয় সভা' (National Assembly) গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক গ্রান্ট ও টেম্পারলী 'ফরাসী বিপ্লবের ক্ষুদ্ররূপ (French Revolution in miniature) বলে অভিহিত করেছেন।

১.৩.২. বিপ্লবের গতি :

বিপ্লব ও জাতীয় সভার কার্যাবলী (১৭৮৯ - ১৭৯১) :

টেনিস কোর্ট শপথ : ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ জুন তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিরা নিজেদের ফ্রান্সের জাতীয় সভা বলে ঘোষনা করে এবং অন্যান্য এস্টেটের প্রতিনিধিদের জাতীয় সংস্কার মূলক কর্মে অংশ গ্রহণে আমন্ত্রণ জানায়। সভাসদদের পরামর্শে ফরাসী রাজাও সংস্কার পরিকল্পনার প্রস্তাবে সম্মতি দেয়। কিন্তু এর মধ্যে ২০শে জুন তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিরা তাঁদের জাতীয় সভার কক্ষে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখেন যে দরজা বন্ধ। এরূপ পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ সদস্যরা তখন নিকটবর্তী একটি টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হয়ে শপথ গ্রহন করেন যে, যতদিন না পর্যন্ত ফ্রান্সের 'সংবিধান রচিত হচ্ছে, ততদিন তাঁরা ঐক্যবদ্ধ থাকবেন এবং মিলিত হবেন। এই ঘটনা 'টেনিস কোর্ট শপথ' নামে পরিচিত। বলাবাহুল্য এটাই ছিল ফরাসী বিপ্লবের প্রথম প্রকাশ। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই ফরাসীবাসীর রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই ফরাসীবাসীর রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছিল। যাইহোক তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিদের দৃঢ় মনোভাবের কাছে রাজা শেষপর্যন্ত নতিস্বীকারে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি তিনটি এস্টেটের সদস্যদের একত্রে একটি সভায় বসা এবং সদস্যদের মাথাপিছু ভোটের দাবী মেনে নিয়েছিলেন। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ৯ জুলাই জাতীয় সভা দেশের উজন্য নতুন সংবিধান রচনা প্রক্রিয়া শুরু করে এবং তা 'সংবিধান সভা' (Constituent Assembly)-য় পর্যবসিত হয়। তবে রাজা সমস্ত ব্যাপারকে সহজে মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনিও একই সময়ে প্যারিস ও ভার্সাইতে সৈন্য সমাবেশ করে শক্তি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। সংবিধান সভা এই সৈন্যবাহিনীর অপসারণের দাবী তুললে রাজা তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং জানিয়ে দেন যে, সতর্কতামূলক কর্মসূচি হিসাবে এই সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, রাজার এই পদক্ষেপ জনতার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে দেয় এবং তারা বাস্তিল দূর্গ আক্রমণ করে।

বাস্তিলের পতন : প্যারিসের বাস্তিল দূর্গ ছিল বুরবোঁ রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী শাসনের প্রতীক। তাই প্যারিসের জনতা কর্তৃক এই বাস্তিল দূর্গের পতনের ঘটনাকে অনেক ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবের সূচনা হিসাবে ধরেছেন। যাইহোক ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ১১ জুলাই রাজা প্যারিস ও ভার্সাই এর উপকণ্ঠে সৈন্য সমাবেশ করে জনপ্রিয় অর্থমন্ত্রি নেকার কে পদচ্যুত করেন এবং দেশত্যাগের নির্দেশ দেন। কারণ, নেকার ছিলেন তৃতীয় এস্টেটের প্রতি সহানুভূতিশীল। বলাবাহুল্য, নেকার এর পদচ্যুতির ঘটনায় প্যারিসের জনতা ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং দাঙ্গা শুরু হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করতে ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ জুলাই বাস্তিল দূর্গ আক্রমণ ও ধ্বংস করে। বাস্তিল দূর্গের পতন প্রমাণ করে যে ফরাসীবাসী জাতীয় সভার সমর্থনে রয়েছে ; তারা আর রাজার পক্ষে নেই। এরফলে রাজা ষোইড়শ লুই কে পিছু হটতে হয়। তিনি সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে নেন এবং নেকারকে অর্থমন্ত্রী পদে পুর্নবহাল করেন। এছাড়া তিনি নবগঠিত প্যারিস কমিউন (পৌরসভা) এর মেয়র হিসাবে বিপ্লবী বেইলি কে স্বীকার করে নেন। এমনকি তিনি জাতীয় সভাকে পূর্ণস্বীকৃতি দেন এবং জাতীয় রক্ষাবাহিনী (National Guard) গঠিত হলে বিপ্লবী লাকায়েৎ কে তার প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্তিতে সম্মতি দেন।

সংবিধান সভার কার্যাবলী : ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ৪ আগষ্ট সংবিধান সভা ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটায়। এছাড়া এই সভা প্রথম ও দ্বিতীয় এস্টেট ভুক্ত মানুষজনের বিশেষ অধিকার গুলির ও আইন সম্মতভাবে বিলোপ ঘটায়।২৬ আগষ্ট সংবিধান সভা 'ব্যাক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা' (Declaration of Rights of Mas and Citizen) নামে এর ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। এই ঘোষণাটি মানুষের অধিকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে বিবেচিত। এই ঘোষণাপত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মানুষের জন্মগত অধিকারগুলি স্বাভাবিক ও পবিত্র। স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নিরাপত্তা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার হল মানুষের জন্মগত অধিকার। এই সব অধিকার হস্তান্তর যোগ্য নয়। বলাবাহল্য এই ঘোষণাপত্রে কর ব্যবস্থায় সমতা, সকল মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার এবং যোগ্যতার মাপকাঠিতে যে কোন চাকরিতে সকলের সমানঅধিকার এর কথা উল্লেখ করে ফরাসী সমাজ অভিজাতদের বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলির অবসান ঘটানো হয়েছিল। এছাড়া এই ঘোষণাপত্রের দ্বারা রাজতন্ত্রের ক্ষমতাকে সীমিত করা হয় এবং রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও কাজকর্ম সকল নাগরিকের অংশ গ্রহণের অধিকারের কথা বলা হয়। এই ঘোষণাপত্রে আইনের চোখে সকল মানুষের সমানধিকার এবং জাতির সার্বভৌমত্বের আদর্শের কথা তুলে ধরা হয়। সংবিধান সভা ফ্রান্সের জন্য নতুন সংবিধান রচনার গুরু দায়িত্ব গ্রহন করেছিল। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ষোড়শ লুই স্বেচ্ছায় ১৭৯১ খ্রিঃ ফ্রান্সের নতুন সংবিধান গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সংবিধান জাতীয় সভাকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছিল।

ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : ফ্রান্সে বিপ্লবী যুদ্ধের সময় যে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হয়েছিল তা ফরাসীবাসীকে বিপুল ক্ষতি ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ফেলেছিল । ফরাসী জনগণের একটা বড় অংশ মনে করেছিল যে, ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধান কেবল সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীকেই রাজনৈতিক অধিকার দিয়েছে, তাই বিপ্লবের আরও অগ্রগতি প্রয়োজন। ১৭৮৯ থেকে ১৭৯১ এর মধ্যবর্তীকালে ফ্রান্সে যেসব রাজনৈতিক ক্লাবগুলি গঠিত হয়েছিল সেই ক্লাবগুলি হয়ে উঠেছিল এই সব মানুষদের কর্মস্থল। এখানে তারা মিলিত হয়ে সরকারের নীতি ও তাদের নিজস্ব সংস্কার পরিকল্পনা আলোচনা করত । বলা বাহুল্য এই সমস্ত রাজনৈতিক ক্লাবগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জ্যাকোবিন ক্লাব । জ্যাকোবিনদের নেতা ছিলেন ম্যাকিসমিলিওয়ন রোবস্পিয়ার (Masimilion Robespierre)। ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে ১০ আগষ্ট জ্যাকোবিন দলেচর চরমপন্থীদের টুইলারিস প্রাসাদ আক্রমণ করে রাজা ও রাজ পরিবারের সুইস দেহরক্ষীদের হত্যা করে এবং রাজাবন্দী হন। এরপর জ্যাকোবিন দলের মদতে বিপ্লবী জনতা প্যারিসের পৌরসভা বা কমিউন থেকে পুরনো সদস্যদের সরিয়ে বিভিন্ন গনপ্রতিনিধিরা ঐ সকল পদ দখল করে । এখন থেকে ফ্রান্সের বিপ্লবে প্যারিস কমিউনের সর্বময় কর্তত্ব স্থাপিত হয়। বলাবাহুল্য, কমিউনের বেআইনী নির্দেশ মান্য করে আইনসভা রাজা ষোড়শ লুই কে ক্ষমতাচ্যুত করে। রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় একটি অস্থায়ী প্রশাসনিক কাউন্সিলের হাতে। রাজার অবর্তমানে ১৭৯১ এর সংবিধান অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং নবগঠিত জাতীয় মহাসভা বা National Convertion রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ১৭৯২ খ্রিঃএ ২২ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে।

সন্ত্রাসের রাজত্ব (Reign of Terror) : ১৭৯৩ এর থেকে ১৭৯৪ এর জুলাই মাস পর্যন্ত জাতীয় মহাসভা ফ্রান্সে এক গুরুত্বপূর্ণ কঠোর ও কেন্দ্রীভূত শাসন পরিচালনা করেছিল। ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে এই শাসনপর্বকে 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' (Reign of Terror) নামে অভিহিত করা হব। আলোচ্য সময়কালে ফ্রান্সে প্রতি বিপ্লবী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ প্রাণদন্ডে দন্ডীত হয়েছিল । বলাবাহুল্য এই ভয়াবহ শাসনপর্বের মুখ্য পরিচালক ছিল জ্যাকোবিন দল। ফ্রান্সের জাতীয় মহাসভা ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে গঠন করেছিল গন নিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety)। সন্ত্রাসের পর্বে এই সমিতির হাতেই প্রশাসনের সকল ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছিল । উল্লেখ এই সমিতির উপর জ্যাকোবিন নেতা রোবনস্পিয়ারের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছিল রোবস্পিয়ার প্রজাতন্ত্রের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত সকলের (পূর্বতন অভিজাত, যাজক, অণান্য রাজনৈতিক দলের সদস্য প্রমুখ) বিরূদ্ধে এক কঠিন দন্ডনীতি অনুসরণ করেছিলেন। সন্ত্রাসের রাজত্বকালে যাঁরা প্রাণদন্ড দন্ডিত

হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বুরবোঁ রাজ ষোড়শ লুই এর পত্নী মারী আঁতোয়ানেৎ। এছাড়া রোবস্পীয়ার তাঁর নিজের দলের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা তাঁর মতবিরোধী হয়েছিলেন, তাঁদেরও প্রানদন্ডে দন্ডিত করেছিলেন। বলাবাহুল্য, রোবস্পিয়ার যে সন্ত্রাসের শাসন শুরু করেছিলেন তাতে জ্যাকোবিন দলের অনুগামীরা পর্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই অবশেষে ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাসে রোবস্পারকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২৯ জুলাই গিলোটিনে তাঁর প্রাণদন্ড কার্যকর করা হয়।

টিপ্পনী

ডিরেক্টরীর শাসন : রোবস্পিয়ারের পতনের পর একটি নতুন সংবিধান (তৃতীয় বর্ষের সংবিধান) দ্বারা ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ডিরেক্টরী নামে পরিচিত। এই ডিরেক্টরী শাসনপর্বের ১৭৯৫ এর নতুন সংবিধানে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার নীতি গৃহীত হয়েছিল। এছাড়া এই সংবিধানে দুটি পরিষদ, যথা বর্ষীয়ানদের পরিষদ (Council of Elders) এবং পাঁচশতের পরিষদ (Council of the Five Hundred) এদর উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তবে ফ্রান্সের প্রশাসনিক পূর্ণভাবে ন্যস্ত হয়েছিল পাঁচজন ডিরেক্টরের উপর। বলাবাহুল্য, এই ডিরেক্টরদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত এবং জাতীয় জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল এবং মাত্র চারবছরের (১৭৯৫ - ১৭৯৯) মধ্যেই এই শাসনের অবসান ঘটেছিল। বলাবাহুল্য বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে যে রজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই ফরাসী সেনাবাহিনীর প্রধান নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ৯ নভেম্বর এক সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা ডিরেক্টরী কে ক্ষমতাচ্যুত করে 'কনস্যুলেটের শাসন' প্রবর্তন করেছিলেন। প্রসঙ্গত নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটেছিল এবং সূচনা হয়েছিল নেপোলিয়নীয় যুগের।

অগ্রগতি পরিমাপ কর :

৫. ফরাসী বিপ্লবের দুটি কারণ লেখ।

৬. বাস্তিল দূর্গ কবে আক্রমণ করা হয়েছিল ?

৭. ফ্রান্সে প্রথম প্রজাতন্ত্র কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?

১.৪. নেপোলিয়ন বোনাপার্ট : উত্থান, সংস্কার এবং পতন

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
21

বিশ্বের ইতিহাসে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এক মহান সেনাপতি হিসাবে সমাদৃত। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ জুন নেপোলিয়ন কর্সিকা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এক অভিজাতবংশীয় সন্তান। ১৭ বছর বয়সে তিনি ফ্রান্সের গোলন্দাজ বাহিনীতে দ্বিতীয় লেকটেনান্ট হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিপ্লবোত্তর বছরগুলিতে তিনি ফ্রান্স ও বিপ্লব বিরোধী ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলির বিরুদ্ধে সকল অভিযান

টিপ্পনী

পরিচালনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জণ করেছিলেন। ইতালি ও মিশর অভিযানে তাঁর সাফল্য নিঃসন্দেহে ফ্রান্সে তাঁর জনপ্রিয়তনাকে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিল।

প্রথম কনসালরূপে নেপোলিয়ন : ফ্রান্সে ডিরেক্টরী শাসনের অবসান ঘটিয়ে নেপোলিয়ন কনস্যুলেট নামে এক নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। বলাবাহুল্য, নেপোলিয়নের এই অভ্যুত্থানে ফরাসীবাসীর সমর্থন ছিল। আসলে বিপ্লবের শুরু থেকে দীর্ঘ দিন ধরে ফ্রান্সে যে বিশৃঙ্খলতা চলছিল তাতে ফ্রান্সের জনগণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং তারা চেয়েছিল এক রাজনৈতিক স্থিরতা। যাইহোক, ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতা দখলের পর নেপোলিয়ন একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেন যা অষ্টম বর্ষের সংবিধান' নামে পরিচিত। এই সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের কার্যনবির্বাহী ক্ষমতা অর্জিত হয়েছিল তিনজন কনসালের হাতে। এই তিনজন কনসাল দশ বছরের জন্য সেনেট কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। বলাবাহুল্য, নেপেলিয়ন এমন ভাবেই সাংবিধানের খসড়া রচনা করেছিলেন যাতে প্রথম কনসালের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। এরপর নেপোলিয়ন সর্বশক্তিমান প্রথম কনসাল অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। প্রথম কনসাল হিসাবে তিনি প্রশাসনের সবক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করে শাসন পরিচালনা করতে শুরু করেছিলেন। এছাড়া প্রথম কনসাল হওয়ায় সেনেট নিয়োগের ক্ষমতাও তিনি অর্জন করেছিলেন। যাইহোক, ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন যাবজ্জীবনের জন্য প্রথম কনসাল পদলাভ করেন। এর দুই বছর পর ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ফরাসী জাতির সম্রাট উপাধি ধারন করে ফ্রান্সে তাঁর বংশানুক্রমিক শাসনের সূচনা করেন।

নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীন সংস্কার :

প্রশাসনিক সংস্কার : প্রথম কনসাল পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই নেপোলিয়ন ফ্রান্সে প্রশাসনিক সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করছিলেন। বলাবাহুল্য; শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে নেপোলিয়ন চূড়ান্ত প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ ঘটান। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অধিকার বিলোপ করে প্রদেশ, জেলা ও কমিউনে প্রথম কনসালের একক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। এছাড়া কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচনের পরিবর্তে প্রথম কনসাল কর্তৃক মনোনয়ন প্রথা চালু করা হয়। প্রথম কনসাল মনোনীত যথাক্রমে স্রিকেক্ট, সাব স্রিকেক্ট ও মেয়র নামক কর্মীর হাতে প্রদেশ ও জেলায় কাউন্সিল গুলিতে নির্বাচন প্রথা বহাল থাকে। মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য কেবল প্রথম কনসালের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। এছাড়া বিচারকদের নিয়োগের ক্ষমতাও প্রথম কনসালের উপর অর্পিত হয়।

অর্থনৈতিক সংস্কার : নেপোলিয়ন ক্ষমতা দখলের পরই ফরাসী অর্থনীতির পুনর্গঠনে সক্রিয় হয়েছিল। কারণ বিপ্লবী সরকার ফ্রান্সকে আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি দিতে

পারেন নি বরং নেপোলিয়নের সময় এই সংকট চরমে উঠেছিল। তাই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রের উপর নিজ কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই ফ্রান্সের অর্থপ্রশাসনকে কেন্দ্রীভূত করেন। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে 'ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ঋণদানের ব্যবস্থা করে। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের কর ব্যবস্থাকে সুসংহত ও কেন্দ্রীভূত করে ছিলেন। ১৮০১ - ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন সরকারী বাজেটে ভারসাম্য আনতে সফল হয়েছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে ফ্রান্সের ব্যবসায়ী ও বণিক মহলে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৮০১ খ্রিষ্টাব্দের ধর্মমীমাংসা চুক্তি : পোপের ও সাথে ফরাসী রাষ্ট্রের বিরোধের অবসান এবং ক্যাথলিকদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে নেপোলিয়ন ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে পোপ সপ্তম পায়াস (Poope pius VII)- এর সাথে ধর্ম মীমাংসা চুক্তি বা কনকরদাং এ স্বাক্ষর করেছিলেন। এই ধর্মমীমাংসা চুক্তি মারফৎ চার্চের জাতীয় করণ ঘটে এবং ফরাসী সরকার বিশপ ও যাজকদের বৃত্তি দানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এছাড়া ঠিক হয় যে, বিশপরা প্রথম বনসাল কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং পোপ সেই মনোনয়নকে স্বীকৃতি দিয়ে বিশপ পদে নিযুক্ত করবেন। সংখ্যালঘু ধর্ম গোষ্ঠী যথা ক্যালভিনপন্থী ও লুথারপন্থীরা ফ্রান্সে স্বধর্ম পালনে অধিকার পেয়েছিল। এমনকি ইহুদীরাও বিশেষ সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল।

কোড নেপোলিয়ন (Code Napoleon) : নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীন সংস্কারগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী ফলে সমৃদ্ধ ছিল তাঁর আইন বিষয়ক সংস্কার। নেপোলিয়ন একসময় বলেছিলেন, "আমার প্রকৃত গৌরব চল্লিশটি যুদ্ধে আমার বিজয় নয় ..... ওয়াটার লু (যুদ্ধ) অনেক বিজয়ের স্মৃতি মুছে দেবে। কিন্তু আমার যে কাজ স্থায়ী হবে তা হল আমার 'আইনবিধি' (Code)।" তাই এখনও বিশ্বের আইনব্যবস্থায় নেপোলিয়নীয় আইনবিধির গুরুত্ব অনুভূত হয় এবং ইওরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার মতো মহাদেশে আইনবিধি রচনায় এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যাইহোক নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার সাথে সঙ্গতি রেখেই ফরাসী আইন ব্যবস্থার সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। উল্লেখ্য তিনি ফ্রান্সের পুরনো আইনের মধ্যে প্রাক্ বিপ্লব যুগের ছাপ লক্ষ্য করেছিলেন। যাইহোক ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন 'সিভিল কোড়' তথা দেওয়ানী আইনবিধি সংকলন করেন। তারপর একে একে ফৌজদারী আইনবিধি এবং বাণিজ্যিক আইনবিধি ও দন্ডবিধি (Penal Code) সংকলিত হয়। ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে এই আইনবিধি একত্রে 'কোড নেপোলিয়ন' নামে নামাঙ্কিত হয়। উল্লেখ্য নেপোলিয়নের এই আইন সংকলনে আইনের চোখে সকলে সমান, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, ব্যাক্তি স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার, সামন্ততান্ত্রিক বৈষম্যের বিলুপ্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি স্থান পেয়েছিল।

শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার : নেপোলিয়ন ফ্রান্সের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থারও ব্যাপক

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তিনি যাজকদের শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে কমিউন বা পৌরসভার অধীনে স্থাপন করে সেগুলির তত্ত্বাবোধনের দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন প্রিফেক্ট ও সাব প্রিফেক্টদের উপর। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে 'গ্রামার স্কুল' ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যেখানে বিশেষত ফরাসী, ল্যাটিন এবং সাধারণ বিজ্ঞান এর শিক্ষা দেওয়া হত। বলাবাহুল্য, নেপোলিয়নের সময় সচরকারী ও বেসরকারী সমস্ত বিদ্যালয়ই সরকারী নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে 'লাইসী' বা উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল এবং সর্বপরি কারিগরি, সিভিল ও সামরিক শিক্ষার জন্য বিশেষ স্কুল ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এছাড়া নেপোলিয়ন ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে 'ইউনিভার্সিটি অফ ফ্রান্স' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বলাবাহুল্য, নেপোলিয়নের সময় সমস্ত স্কুলে খ্রিষ্টিয় ধর্মতত্ত্বের শিক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সম্রাটের প্রতি অণুগত নাগরিক গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়া হত।

অণান্য সংস্কার কার্যাবলী : ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন প্যারিস নগরের পুনর্গঠন করেছিলেন। এছাড়া তাঁর আমলে প্রশস্থ রাজপথগুলিকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছিল। তিনি ফ্রান্সের প্রাচীন সৌধগুলির সংস্কার এবং বহু নতুন সৌধ নির্মাণও করেছিলেন। লুভর জাদুঘরে তিনি ইতালি থেকে আনা শিল্প সৌধগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়া তাঁর আমলে বহু সেতু, খাল, বাঁধ, বন্দর প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল।

১.৪.১. নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য :

১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর নেপোলিয়নের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সামরিক সাফল্য আসে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া, পর্তুগাল ও অনান্য সহযোগী রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত তৃতীয় রাষ্ট্র জোটের বিরুদ্ধে। ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার যুগ্মবাহিনীকে অষ্টারলিগ এর যুদ্ধে এবং ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে রুশবাহিনীকে ফ্রীডল্যান্ডের (Friedland) এদর যুদ্ধে পরাজিত করে ছিলেন। বলাবাহুল্য বিভিন্ন যুদ্ধে নেপোলিয়নের সাফল্য সমরকুশলী হিসাবে তাঁর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছিল। ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন রাশিয়ার সাথে টিলসিট এর চুক্তি (Treaty of Tilsit) স্বাক্ষর করেছিলেন; এই সন্ধি ইউরোপ মহাদেশে দুই বছর ব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিল। যাইহোক, নেপোলিয়ন তাঁর রাজত্বকালে যে সমস্ত যুদ্ধ করেছিলেন তা একত্রে 'নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ' (Napoleonic War) নামে পরিচিত। এই সমস্ত যুদ্ধাভিযানের দ্বারাই নেপোলিয়ন পশ্চিম ইউরোপ ও পোল্যান্ডে ফ্রান্সের শাসন ও প্রভাববিস্তার করেছিলেন। বলাবাহুল্য নেপোলিয়নের যুদ্ধ জয়ের প্রেক্ষিতেই ফ্রান্স ইউরোপীয় মহাদেশে প্রধান শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। নেপোলিয়ন যখন তাঁর ক্ষমতার সর্বচ্চ সীমায় ছিলেন তখন ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল ১৩০ টি ডিপার্টমেন্ট বা প্রদেশ ও ৪৪ মিলিয়ন প্রজা। জার্মানী, ইতালী, স্পেন ও ডাচি আব ওয়ারশ ছিল ফ্রান্সের

আশ্রিত রাজ্য এবং প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মিত্রতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

মহাদেশীয় ব্যবস্থা (Continental System) : ১৮০৬ থেকে ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ইউরোপের ইতিহাসে নেপোলিয়নের ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে সংঘর্ষের অধ্যায় হিসাবে পরিচিত। বলাবাহুল্য ইউরোপ মহাদেশের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্টা করার পর নেপোলিয়ন শুল্ক সংরক্ষণবাদী বাণিজ্যনীতির উপর ভিত্তি করে ইউরোপীয় অর্থনীতির নিয়ামকে পরিণত হতে চেয়েছিলেন। আর কাজে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ছিল ইংল্যান্ড। প্রসঙ্গত, নেপোলিয়নের ইউরোপীয় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী ব্যবসা বানিজ্যকে ব্রিটেনের সাথে প্রতিযোগীতা থেকে রক্ষা করা। এর মাধ্যমে নেপোলিয়ন ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারও করতে চেয়েছিলেন। যাইহোক, ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বার্লিন ডিক্রি' জারী করেছিলেন। এই নির্দেশে সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অবরোধ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ফ্রান্স ও তার মিত্রদেশগুলির বন্দরগুলিতে ব্রিটেন বা তার উপনিবেশ থেকে আগত জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বার্লিন ডিক্রির পর নেপোলিয়ন ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ারশ ও মিলনে ডিক্রি এবং ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে কন্টেন ব্লু ডিক্রি জারী করে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর অবরোধ নীতিকে কার্যকর করেছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের মহাদেশীয় ব্যবস্থার ত্রুটি কিছুদিনের মধ্যেইও পরিলক্ষিত হয়েছিল। ইউরোপে ব্রিটিশ পণ্যের উপর ফ্রান্সের বয়কট ব্রিটেনকে ততটা ক্ষতিগ্রস্থ করেনি। কিন্তু ইউরোপের বেশিরভাগ দেশ ব্রিটিশ পন্যের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল থাকায় এই অবরোধ অষ্ট্রিয়, প্রাশিয়া, রাশিয়ার মতো দেশকে নেপোলিয়নের বিরোধী করে তোলে। এর উপর ফরাসী সাম্রাজ্য সুবৃহৎ হওয়ায় তা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা কঠিন ছিল এবং নেপোলিয়নের শক্তিশালী নৌবহর না থাকায় ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপর তাঁর অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে কার্যকর করাও সম্ভব হয় নি। তাছাড়া এই অবরোধ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে গিয়ে নেপোলিয়ন বেশ কয়েকটা অনাবশ্যক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। যা তাঁর মর্যাদা হ্রাস করেছিল। বলাবাহুল্য, ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের ব্যর্থতা ইউরোপের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণকে বহুলাংশে শিথিল করে দিয়েছিল। অবশেষে ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াটারলু যুদ্ধে ব্রিটেন, নেদারল্যান্ড, প্রাশিয়া, হ্যাণভার নাসাউ (Nassau) ও ব্রান্সউইক (Branswick) এর সেনাবাহিনী নিয়ে গঠিত সপ্তম কোয়ালিশন বা শক্তিজোটের কাছে নেপোলিয়ন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের পর নেপোলিয়ন অক্সিকার পশ্চিম উপকূল থেকে ১৮৭০ কিলোমিটার দূরে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিলেন। এখানেই বন্দী অবস্থায় নেপোলিয়ন তাঁর বাকি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

১.৪.২. নেপোলিয়নের ব্যর্থতার কারণ :

নেপোলিয়ন ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ার সাথে টিলসিটের সন্ধি স্বাক্ষর করে ইওরোপের রাজনীতিতে ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বেশিদিন তাঁর ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেন নি, শীঘ্রই তাঁর পত্তন শুরু হয়েছিল। ঐতিহাসিকেরা নেপোলিয়নের পতনের পিছনে নানাবিধ কারণ লক্ষ্য করেছেন। তবে নেপোলিয়নের পতন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর রাশিয়া অভিযান। এই রাশিয়া অভিযানে প্রথমদিকে ফরাসী বাহিনী সাফল্য অর্জন করে ছিল কিন্তু শেষদিকে রাশিয়ার তীব্র শীত যুদ্ধে নাটকীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং ফরাসী বাহিনীর অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়ে যায়। এরফলে নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রসঙ্গত লিও টলস্টয় এর বিখ্যাত উপন্যাস 'War and Peace' এ নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান এবং রুশ সমাজে তার প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। যাইহোক, রাশিয়া অভিযানের ব্যর্থতা ছাড়াও অনান্য যেসব কারণ নেপোলিয়নের পতনের জন্য দায়ী ছিল সেগুলি হল -

- মহাদেশীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতা
- অনবরত যুদ্ধ
- সীমাহীন উচ্চাকাঙ্খা যা নেপোলিয়নকে একের পর এক দেশ জয় প্রলুব্ধ করেছিল।
- স্পেনের গেরিলাযুদ্ধ যা নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত করেছিল। নেপোলিয়ন নিজেই একসময় বলেছিলেন 'স্পেনীয় ক্ষত' ('Spanish Ulcer') আমার সর্বনাশ করেছে
- নেপোলিয়নের ব্যাক্তিগত সীমাব্ধতা।
- ফরাসী বিপ্লব ও তারপর নেপোলিয়নের ও শাসন ফ্রান্সে এক নতুন শাসন ব্যবস্থার জন্মদিয়েছিল। বিপ্লব পরবর্তী কিছু বছর ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী রাজরতন্ত্রের পরিবর্তে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও নেপোলিয়ন কিছু কালের জন্য পুনরায় ফ্রান্সে স্বৈরাচারী শাসন ফিরিয়ে এনেছিলেন কিন্তু তাঁর আইনবিধি (Code) ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রের সমাধি রচনা করেছিল এবং বিশ্বে এক নতুন ধারা (New ordedr)-র সূচনা করেছিল। বলাবাহুল্য, নেপোলিয়ন স্বয়ং একসময় নিজেকে বিপ্লবের সন্তান বলে অভিহিত করেছিলেন। তাই বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব বিশ্ববাসীকে 'স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী'র মহান আদর্শে দীক্ষিত করেছিল এবং এটাই ছিল আধুনিক গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্রের বিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অগ্রগতি পরিমাপ কর :

৮. নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কে ? তিনি কবে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

৯. নেপোলিয়নের ব্যর্থতার দুটি কারণ উল্লেখ কর।

১.৫. রক্ষণশীলতার যুগ : ভিয়েনা কংগ্রস ও মেটারনিখ ব্যবস্থা :

টিপ্পনী

১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপীয় শক্তিজোটের কাছে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন এর পরাজয় ও আত্মসমর্পন ভিয়েনা কংগ্রসের পটভূমি তৈরি করেছিল। এর মধ্যে দিয়েই ইউরোপে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের প্রায় অবিরাম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। বলাবাহুল্য, নেপোলিয়নের মস্কো অভিযান-ই তাঁর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে বিশাল ফরাসী বাহিনী ৪২২০০০ সৈন্য রাশিয়ার তীব্র শীতে প্রাণ হারিয়েছিল। যদিও নেপোলিয়ন ৩০০০০ সৈন্যসহ ফ্রান্সে ফিরে আসতে পেরেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত ও নির্বাসিত হতে হয়েছিল। বলাবাহুল্য নেপোলিয়ন ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে নাটকীয়ভাবে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং একশত দিবস রাজত্বও (মার্চ-জুলাই, ১৮১৫) করেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ইউরোপীয় শক্তিজোট (অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া এবং গ্রেট ব্রিটেন) নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পুণর্গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছিল। প্রসঙ্গত, ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ জুন ওয়াটার লু যুদ্ধে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয়ের নয় দিন আগেই তারা প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধি স্বাক্ষর করেছিল।

নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের বিজয়ী রাজন্য ও কূটনীতিবিদরা সবথেকে জটিল ও কঠিন কাজটির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই কাজটি ছিল ইউরোপের পুনর্গঠন। আসলে নেপোলিয়নের আগ্রাসী সম্প্রসারণ নীতির ফলে ইউরোপের অধিকাংশ দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাই ইউরোপের পুনর্গঠন জরুরী হয়ে পড়েছিল। আর এই পুনর্গঠনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ভিয়েনা কংগ্রেস এর উপর। বলাবাহুল্য ভিয়েনা সম্মেলন (সেপ্টেম্বর ১৮১৪, জুন ১৮১৫) ছিল ইউরোপের ইতিহাসে এক অণ্যতম গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সমাবেশ, যেখানে ইওরোপের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করেছিল। এই কংগ্রেস অংশগ্রহণকারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিদের মধ্যে ছিলেন অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সম্রাট; প্রাশিয়া, ব্যাভরিয়া, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের রাজারা এবং মেটারনিখ ও টালির‍্যান্ড (Talleyrand) এর মতো কূটনীতিবিদরা। বলাবাহুল্য তুরষ্ক ছাড়া ইউরোপের প্রায় সকল দেশের প্রতিনিধিরা এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন।

ভিয়েনা কংগ্রসের কার্যাবলী :

ভিয়েনা কংগ্রেসের মুখ্য কাজ ছিল নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্স যেসব অঞ্চল প্রত্যার্পণে বাধ্য হয়েছিল সেই অঞ্চলগুলির বিলিবন্টন। বলাবাহুল্য ভিয়েনা

টিপ্পনী

কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই মিত্রশক্তিবর্গ এ বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে ৩০ মে প্যারিসের প্রথম সন্ধি স্বাক্ষরের সময় । পিডমন্টের রাজা, যিনি নেপোলিয়নের রাজত্বকালে তাঁর নিজের সার্ভিনীয়া দ্বীপে উদ্বাস্তু ছিলেন, সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে জেনোয়াও ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া স্থির করা হয়েছিল যে, ইউরোপের পুনর্বিন্যাসের স্বার্থেই 'ন্যায্য অধিকার নীতি' (Doctrime of legitimacy) অনুসরন করা হবে। প্রসঙ্গত এই নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, নেপোলিয়ন যেসব রাজ্যের রাজা বা রাজবংশকে ক্ষমতাচ্যুত ও উৎখাত করেছিলেন তাঁদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। যদিও এই নীতিকে মিত্রশক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী প্রয়োগ করেছিল।

রাশিয়ার দাবি :

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জোটশক্তির প্রভূত ক্ষতিসাধন হয়েছিল। তাই কংগ্রেসে জোটশক্তি নিজেদের যথাসাধ্য পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেছিল । ভিয়েনা কংগ্রেসে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজন্য ছিলেন রাশীয়ার সম্রাট প্রথম আলেকজান্ডার, যিনি নেপোলিয়ানের মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার পর নিজেকে ইউরোপের মুক্তিদাতা হিসাবে ভাবতে শুরু করেছিলেন। যাইহোক, প্রথম আলেকজান্ডার গ্র্যান্ডডাচি অব ওয়ারশ-র উপর দাবি উত্থাপন করেছিলেন। বলাবাহুল্য, এই রাজ্যটি পোল্যান্ড থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ; অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে তা পোল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আলেকজান্ডার চেয়েছিলেন এই রাজ্যটিকে পোল্যান্ডের সাথে যুক্ত করে পুরাতন পোল্যান্ড রাষ্ট্র গড়ে তুলতে এবং পোল্যান্ডকে রাশিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করে স্বয়ং পোল্যান্ডের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে। এছাড়া জার পোল্যান্ডকে একটি সংসদ ও সংবিধান প্রদানে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

প্রাশিয়ার দাবি :

প্রাশিয়া কংগ্রেস অন্যত্র ক্ষতিপূরণ লাভের শর্তে তার অধীনস্থ পোল (Polish) প্রদেশগুলি ছেড়ে দিতে উচ্ছুক ছিল । ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাশিয়া চেয়েছিলেন ড্রেসডেন ও লাইপ্রাজিগ্ এর মতো গুরুত্বপূর্ণ দুটি শহর সহ স্যাকসনী রাজ্যের উপর অধিকার লাভ । প্রসঙ্গত রাশিয়া ও প্রাশিয়া একে অপরের দাবিগুলিকে সমর্থন করেছিল। অষ্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না ; তাই তারা এর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছিল। এমনকি তারা উত্তরের এই দুই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবর্তন হয়েও প্রস্তুত ছিল। বলাবাহুল্য কংগ্রেসে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই তীব্র মতপার্থক্যই নেপোলিয়নকে এবার নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তনে সুযোগ করে দিয়েছিল । তবে জোটরাষ্ট্র গুলির মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও তারা সর্বত্রভাবে নেপোলিয়নকে ঘৃণা করত এবং নেপোলিয়নকে পর্যুদস্ত করতে বদ্ধপরিকর ছিল । তাই তারা শীঘ্রই

নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য মিটিয়ে সমঝোতা করে নেয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, রাশিয়া ডাচি অব ওয়ারশ -র সিংহভাগ অংশ পাবে ; প্রাশিয়া শুধু পোসেন (posen) লাভ করবে এবং ক্র্যাকাউ (Cracow) একটি স্বাধীন নগর হিসাবে গঠিত হবে। এছাড়া আরও স্থির হয় যে স্যাক্সণী (Saxony)-র রাজা সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন এবং তার হাতে থাকবে ড্রেসডেন (Dresden) ও লাইপজিগ (Leipzig) শহরদুটি, তবে প্রাশিয়াকে তিনি তাঁর রাজ্যের দুই পঞ্চমাংশ্য ছেড়ে দেবেন। অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাশিয়া পাবে রাইন নদীর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল সুইডিস পোমেরানিয়া (Pomerania)।

টিপ্পনী

রাশিয়ার প্রাপ্তি :

রাশিয়া ভিয়েনা কংগ্রেসে বেশ লাভবান হয়েছিল । রাশিয়া ফিনল্যান্ড (Finland) এবং তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত বেসারবিয়া (Bessarabia) ও তার সাথে দক্ষিনপূর্বে তুরস্কের কিছু ভূখন্ড লাভ করেছিল। তবে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল গ্র্যান্ড ডাচি অব ওয়ারশ (Grand Duchy of Warsaw)-র একটা বড় অংশ লাভ। এরফলে পশ্চিম ইউরোপে রুশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ঘটেছিল এবং ইউরোপের রাজনীতিতে রাশিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অষ্ট্রিয়ার প্রাপ্তি :

অষ্ট্রিয়া ভিয়েনা কংগ্রসে পোল্যান্ডের অংশ বিশেষ লাভ করে এবং হল্যান্ড ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতিপূরণ হিসাবে উত্তর ইতালির পো-উপত্যাকার একটা বৃহৎ ও সমৃদ্ধশালী অঞ্চল লোম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া পায় । এছাড়া অস্ট্রিয়া ইলিরিয়াতে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব-উপকূলে নতুন রাজ্যাংশ পায়। এইভাবে কুড়ি বছর প্রায় অবিরাম বিধ্বংসী যুদ্ধের অবসানের পর অষ্ট্রীয়া এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর অষ্ট্রিয়ার জনসংখ্যা ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দের তুলনায় চার-পাঁচ মিলিয়ন বেড়ে গিয়েছিল। বলাবাহুল্য ভিয়েনা কংগ্রসে অস্ট্রিয়া প্রান্তীয় ও অলাভজনক অঞ্চলগুলির পরিবর্তে এমন অঞ্চল লাভ করেছিল যা মধ্য ইউরোপে অষ্ট্রিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ইতালির একটা বড় অংশ লাভ এবং ইতালীয় রাষ্ট্রগুলির উপর অষ্ট্রিয়ার পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

ইংল্যান্ডের প্রাপ্তি :

নেপোলিয়নের চিরশত্রু এবং জোটশক্তির মুখ্যরাষ্ট্র ইংল্যান্ড ও ভিয়েনা কংগ্রসে ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল যার ফলে তার ঔপনিবেশীল সাম্রাজ্যের কিছু অতিরিক্ত অঞ্চল সংযোজিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও তার মিত্র বা আশ্রিত রাষ্ট্র বিশেষত হল্যান্ডের কাছ থেকে যেসব অঞ্চল জয় করেছিল তার বেশিরভাগই নিজের

টিপ্পনী

অধিকারে রাখতে পেরেছিল। এছাড়া উত্তর সাগরের হেলিপোল্যান্ড, ভূমধ্যসাগরের মাল্টা দ্বীপ ও আইওনিয় দ্বীপপুঞ্জ (Malta and Ionian Island), দক্ষিণ আফ্রিকের কেপ কলোনি (Cape-colony) এবং অন্যাণ্য কিছু দ্বীপপুঞ্জ ইংল্যান্ডের অধিকারে এসেছিল।

ইতালির মানচিত্রের পুণর্গঠন :

ভিয়েনা কংগ্রসের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল ইতালির বন্টণ বিন্যাস নিয়ে। কংগ্রেসে ক্ষতিপূরণ নীতি অণুযায়ী স্থির হয়েছিল যে, হল্যান্ড ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে অষ্ট্রিয়া ইতালির অংশ বিশেষ লাভ করবে এবং ইতালিতে পুরণো রাজবংশ গুলিকে ফিরিয়ে আনা হবে। প্রসঙ্গত, অষ্ট্রিয়ার স্বার্থেই ইতালির আঞ্চলিক বিন্যাস চূড়ান্ত হয়েছিলেন। যাইহোক, ভিয়েনা কংগ্রসে অষ্ট্রিয়া লোম্বার্ভি ও ভেনেসিয়ার মতো সমৃদ্ধশালী ও সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ইতালীয় প্রদেশের অধিকার পায়। এরফলে অষ্ট্রিয়ার পক্ষে উপদ্বীপ অঞ্চল বিশেষত নেপোলিয়নের পত্নী মারী লুইস (Marie Louises) কে দেওয়া ডাচি অব পার্মা (Duchy of parma) র উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা যম্ভব হয়েছিল। এছাড়া মডেনা এবং টাস্কানি (Tascany) তে অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশীয় প্রিন্সদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। মধ্য ইতালিতে পোপের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ইউরোপের মানচিত্রের পরিবর্তন :

ভিয়েনা কংগ্রেসে ইউরোপের মানচিত্রে অণ্যান্য যেসব পরিবর্তন করা হয়েছিল তা হল -

- ডেনমার্ক থেকে নরওয়েকে বিচ্ছিন্ন করে সুইডেনের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল।
- সুইৎজারল্যান্ডে (Switzerland) আরও ৩টি ক্যান্টন যুক্ত করে মোট ২২ টি ক্যান্টনে বিভক্ত করে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কনফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়েছিল।
- স্পেন ও পর্তুগাল এর সীমানা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল।

ভিয়েনা কংগ্রসের প্রকৃতি :

ভিয়েনা কংগ্রেস ছিল অভিজাত ও রাজণ্যদের সম্মেলন, যেখানে ফরাসী বিপ্লব প্রসূত জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক আদর্শের কেন স্থান ছিল না। সম্মেলণে সমবেত শাসকবৃন্দ নিজেদের সম্পত্তির মতো তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী ইওরোপের পুনর্গঠন করেছিলেন। আর এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা সচেতন ভাবেই জনগণের জাতীয় অনুভূতি কে অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং উদাসীন থেকেছিলেন মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি। বলাবাহুল্য ; এটা কোন বন্দোবস্ত ছিল না, কারণ এখানে সেইসব বিষয়গুলিকেই

অগ্রাহ্য করা হয়েছিল যা এই বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী করতে পারত। তাই ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তীপর্বে ইওরোপের ইতিহাসে ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রধান ত্রুটিগুলির সংশোধনের বারংবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

ভিয়েনা কংগ্রেসের সমালোচনা :

ভিয়েনা কংগ্রেসের যে আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল তা অল্প বিস্তর পরিবর্তন ছাড়া প্রায় পঞ্চাশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই সম্মেলনে যে নীতি অণুসরণের কথা বলা হয়েছিল কার্যক্ষেত্রে সেই নীতিগুলিকে পুরোপুরি অনুসরন করা হয় নি। বস্তুত ভিয়েনা বন্দোবস্ত ছিল বৃহৎ শক্তিগুলির আত্মস্বার্থরক্ষার প্রয়াস হেতু দরকষাকষি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার পরিণাম মাত্র। ভিয়েনা কংগ্রসের কূটনীতিবিদ্‌রা ইউরোপের মানুষকে প্রভাবিত করতে এবং এই সম্মেলনের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য। সামাজিক বিন্যাসের পুনর্গঠন', 'ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার', 'শক্তিসাম্য নীতির উপর ভিত্তি করে স্থায়ী শান্তি স্থাপন প্রভৃতি গুরুগম্ভীর উক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপের মানুষ এসব দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। তারা লক্ষ্য করেছিল উইরোপের পুনর্গঠন করতে গিয়ে বিজয়ীবর্গ কিভাবে নিজেদের মধ্যে কুৎসিত কাড়াকাড়িতে লিপ্ত হয়েছিল। এছাড়া তারা আরও লক্ষ্য করেছিল ইওরোপের যেসব রাজণ্যবর্গ দীর্ঘদিন ধরে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মানুষের অধিকার হরণের অভিযোগ করে আসছিল তারাই কিন্তু আজ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে একই কাজে ব্যস্ত।

পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance) :

ভিয়েনা চুক্তির পাশাপাশি মিত্রশক্তিবর্গ ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, যথা - পবিত্র চুক্তি ও চতুঃশক্তি চুক্তি (Quadruple Alliance)। এদর মধ্যে পবিত্র চুক্তির উদ্‌গাতা ছিলেন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার। উল্লেখ্য নেপোলিয়নের পতনের পর আলেকজান্ডার ধর্মীয় ভাবনা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি নিজেকে 'শ্বেত দেবদূত' (White Angel) এবং এমনকি জগতের উদ্ধারকর্তা হিসাবে দাবি করতে শুরু করেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার কাছে একটা খসড়া পেশ করেছিলেন, যা পবিত্র চুক্তি নামে পরিচিত।

এই চুক্তিপত্র উল্লেখ করা হয় যে, ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ খ্রীষ্টীয় ধর্মশক্তি অণুসারে আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করবেন। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাজন্যবর্গ পরস্পরকে ভ্রাতৃজ্ঞান করবে এবং প্রজাদের প্রতি পিতৃসুলভ আচরণ করবেন। এছাড়া তাঁরা একে অপরকে যেকোন পরিস্থিতিতে সাহায্য করবে। বলাবাহুল্য, এই চুক্তিতে রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া স্বাক্ষর করেছিল। রাশিয়ার সম্রাট অণ্যান্য ইওরোপীয় শক্তিকেও এই চুক্তি স্বাক্ষর করার আবেদন জানিয়েছিলেন। তবে এই

টিপ্পনী

চুক্তিতে স্বাক্ষর কারী রাজাদের কাছে এর বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না এবং তাঁরা এই চুক্তির নীতি অণুসারে দেশকে পরিচালিত করেন নি। তবে সমসাময়িক উদারপন্থীরা অনেকেই এই চুক্তিকে প্রগতি বিরোধী রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির পরিচায়ক বলেই মনে করেছিলেন।

টিপ্পনী

চতুঃশক্তি চুক্তি (Qduadruple Alliance) :

১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ২০ নভেম্বর রাশিয়া, প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও ইংল্যান্ড - এই চারটি রাষ্ট্র চতুঃশক্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে স্থির হয় যে, এই শক্তি চতুষ্টয়ের সাধারণ স্বার্থ নিয়ে আলোচনা এবং ইউরোপের শান্তি রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই চার রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মাঝে মাঝে বৈঠকে বসবে। এরই প্রেক্ষিতে এই চতুঃশক্তি পরবর্তী সময়ে যেসব বৈঠকে মিলিত হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে মুখ্যত অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রি প্রিন্স মেটারনিখ এর কলাকুশলীতে এই চুক্তি ইউরোপের সর্বত্র পীড়নকারী যন্ত্র পরিণত হয়েছিল।

প্রিন্স মেটারনিখ (১৭৭৩ - ১৮৫৯) :

নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৩ বছর সময়পর্বে ইউরোপের রাজনীতি সক্রিয় ছিলেন প্রবাদ প্রতিম ব্যাক্তি ক্লেমেন্স ওয়েনজেল ভন মেটারনিখ (Klemens wenzel von Metrenicn)। উল্লেখ্য, তাঁর অসাধারণ ব্যাক্তিস্বত্ত্বা ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য এই সময়কাল ইউরোপের ইতিহাসে মেটারনিখ যুগ' (Era of Metternich) নামে পরিচিত। এছাড়া তিনি এই সময় সারা ইওরোপে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন তা 'মেটারনিখ পদ্ধতি' (System of Metternich) নামে পরিচিত। যাইহোক আক্ষরিক অর্থে মেটারনিখ ছিলেন ঊনবিংশ শতকে অষ্ট্রিয়ার সবচেয়ে খ্যাতনামা রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব যাঁর প্রভাব কেবলমাত্র অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীতে সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি ছিলেন সমগ্র ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা। বলাবাহুল্য ব্যাক্তি হিসাবে মেটারনিখ ছিলেন মার্জিত রুচিসম্পন্ন, সুচতুর ও আকর্ষনীয়। লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। তিনি আকর্ষনীয় ব্যাক্তিত্ব, বাগ্মিতা ও ভদ্র ব্যবহারের জন্য খুব সহজেই অণ্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতেন। এছাড়া তাঁর দক্ষকূটনীতিজ্ঞানের জন্য তাঁকে 'কূটনীতির জাদুকর' বলা হত। আত্মপ্রত্যয়ের মতো তাঁর আত্মম্ভরিকতাও ছিল সীমাহীন। তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন যে, তাঁর জন্ম হয়েছে ইউরোপীয় সমাজের ক্ষয়িষ্ণু কাঠামোর অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য। তিনি মনে করতেন যে, তাঁর স্কন্ধেই রয়েছে জগতের সমস্ত বোঝা।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
32

দাম্ভিকতা ভরে তিনি বলতেন যে, "আমার অবস্থান এমনই বিশিষ্ট যে, আমি যেখানেই থাকি না কেন সকলের দৃষ্টি ও আশা আকাঙ্খা সেখানেই নিবদ্ধ থাকে।"

("My position has the peculiarity that all eyes, all expectations are directed to precisely that point where & happen to be.") । তিনি প্রশ্ন করতেন "আমি যা ভাবি, আমি যা করি, কেন লক্ষ লক্ষ মানুষ তা পারেনা ? এর উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন এইভাবে যে, তিনি তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কখনও 'চিরন্তন নিয়ম' থেকে বিচ্যুত হন নি' (Never Strays from the path of eternal law) এবং তাঁর চেতনা কখনোই ভ্রান্তিকে গ্রহণ করেননি' (Never entertained errors)। তিনি মনে করতেন তাঁর মৃত্যুর পর ইউরোপে এক শূণ্যতার সৃষ্টি হবে।

টিপ্পনী

মেটারনিখের চিন্তাভাবনার সামগ্রিক বিশ্লেষনে তা এককভাবে নেতিবাচক প্রতিভা হয়। ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে ঘৃণা থেকেই তাঁর এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছিল । তিনি সারা জীবন যুগধর্মকে অস্বীকার করে তার বিরোধীতা করে গিয়েছিলেন । ফরাসী বিপ্লবকে তিনি মনে করতেন বিরোধীতা করে গিয়েছিলেন । ফরাসী বিপ্লবকে তিনি মনে করতেন একটা ঘোরতর অরাজকতার ও নাশকতা তাঁর কথায় এটি 'চিকিৎসা সাপেক্ষ এক মহাব্যাধি' এক ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরি যার নির্বাপন জরুরী, এক ভয়ঙ্কর ক্ষত, সহস্র মুখ বিশিষ্ট এক মহাদাণব যা সমাজ ও সভ্যতাকে গ্রাস করতে উদ্যত।' তিনি নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং রাজতন্ত্রকে সমর্থণ করার জন্য নিজেকে ঈশ্বরের সহচর বলে মনে করতেন। তিনি সাংসদ ও প্রতিনিধিত্ব মূলক শাসনব্যবস্থাকে ঘৃণা করতেন । এছাড়া তিনি স্বাধীনতা, সাম্য ও সংবিধানের কথাবার্তাকে ক্ষতিকর বলে মনে করতেন । বস্তুত তিনি নিজেকে 'স্থিতাবস্থাবাদী' (statusquo) রূপে ও জাহির করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যা যেমনভাবে আছে সেরকমই থাকুক, সকল পরিবর্তন হচ্ছে পাগলামির পরিচয়। তিনি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও স্বশাসনের আকাঙ্খার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তনি মনে করতেন গণতন্ত্রের একমাত্র কাজ হল 'আলোক কে অন্ধকারে পরিণত করা' ('Change daylight into darkest night') । বলাবাহুল্য, এই ধরণের নেতিবাচক চিন্তাভাবনার মানুষই নেপোলিয়নের পরবর্তী ইওরোপের রাজনীতির মধ্যমণি হয়েছিলেন।

১.৫.১. ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের পর ইউরোপের প্রতিক্রিয়া অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

রোমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ফিলিসপ্পি-র যুদ্ধ (Battle of Philippi) যেমন বিপজ্জনক হয়েছিল তেমনি ওয়াটারলু যুদ্ধে নেপোলিয়নের পতন ও নির্বাসণ ইওরোপের মুক্তির ব্যাপারে অশনিসংকেত বয়ে নিয়ে এসেছিল। যদিও নেপোলিয়ন স্বাধীনতার বিষয়ে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু জ্ঞানদীপ্তিহীন স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে ফারাকটা তিনি জানতেন।

১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে ইউরোপীয় মহাদেশের

টিপ্পনী

রাজনীতিতে নেতৃরাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল অষ্ট্রিয়া। বলাবাহুল্য, ফ্রান্সের মত অষ্ট্রিয়া কোন একক রাষ্ট্র ছিল না, তা ছিল বহুজাতি অধ্যুষিত। পশ্চিমে ছিল অস্ট্রিয় ডাচিগুলি, মুখ্যত জার্মানী, যা হ্যাপসবার্গ রাজপরিবারের অধিকারে ছিল ; উত্তরা ছিল বোহেমিয়া, এই প্রাচীন রাজ্যটি হ্যাপসবার্গরা ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে লাভ করেছিল ; পূর্বে হাঙ্গেরী রাজ্য মধ্য দানিয়ুব এর বিস্তীর্ণ সমভূমি জুড়ে অবস্থিত ছিল ; দক্ষিণে আল্পস ছাড়িয়ে ছিল লোম্বার্ভি ভেনেসিয়া রাজ্য, যা পুরোপুরি ইতালীয় ছিল। অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যে দুটি প্রধান জাতিগোষ্ঠী ছিল জার্মান এবং মাগিয়ার। জার্মাণ জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যাধিক ছিল পশ্চিমের ডাচিগুলিতে। অণ্যদিকে, মাগিয়ার (Magiyars) জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল হাঙ্গেরীতে। প্রসঙ্গত, স্লাভ জাতিগোষ্ঠীর (Slavic race) অনেক শাখার বাস ছিল অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীতে। এছাড়া পূর্ব হাঙ্গেরীতে রোমানিয়রা (Romanians) ও বসবাস করত।

অস্ট্রিয়া ও পূর্বতন সমাজ (Old Regime) :

অস্ট্রিয় সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস (Francis I, 1792 - 1835) ও মেটারনিখ এর পক্ষে সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং কঠিনতম কাজ ছিল অস্ট্রিয় সম্রাজ্যের ২৯ মিলিয়ন মানুষকে শাসন করা। বলাবাহুল্য সাম্রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁরা জণগণের সমস্তরকমের সংস্কারের দাবি অগ্রাহ্য করে গ্রহণ করেছিলেন পরিবর্তন বিরোধী স্থিতাবস্থাবাদ এর নীতি। নানাবিধ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে অস্ট্রিয়ার সমাজের মানুষজণ নানা শ্রেণীতে ভাগ করত। তাদের বাধ্যতামূলক সামরিক পরিষেবা দিতে হত না এবং তারা সকল প্রকার কর থেকে মুক্ত ছিল। তারা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলি একচেটিয়াভাবে ভোগ করতর। এছাড়া বৃহৎ ভূসম্পত্তির মালিক ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে সেখান ধেকে প্রচুর রাজস্ব সংগ্রহ করত। অণ্যদিকে রাষ্ট্র সংখ্যাধিক্য কৃষকশ্রেণীর জীবন ছিল দুর্দশাগ্রস্ত। বস্তুত ১৮১৫ সালে অষ্ট্রিয়াতে একদিকে স্বৈরাচারী সরকার সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল ; অণ্যদিকে সাধারণ মানুষের উপর ছিল রাষ্ট্রের সমস্ত বোঝা এবং তাদের অবস্থা ছিল শোচনীয়।

পুলিশ ব্যবস্থা :

অষ্ট্রিয় সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রে পরিবর্তন বিরোধী স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৩ বছর অষ্ট্রিয়াতে স্থিতাবস্থা বজায় ছিল। এই সময়কালে অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মেটারনিখ। তিনি এই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য এক কঠোর পুলিশ ব্যবস্থাগড়ে তুলেছিলেন, রাষ্ট্রে সর্বত্র গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং চিন্তার স্বাধীনতাকে খর্ব করেছিলেন। থিয়েটার সংবাদপত্রও বিদেশী বই এর উপর রাষ্ট্রের তরফ থেকে কঠোর সেন্সর শিল্প প্রয়োগ করা হয়েছিল।

দেশের সর্বত্র সরকারী দপ্তর, বিনোদনমূলক স্থান, এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও

গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠক্রম তুলে দেওয়া হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু নতুন চিন্তা ভাবনার প্রকাশস্থল, তাই সকরকার ছাত্র ও অধ্যাপকদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করেছিল। এমনকি অধ্যাপকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে যেসব গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন তার সম্পূর্ণ তালিকাও সরকার পেতে চাইত। এছাড়া ছাত্রদের পড়াশোনার জন্য বিদেশ গমনও নিষিদ্ধ হয়েছিল।

সরকারের অনুমতি ব্যতীত অস্ট্রিয়বাসীদের বিদেশ ভ্রমনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল। ইউরোপের উদারনীতি সম্বলিত চিন্তাভাবনা যাতে অস্ট্রিয়াতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে অস্ট্রিয়াতে এই ধরনের কঠোর ব্যবস্থাকে কার্যকর ও টিকিয়ে রাখার জন্য সবক্ষেত্রে সাহায্য ও সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। বলাবাহুল্য, অস্ট্রিয়ার এই কঠোর ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখার সবচেয়ে ভালো পন্থা ছিল ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে এই ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। প্রসঙ্গত স্বরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে কার্যকর করার পর মেটারনিখ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রতেবেশী রাষ্ট্র বিশেষত জার্মানী ও ইতালীতে এই ব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন এবং সাময়িক সাফল্য ও পেয়েছিলেন।

আমরা এখন দেখব মেটারনিখ কিভাবে এই রক্ষণশীল ব্যবস্থার প্রয়োগ অন্যান্য রাষ্ট্রের করেছিলেন। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে বোঝা যাবে কিভাবে অস্ট্রিয়া ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে ইউরোপে একক কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। বলাবাহুল্য, এই সময়পর্বে রক্ষণশীলতার কেন্দ্রস্থল রূপে ভিয়েনা ইউরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রে অবস্থান করেছিল, আর বিপ্লবের আতুরঘর প্যারিস তখন ইউরোপ বিস্মৃত।

জার্মান কনফেডারেশন বা রাষ্ট্রসংঘ :

ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের কাছে বহুমুখী সমস্যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল জার্মানীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা। ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে গঠন করেছিলেন রাইন রাষ্ট্রসংঘ। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের সাথে রাষ্ট্রসংঘেরও বিলোপ ঘটে এবং এর বিকল্প কিছু গড়ে তোলা জরুরী হয়ে ওঠে। এরই প্রেক্ষিতে ভিয়েনা কংগ্রেসে জার্মান রাষ্ট্রসংঘ গঠন করা হয়। এদর অস্তিত ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। যাইহোক এই রাষ্ট্রসংঘ গঠিত য়েছিল ৩৮টি জার্মান রাজ্যকে নিয়ে। ফ্রাঙ্কফুর্ট এক এই রাষ্ট্রসংঘের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন ডায়েট (Diet) বা সাংসদ গঠিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য এই ডায়েটের প্রতিনিধিরা কিন্তু জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের মনোনীত ব্যাক্তি ছিলেন, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়। এই ডায়েট এর কোন ক্ষমতা ছিল না। ডায়েট এর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রতিনিধিরা কেবলমাত্র জার্মান প্রিন্সদের নির্দেশে সাধারণ সমস্যাগুলির ব্যাপারে ভোট দিতেন। অস্ট্রিয়া এই সংগঠনের সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিল। ডায়েট এর কর্মপদ্ধতি ছিল খুব জটিল ও দুর্বহ এবং যেকোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যে পরিণত করতে ডায়েটকে নানাবিধ অসুবিধা ও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হত। সর্বপরি এটা ছিল সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। যাইহোক জার্মান রাষ্ট্রসংঘ কোন প্রকৃত রাষ্ট্রগঠন করেনি বরং এটা ছিল কিছু স্বাধীন রাজ্যের অসংবদ্ধ সংঘ। সংঘবদ্ধ রাজ্যগুলি কেবলমাত্র একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার অঙ্গীকারে প্রতিশ্রুতবদ্ধ ছিল।

বলাবাহুল্য, জার্মান কনফেডারেশন ছিল জার্মান প্রিন্সদের সংঘ। সাধারণ মানুষের সংঘ নয়। এই কনফেডারেশন গঠিত হয়েছিল কারণ, জার্মান প্রিন্সরা একে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল এবং জার্মাণীর উন্নতির চেয়ে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। অণ্যদিকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মানবাসী জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এছাড়া জার্মাণির প্রগতিশীল বাতাবরণে জার্মানবাসী সর্বাগ্রে জার্মাণীর ঐক্য ও একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু মেটারনিখের কাছে ঐক্যবদ্ধ ধারণা ছিল একটি 'অপবিত্র আদর্শ' (Infamous object)। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি জার্মাণির একীকরণের সমূহ সম্ভাবণা বিনষ্ট করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং একাজে তাঁর সহায়ক হয়েছিল জার্মাণ প্রিন্সদের স্বার্থপরতা। প্রসঙ্গত, এই জার্মান প্রিন্সদের কেউই একফোঁটা নিজের কর্তত্ব ছাড়তে প্রস্তুত ছিল না।

উদারপন্থীদের হতাশা :

জার্মানীর উদারপন্থীরা কেবলমাত্র জার্মানির ঐক্য চায়নি, একই সাথে তারা জার্মানীর মুক্তিও চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল জার্মানীর ৩৮ টি রাজ্যেই একটি করে সংবিধান ও সংসদ (Parliament) গঠন এবং স্বৈরাচারী শাসনের অবসান। প্রসঙ্গত মেটারনিখ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলির বেশি বিরোধী ছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই উদারপন্থীদের এব্যাপারে গতিরোধ করতে তিনি উদ্যত হয়েছিলেন। মেটারনিখ এ কাজে সফল হয়েছিলেন। উদারপন্থীরা এব্যাপারে কেবলমাত্র অস্পষ্ট ও সদৃশমূলক প্রতিশ্রুতিই পেয়েছিল। কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছাড়া কোথাও এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয় নি।

মেটারনিখ অস্ট্রিয়াতে যে রক্ষণশীল ব্যবস্থা গ্রহন করেছিলেন তার প্রয়োগ জার্মানীতেও করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং এব্যাপারে তিনি সফল হয়েছিলেন। তবে কিছু ঘটনা মেটারনিখকে জার্মাণীতে তাঁর দমণমূলক নীতি প্রয়োগ করতে সহায়তা করেছিল। বলাবাহুল্য মেটারনিখ মনে করতেন একমাত্র কঠোর দমন নীতির মাধ্যমেই সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব। যাইহোক জার্মানীতে যে সব ঘটনা মেটারনিখকে তাঁর

নীতি প্রয়োগ সুযোগ করে দিয়েছিল তার মধ্যে অণ্যতম ছিল ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানীর ছাত্রদের ওয়াটবাগ উৎসব। লিপজিগ যুদ্ধের চতুর্থ বর্ষপূর্তি এবং প্রোটেস্ট্যাট ধর্ম আন্দোলনের ত্রিশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ওয়ার্টবাগ উৎসবের আয়োজন করেছিল। লক্ষ্যনীয় যে, এই উৎসবেদর কেন্দ্রে ছিল ছাত্রদের বলিষ্ঠ উদারনীতি সম্বলিত ভাবনা এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি তাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা। এদর কিছুদিন পরেই এক ছাত্র কোটজেবু (kotzebu) নামে এক সাংবাদিক ও নাট্যকারকে হত্যা করে। বলাবাহুল্য, এই কোটজেবুকে রুশ গুপ্তচর সন্দেহে ছাত্ররা খুব ঘৃণা করত। এই ঘটনাগুলি একত্রে মেটারনিখের হাতে জার্মানীতে তাঁর মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগে সুযোগ করে দেয় এবং তিনি এর প্রেক্ষিতে সুচতুরভাবে জার্মাণীতে কার্লসবার্ড ঘোষণা (Calsbad Decress, 1819) জারি করে দেন।

টিপ্পনী

মেটারনিখ কার্লসবার্ড ডিক্রি জারি করার মধ্য দিয়ে কফেডারেশনের মুখ্য নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, অষ্ট্রিয়া কার্লসবার্ড ডিক্রি জারী করেছিল এবং প্রাশিয়া তা সমর্থন করেছিল। এই ডিক্রি জার্মানীর মুক্তির ইতিহাসে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কার্লসবার্ড বিধানগুলি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানীর রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। যাইহোক, কার্লসবার্ড ডিক্রি মারফৎ সংবাদপত্রের উপর কঠোর সেন্সর শিপ প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের উপর সরকারী নজরদারী বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এছাড়া মেটারনিখতন্ত্র বিরোধী উদারপন্থী অধ্যাপকদের পদচ্যুত করে তাঁরা যাতে অন্যত্র কোন পদে নিযুক্ত হতে না পারেন তার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

কার্লসবার্ড ডিক্রি জারি করে জার্মানীতে ছাত্রসংগঠনও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হলে অণ্য কোথাও ভর্তির সুযোগ পেতনা। বলাবাহুল্য এইসব কঠোর নীতি কার্যকর করে আশা করা হয়েছিল যে জার্মানীতে ছাত্র ও অধ্যাপকদের গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। এছাড়া জার্মানিতে জনপ্রিয় কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠাও নিষিদ্ধ হয়েছিল। ফলতঃ মুক্ত পার্লামেন্ট সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বক্তৃতার সংকুচিত এবং আইনত নিষিদ্ধ হয়েছিল।

জার্মানীতে প্রতিক্রিয়া :

জার্মানীতে কার্লসবার্ড ডিক্রি জারি করা ছিল মধ্য ইউরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ডিক্রি একইসাথে জার্মানীতে ও অষ্ট্রিয়াতে মেটারনিখের দমননীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল। প্রাশিয়া ও এরপর সমস্ত উদারনৈতিক নীতি ত্যাগ করে অষ্ট্রিয়াকে অনুসরন করতে শুরু করেছিল। রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম নিজের প্রয়োজনের সময় প্রাশিয়ার জন্য একটা সংবিধান প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ; কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি সেই প্রতিশ্রুতি রাখেননি। উপরন্তু তিনি অর্থহীন কঠোর আইন বিধি জারী করে উদারপন্থীদের প্রতি তাঁর হীনমানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এরই

প্রেক্ষিতে প্রাশিয়াতে এক নিষ্ঠুর পর্বের সূচনা হয়েছিল।

স্পেনের রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা :

টিপ্পনী

১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন স্পেন দখল করে তাঁর ভ্রাতা যোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন এবং স্পেনের রাজা সপ্তম ফার্দিনান্দ (Ferdinand VII) ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সে কার্যত বন্দী ছিলেন। স্পোনীয়রা কিন্তু নেপোলিয়নের বিরোধীতা করেছিল এবং ইংল্যান্ডের সাহায্যপুষ্ট হবে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত সফলও হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় স্পোনের রাজা ফ্রান্সে বন্দী থাকায় স্পেনীয়রা রাজার নামে এক সরকার গঠনে অগ্রসর হয়। তবে তারা উদার প্রবন হওয়ায় ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে তারা এক সংবিধান গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত এই সংবিধান ছিল ১৭৯১ এর ফরাসী সংবিধানের অণুকরণ। এই সংবিধান স্পেনীয় রাজতন্ত্রের দৈব অধিকার তত্ত্বকে অস্বীকার করে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। তবে স্পেনের গণতন্ত্র বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ, নেপোলিয়নের পতনের পরই ফার্দিনান্দ স্পেনে প্রত্যাবর্তন করে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ভাবনাচিন্তা দমন করেছিলেন। বলাবাহুল্য, ফার্দিনান্দ সরকার স্পেনে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেছিল এবং উদারনীতি সম্বলিত সমস্ত পুস্তক - পুস্তিকা বিশেষত সংবিধানের প্রতিলিপিগুলিকে নষ্ট করে দিয়েছিল। এছাড়া সহস্রাধিক রাজনৈতিক বন্দীকে কঠোর দন্ড প্রদান করা হয়েছিল।

ফার্দিনান্দ স্পেনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শুধু মাত্র উদারনৈতিক ভাবনা চিন্তাগুলিকেই দমণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্লিপ্ত। বলাবাহুল্য, স্পেনে প্রায় ১ মিলিয়ন মানুষের বাস ছিল এবং এদের বেশির ভাগই ছিল অত্যন্ত দরিদ্র ও অজ্ঞ। কিন্তু ফার্দিনান্দের সরকার এদের অবস্থার উন্নতির কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এমনকি সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার মতো মৌলিক দায়িত্ব পালনেও এই সরকাচর ব্যর্থ হয়েছিল। এছাড়া আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশ গুলিতে কয়েকবছর ধরে যে বিদ্রোহ চলছিল তা দমন করার কোন প্রচেষ্টা স্পেনীয় সরকার করেনি।

১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে বিপ্লব :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
38

ফার্দিনান্দ সরকারের কার্যকলাপ স্পেনে এক অসন্তোষের পরিবেশ তৈরি করেছিল। বিশেষত সেনাবাহিনী রাষ্ট্রের প্রতি যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ছিল এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েইল। প্রসঙ্গত ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল, যার ফলে রাজা ১৮১২ র সংবিধানকে ফিরিয়ে আনা এবং সংবিধান অনুসারে শাসনকার্য পচরিচালনা করা প্রতুশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এছাড়া সংবিধানে বিষয়বস্তু দেশের সর্বত্র প্রচার করার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছিল।

এইভাবে ওয়াটারলুর যুদ্ধের পাঁচবছরের মধ্যেই স্পেনে বিপ্লব আবার জয়যুক্ত হয়েছিল। স্পেনে দৈবস্বত্বাধিকারী নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র পরিবর্তিত হয়েছিল সংবিধানিক রাজতন্ত্র যেখানে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্পেনের এই দৃষ্টান্ত কি ইওরোপে অন্যত্র দেখা গিয়েছিল ? পবিত্র চুক্তি স্বাক্ষরকারীরা কি এব্যাপারে নিশ্চুপ ছিল ? বৈপ্লবিক ভাবনাচিন্তাকে অষ্ট্রীয়া, জার্মানী ও ফ্রান্স সতর্কভাবে দমন করা হলেও ইওরোপের প্রত্যন্ত অংশে কি বিপ্লবের গতিরোধ করা হয়নি ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ছিল আসন্ন।

টিপ্পনী

ইতালি একটি ভৌগলিক সংজ্ঞা :

নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা কংগ্রেসে ইতালির পুরনো রাজ্যগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, ইতালিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দশটি রাজ্য ছিল যথাক্রমে - পিডমন্ট, লোম্বার্ডি ভেনেসিয়া, পার্মা, মডেনা, লুক্কা, টাস্কানি, পোপের রাজ্য, নেপলস, মোনাকো এবং সানমারিনো। জেনোয়া ও ভেনিসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করে যথাক্রমে পিডমন্ট ও অষ্ট্রিয়ার সাথে যুক্ত করা হয়েছিল।

ইতালির এই রাজ্যগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় কখনই স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। তাই ইতালিকে অষ্ট্রিয়ার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়েছিল। অষ্ট্রিয়া পো-উপত্যাকার সমৃদ্ধশালী অংশ লোম্বার্ডি-ভেনেসিয়া রাজ্য লাভ করেছিল। পার্মা, মড়েনা ও টাস্কানি ডার্চিতে অস্ট্রিয় হ্যাপসবার্গ প্রিন্সদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে এই স্থানগুলি খুব সহজেই অস্ট্রিয় ব্যবস্থার অধীনে চলে আসে। এইভাবে অষ্ট্রিয়া একইসাথে উত্তর ও দক্ষিণ ইতালিতে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব কায়েক করেছিল। নেপলস এর রাজা ফার্দিনান্দ অষ্ট্রিয়ার সাথে একটি আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক চুক্তি করেছিলেন। এই চুক্তিতে তিনি নিজেকে অস্ট্রিয়ার মিত্র হিসাবে জাহির করেন এবং লোম্বার্ডি ভেনেসিয়ার জণগন যেটুকু স্বাধীনতা পেয়েছিলেন তার চেয়ে বেশি স্বাধীনতা নিজ প্রজাদের দিতে অসম্মত হয়েছিলেন। একমাত্র পিডমেন্টের রাজা ও পোপই প্রকৃত অর্থে অস্ট্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা অস্ট্রিয়ার তুলনায় খুবই নগণ্য ছিল।

ইতালীয় প্রিন্সদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি :

ভিয়েনা সম্মেলনের পর ইতালি আবার কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমষ্টিতে পরিণত হয়েছিল এবং অধিকাংশ রাষ্ট্রের উপর অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোন রাষ্ট্রে পার্লামেন্ট ছিল না। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে না ছিল একতা, না ছিল সরকার পরিচালনায় জনগনের অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ। পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রিন্সরা হয়ে উঠেছিল নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী। ফরাসীদের তারা ঘৃণা করত এবং তাদের উপস্থিতির সকল চিহ্ন ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল। তারা ফরাসী উৎসজাত প্রতিষ্ঠানসমূহ, সংবিধান ও

টিপ্পনী

আইনের অবসান ঘটেয়েছিল। টীকা ও গ্যাসবাতির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল কারণ এগুলি ছিল ফরাসীদের উদ্ভাবন। পিডমন্টে তুরিন এর বোটানিক্যাল গার্ডেন্স এ ফরাসী দেশের গাছগুলিকে নষ্ঠ করা হয়েছিল । রাজপ্রাসাদে ফরাসী রাজপ্রাসাদে ফরাসী আসবাবপত্র গুলিকে পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হয়েছিল । বলাবাহুল্য, প্রত্যেক রাষ্ট্রে এক অধঃপতন শুরু হয়েছিল এবং ইতালীয়রা রাজনৈতিক, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছিল । এছাড়া বেশিরভাগ রাষ্ট্রে Inquisition প্রথার পুণঃবহাল করা হয়েছিল। যাজকদের উপর শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। পঠন পাঠনে বিপজ্জনক বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল। পুলিশ বিশেষ করে চিন্তাবিদের উপর নজর রাখতে শুরু করেছিল।

এইভাবে ইতালিতে হীনচেতা শাসকদের শাসন কায়েম হয়েছিল । বেশিরভাগ প্রিন্সই অষ্ট্রিয়াকে অণুসরণ করেছিল, যে অষ্ট্রিয়া ছিল রক্ষণশীলতার মূল ঘাঁটি । স্বভাবতই এরূপ অবস্থার জন্য ইতালীতে এক অসন্তোষের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। কার্বোনারী (Carbonari) নামে এক গুপ্ত সমিতি এই অসন্তোষকে বাড়িয়ে তুলেছিল এবং বিদ্রোহ সংগঠনের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে ইতালিতে এক বিদ্রোহ ঘটেছিল। এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল নেপলস এ এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। বিপ্লবীদের মুখ্য দাবি ছিল ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দের স্পেনীয় সংবিধানের ন্যায় সংবিধান প্রবর্তন। তবে বিপ্লবীদের এই সংবিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ছিল এমন নয়। তারা কেবল সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্র লক্ষ্য করে তা গ্রহণের দাবি জানিয়েছিল। যাইহোক, এই বিদ্রোহে রাজা খুব শীঘ্র বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন এবং সংবিধানেও ঘোষিত হয়েছিল।

মূল্যায়ণ :

১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে বিপ্লব পুনরায় তার আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে ফিরে এসেছিল। স্পেন ও নেপলসের বিদ্রোহ পাঁচ বছর ধরে স্থায়ী পুরাতন তন্ত্রকে উচ্ছেদ করেছিল এবং পরিবর্তে সেখানে গৃহীত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ এক সংবিধান । পর্তুগাল এত পুরাতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এধরণের বিপ্লব হয়েছিল । এমনকিও পিডমন্টেও এধরণের বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।

তৎকালীন ইওরোপের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যাক্তি মেটারনিখের কিন্তু এরূপ পরিস্থিতিতে কি করা উচিৎ তার সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ছিল। বলাবাহুল্য, ইউরোপের শান্তিভঙ্গকারী যে কোন বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ছিল ইউরোপীয় শক্তিসমবায়। ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি জানত যে, এক রাষ্ট্রের বিপ্লব অণ্য রাষ্ট্রকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং এর ফলে ভিয়েনা কংগ্রেসে ইউরোপে যে শান্তি স্থাপন করা হয়েছিল তাতে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাই তারা যখন লক্ষ্য করে যে, ইউরোপের সর্বত্র পুরাতন ব্যবস্থা

বিপর্যয়ের মুখে তখন ১৮২০ থেকে ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তারা ট্রাম্পো, লাইব্যাক ও ভেরোনাতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হয় এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য এই সম্মেলণ গুলিতে মেটারনিখ বিচক্ষণতার সাথে স্পেন ও ইতালির বিদ্রোহ দমনের সিদ্ধান্ত নিয়ে এই উপদ্বীপগুলিতে সৈণ্য প্রেরণা করেছিলেন এবং দ্রুত পুরাতন ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মেটারনিখ যেভাবে পুরাতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে হাজার হাজার মানুষ কারাবন্দী, নির্বাসিত এবং প্রানদন্ডে দন্ডিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য স্বেচ্ছাচারী সরকারের প্রতিশোধ স্পৃহাই এই মানুষগুলির দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছিল। তবে মেটারনিখ কিন্তু এতে যথেষ্ট তৃপ্ত হয়েছিলেন।

মেটারনিখ একসময় লিখেছিলেন যে 'আমি ভালো দিনের সূচনা প্রত্যক্ষ করছি'। বলাবাহুল্য নেপলস, পিডমেন্ট ও স্পেনের বিদ্রোহ দমনের মধ্য দিয়ে পবিত্র চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি ইউরোপের রাজনীতি তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিল। মেটারনিখ যে ব্যবস্থা অষ্ট্রিয়াতে প্রবর্তণ করেছিলেন তা ইউরোপের সর্বত্র দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। যদিও স্পেন ও ইতালিতে বিদ্রোহ দমন ছিল মেটারনিখ ব্যবস্থার শেষ উল্লেখযোগ্য জয়। কারণ, এরপরেই মেটারনিখ ব্যবস্থার চরম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিল এবং ক্রমশ তার কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

স্পেনে স্বৈরতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর পবিত্র চুক্তি স্বাক্ষরকারী শক্তিসমূহ আমেরিকায় স্পেনীয় উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ দমনে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এব্যাপারে তাদের ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়। উভয় রাষ্ট্রই চেয়েছিল স্পেন তার আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিজেই সমাধান করুক। পবিত্র চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের এব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই উচিত। বলাবাহুল্য, ইংল্যান্ডের নৌশক্তি যেহেতু উন্নত ছিল তাই তার পক্ষে মিত্রশক্তি কে আমেরিকার বিদ্রোহী স্পেনীয় উপনিবেশগুলিতে সৈণ্য প্রেরণে বাধা দেওয়া সম্ভব ছিল। অণ্যদিকে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ২ ডিসেম্বর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জেমস মনরো তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন, ইউরোপের স্বৈরাচারী রাজণ্যবর্গ যদি আমেরিকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হস্তক্ষেপ করে বা তাদের রক্ষণশীল পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাহলে তা আমেরিকার শান্তি ও সুরক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক হবে এবং তাদের কার্যকলাপকে আমেরিকার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব হিসাবে ধরা হবে। প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার এই বিরোধী মনোভাবের পরিণতি খুব শীঘ্রই পরিলক্ষিত হয়। কারণ এরপর আর পবিত্রচুক্তি স্বাক্ষরকারী শক্তি সমূহ বিজয়ের স্বাদ পায়নি। কয়েকবছর পর রাশিয়া নিজেই তুর্কীদের বিরুদ্ধে গ্রীকদের বিদ্রোহকে উৎসাহ দিয়েছিল এবং সমর্থন করেছিল। সর্বপরি ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে বিপ্লব সংঘটিত হলে মেটারনিখ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

অগ্রগতি পরিমাপ কর :

১০. নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এর পতনের পর রাশিয়া কি দাবি উত্থাপন করেছিল ?

টিপ্পনী

১১. নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের মানচিত্রে কি কি পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল ? যেকোন দুটি পরিবর্তন লেখ।

১২. চতুঃশক্তি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির নাম লেখ।

১.৬. সংক্ষিপ্তসার :

টিপ্পনী

- ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক জ্ঞানদীপ্তির যুগ হিসাবে পরিচিত। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকেই এই যুগের সূচনা হয়েছিল।
- ফরাসী জ্ঞানদীপ্তি চিন্তাবিদরা 'ফিলজফ' (Philsophe) নামে পরিচিত ছিলেন। ফরাসী ফিলজফদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল বিশ্বকোষ গ্রন্থমালার প্রকাশনা।
- জ্ঞানদীপ্ত যুগের চিন্তাবিদদের রচনায় মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে নতুন ভাবনাচিন্তা প্রকাশ পেয়েছিল। বিশেষত নতুন সমাজ গঠনের প্রতি তাঁরা বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।
- জ্ঞানদীপ্তি যুগের পন্ডিত হ্যামিলটনের মতে, জ্ঞানদীপ্তি ভাবাদর্শের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল যুক্তি, ব্যবহারিকবাদ, বিজ্ঞান, সার্বজনীনবাদ, অগ্রগতি, সহনশীলতা এবং স্বাধীনতা।
- জ্ঞানদীপ্তি ছিল তিনপ্রজন্মের চিন্তাবিদদের মতাদর্শের ফসল।
- তিন প্রজন্মের চিন্তাবিদদের মধ্যে প্রথম প্রজন্মের মধ্যে ছিল ফরাসী চিন্তাবিদ ভলতেয়ার (১৬৯৪ - ১৭৭৮) এবং মান্তেস্কু (১৬৮৯ - ১৭৫)। দ্বিতীয় প্রজন্মের চিন্তাবিদদের মধ্যে ছিলেন স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম এববং ফরাসী দার্শনিক রুশো ও দিদেরো। অণ্যদিকে তৃতীয় প্রজন্মের চিন্তাবিদদের মধ্যে ছিলেন জার্মাণ দার্শনিক কান্ট এবং স্কটিশ দার্শনিক অ্যাডাম স্মিথ ও অ্যাডাম ফার্গুসন।
- জ্ঞানদীপ্তি যুগে নব্যধ্রুপদীবাদের প্রভাব ও ভাস্কর্যের উপর পড়েছিল। আলোচ্য সময়ে স্থাপত্যের মধ্যে ফুটে উঠেছিল "The nolle simplicity and tranquil loftiness of the ancients."
- অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে সিম্ফনি, সোনাটা, কনসার্ট এবং চেম্বার মিউজিক সঙ্গীতের আঙ্গিককে বদলে দিয়েছিল। সঙ্গীতে ব্যারোক শৈলীর প্রয়োগ ঘটত অপেরা (Opera) , সঙ্গীতে যা ছিল খুবই সুরসমৃদ্ধ এবং আবেগসম্পূর্ণ।
- অষ্টাদশ শতকে নব্যধ্রুপদীবাদের প্রভাব শিল্পকলার তুলনায় সাহিত্যে অধিক পরিলক্ষিত হয়েছিল। যুক্তির যুগে (Age of Reason) ইংল্যান্ডের বিখ্যাত কবি ছিলেন আলেকজান্ডার পোপ (১৬৮৮ - ১৭৪৪)। এছাড়া অপর দুই উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন অ্যানে ফিঞ্চ (১৬৬১ - ১৭২০) এবং ম্যাসচুসেটস এর ক্রিতদাসী ফিলিস হুইটলি (১৭৫৩ -১৭৮৪)। হুইটলি তাঁর কবিতাগুলির মধ্যদিয়ে একইসাথে

দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি এবং আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার কথা তুলে ধরেছিলেন।

- অষ্টাদশ শতকে সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে উপন্যাস রচনা শুরু হয়েছিল। প্রথমে ফ্রান্সে ও তারপপরে ইংল্যান্ডে উপন্যাস রচনা বেশ জনপ্রিয় অর্জন করেছিলল। এই সময় জনপ্রিয় উপ্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রবিনসন ক্রুশো (১৭১৯), পামেলা (১৭৪০-১৭৪১) এবং টমজোনস (১৭৪৯)।
- অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল অসাম্য এবং অভিজাত প্রভাবিত। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে বুরবোঁরাজ ষোড়শ লুই, স্পেনে তৃতীয় চার্লস, এবং রাশিয়াকে ক্যাথরিন দ্যা গ্রেট এর শাসন চলছিল। এমনকি গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেন্টেও বাহুলাংশে রাজা তৃতীয় জর্জ ও ইংরেজ অভিজাত পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত ছিল। ইউরোপের অভিজাততন্ত্রের উপর সাধারণ মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব ছিল না। বেশিরভাগ মানুষই ছিল সার্ক এর মতো যাদের নিজস্ব কোন অধিকার ছিল না। এর ফলে ইউরোপের সাধারণ মানুষের মধ্যে অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল।
- সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টির জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় সমস্ত রকম করের বোঝা দরিদ্র মানুষের উপরেই পড়ে এবং দরিদ্র মানুষের অর্থের উপর ভিত্তি করেই অভিজাতরা সমস্তরকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। এছাড়া সমকালীন পরিস্থিতির সাথে রেনেসাঁস প্রসূত ধ্যানধারণাও ইউরোপের মানুষজনের মধ্যে ক্রমশ একটা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেই সময় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রসার ঘটেছিল এবং ধর্মীয় মতাদি সংক্রান্ত অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন বৃদ্ধি পাচ্ছিল।
- ফরাসী বিপ্লব বিশ্বের ইতিহাসে এমন এক যুগান্তকারী ও সুদূরপ্রসারী ঘটনা যা কেবলমাত্র ইউরোপের পরিবর্তন ঘটায়নি, এই বিপ্লবপ্রসূত ভাবধারা এক নতুন ধরণের রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল। এই ফরাসী বিপ্লবের পিছনে যে সমস্ত কারণ সক্রিয় ছিল তাদের দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা - সামাজিক ও রাজনৈতিক।
- বিশ্বের ইতিহাসে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এক মহান সেনাপতি হিসাবে সমাদৃত। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ জুন নেপোলিয়ন কর্সিকা দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক অভিজাতবংশীয় সন্তান। ১৭ বছর বয়সে তিনি ফ্রান্সের গোলন্দাজ বাহিনীতে দ্বিতীয় লেফটেনান্ট হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।
- নেপোলিয়ন বিপ্লবোত্তর বছরগুলিতে ফ্রান্স ও বিপ্লববিরোধী ইউরোপীয় রাজশক্তি গুলির বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ইতালি ও মিশর অভিযানে তাঁর সাফল্য নিঃসন্দেহে ফ্রান্সে সমরনেতা হিসাবে তাঁচর জনপ্রিয়তাকে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিল।

- সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর নেপোলিয়নের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সামরিক সাফল্য আসে অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া পর্তুগাল ও অন্যান্য সহযোগী রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত তৃতীয় রাষ্ট্রজোটের বিরুদ্ধে। ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার যুগ্মবাহিনীকে অস্টার লিজ এর যুদ্ধে এবং ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে রুশ বাহিনীকে ফ্রীডল্যান্ডের যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। বলাবাহুল্য, বিভিন্ন যুদ্ধে নেপোলিয়নের সাফল্য সমরকুশলী হিসাবে তাঁর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছিল।
- নানাবিধ কারণের জন্য নেপোলিয়নের পতন ঘটেছিল। এই কারণগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তাঁর মস্কো অভিযান, মহাদেশীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতা, স্পেনীয় ক্ষত, সীমাহীন উচ্চাকাঙ্খা প্রভৃতি।
- ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপীয় শক্তিজোটের কাছে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের পরাজয় ও আত্মসমর্পন ভিয়েনা কংগ্রেসের পটভূমি তৈরি করেছিল। ইউরোপীয়ান শক্তিজোট (অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া এবং গ্রেট ব্রিটেন) নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পুনর্গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছিল। ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ জুন ওয়াটার লু যুদ্ধে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয়ের নয় দিন আগেই তারা প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধি স্বাক্ষর করেছিল।
- নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ ইউরোপের রাজনীতিতে আকর্ষনীয় ব্যাক্তিত্ব ছিলেন ক্লেমেন্স মেটারনিখ।

১.৭. শব্দ পরিচিতি :

- জ্ঞানদীপ্তির যুগ :- ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক জ্ঞানদীপ্তির যুগ হিসাবে পরিচিত।
- ব্যবহারিকবাদ :- এই ভাবাদর্শে মনে করে হয় প্রাকৃতিক ও সামাজিক জগতের সকল জ্ঞানের উৎস প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।
- সার্বজনীনবাদ :- এই ভাবাদর্শে মনে করা হয় যুক্তি ও বিজ্ঞান সব অবস্থায় অকাট্য এবং জগতের সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা এর মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব।
- নব্যধ্রুপদীবাদ :- শিল্পকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত অথবা স্থাপত্য কর্মে প্রাচীন বা ধ্রুপদী শৈলীর পুনরুজ্জীবনই নব্যধ্রুপদীবাদ নামে পরিচিত।
- ব্যারোক :- সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় স্থাপত্য, সঙ্গীত ও চারুকলায় অনুসৃত একধরণের শৈলী ছিল ব্যারোক। এই ব্যারোক শৈলীর মধ্যে ম্যানারিজম (Mannerism) এর প্রভাব ছিল এবং এই শৈলীতে মাত্রারিক্ত অন্য করনের উপর

গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। স্থাপত্য ক্ষেত্রে ব্যারোক শৈলীর অণ্যতম দৃষ্টান্ত হল ভার্সাই রাজপ্রাসাদ। অণ্যদিকে সঙ্গীতকলায় সুরস্রষ্ঠা বাঘ ও ভিভাল্ডি (Vivaldi) ব্যারোখ শৈলীর পচরয়োগ ঘটিয়েছিলেন।

- রেনেসাঁস :- চতুর্দশ শতকে ইউরোপে সাহিত্য ও শিল্পকলায় প্রাচীন ঐতিহ্যের যে পুনঃজাগরণ ঘটেছিল তা রেনেসাঁস নামে পরিচিত। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপে এই রেনেসাঁস বা নবজাগরণ পর্বের স্থায়িত্ব ছিল। এই রেনেসাঁস এর পর্বেই মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে আধুনিকতার আলোয় ইউরোপের উত্তরণ ঘটেছিল।

টিপ্পনী

১.৮. উত্তরের সাহায্যে অগ্রগতির পরিমাপ :

১. ফরাসী জ্ঞানদীপ্তি চিন্তাবিদরা 'ফিলজফ' নামে পরিচিত ছিলেন। এই ফিলজফরা পুরোপুরি ছিলেন না। আজকের দিনে সংবাদিকদের সাথে তাঁদের তুলনা করা যেতে পারে। এঁরা কোন বিশেষ হাতিয়ার ছাড়াই প্রায় সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগে সত্যের অনুসন্ধান করত। এই ফিলজফদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) গ্রন্থমালার প্রকাশনা।

২. Paradigm হল পরস্পর সংযুক্ত ভাবনা, মূল্যবোধ, নীতি এবং তথ্যের একসমষ্টি যার মধ্য দিয়ে যুক্তিসঙ্গত তাত্ত্বর বিকাশ ঘটে।

৩. জ্ঞানদীপ্তি ভাবাদর্শের দুটি বৈশিষ্ট্য হল -

(ক) যুক্তি : যুক্তির নিরিখে সমস্ত কিছু বিচার বিশ্লেষন ও জ্ঞান আহরণ।

(খ) ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ : এই ধারণা অনুযায়ী ব্যাক্তি নিজেই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা যুক্তিবোধ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত।

৪. অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের দুইজন মহিলা লেখক ছিলেন - Madame de Graffighy (1695 - 1758) ও ফ্যানি বার্নে (Fanny Burney, 1753 - 1840)।

৫. ফরাসী বিপ্লবের দুটি কারণ ছিল -

(ক) সামাজিক কারণ : অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যেই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল এবং ষোড়শ লুই এর রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছিল। বলাবাহুল্য, এই সম্য় ফরাসী সমাজ সুবিধাপ্রাপ্ত (Hoves) এজবং সুবিধাহীন (Hore not) এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।

(খ) রাজনৈতিক কারণ : ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের পিছনে যে দুটি রাজনৈতিক কারণ ছিল তা হল - ১. ফরাসী রাজতন্ত্রের নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং ২. বুরবোঁরাজ পঞ্চদশ লুই (১৬৪৩ - ১৭১৫) পরবর্তী ফরাসী রাজাদের

টিপ্পনী

অপদার্থতা।

৬. একদল দাঙ্গাবাজ জণতা অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করার লক্ষ্যে ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ জুলাই বাস্তিল আক্রমণ করে তার পতন ঘটিয়েছিল।

৭. জাতীয় মহাসভা বা ন্যাশানাল কনভেনসন ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে ২২ সেপ্টেম্বর ফরাসী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ফ্রান্সকে প্রজাতান্ত্রিক বলে ঘোষনা করেছিল।

৮. বিশ্বের ইতিহাসে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এক মহান সেনাপতি হিসাবে সমাদৃত। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ জুন নেপোলিয়ন কর্সিকা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৯. নেপোলিয়নের পতনের দুটি কারণ ছিল -

(ক) ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে সর্বনাশা রাশিয়া অভিযান।

(খ) মহাদেশীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতা।

১০. নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিজোটের প্রভূত ক্ষতি সাধন হয়েছিল তাই ভিয়েনা কংগ্রসে জোটশক্তি নিজেদের যথাসাধ্য পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেছিল। ভিয়েনা কংগ্রেসে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজণ্য ছিলেন রাশিয়ার সম্রাট প্রথম আলেকজান্ডার, যিনি নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের ব্যাথর্থতার পর নিজেকে ইউরোপের মুক্তিদাতা হিসাবে ভাবতে শুরু করেরছিলেন। তিনি গ্রান্ড ডাচি অব ওয়ারশর উপর দাবি উত্থাপন করেছিলেন।

১১. নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতনের পর ইউরোপের মানচিত্রে যে দুটি পরিবর্তন করা হয়েছিল, তা হল -

ডেনমার্ক থেকে নরওয়ে কে বিচ্ছিন্ন করে সুইডেনের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল।

সুইৎজারল্যান্ডে আরও ৩টি ক্যন্টন যুক্ত করে মোট ২২টি ক্যান্টনে বিভক্ত করে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কনকেভারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়েছিল।

১২. রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও ইংল্যান্ড চতুঃশক্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল।

১.৯. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী :

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১. জ্ঞানদীপ্তি ভাবাদর্শের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২. জাতীয়তাবাদ কি ?

৩. অষ্টাদশ শতকে দুইজন মহিলা চিত্রকরের নাম লেখ। এই সময় মহিলা চিত্রকরের সংখ্যা কম ছিল কেন ?

৪. ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের স্পেনীয় বিদ্রোহ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫. প্রিন্স মেটারনিখ কে ছিলেন ? তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কেন ?

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর :

১. জ্ঞানদীপ্তি যুগের তিনপ্রজন্মের মুখ্য চিন্তাবিদদের সম্পর্কে আলোচনা কর।

২. অষ্টাদশ শতককে জ্ঞানদীপ্তি যুগ কেন বলা হয় ?

৩. জ্ঞানদীপ্তি যুগের সূচনার পিছনে কি কি বিষয় কাজ করছিল ?

৪. অষ্টাদশ শতকে শিল্পকলার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫. ফরাসী বিপ্লব ও জাতীয় সভা (১৭৮৯ -১৭৯১)-র কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬. ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দ্বিতীয় একক

শিল্প বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং চীন ও জাপানের অগ্রগতি

টিপ্পনী

২.০ ভূমিকা

২.১. একক উদ্দেশ্য

২.২. ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব : কারণ ও ফলাফল

- ২.২.১. বস্ত্রশিল্পে বিপ্লব
- ২.২.২. লৌহ ও কয়লা শিল্প
- ২.২.৩. শিল্প বিপ্লবের ফলাফল

২.৩. আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ

- ২.৩.১. আমেরিকার বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিক ভাবনা
- ২.৩.২. আমেরিকার বিপ্লব ও স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ
- ২.৩.৩. আমেরিকার বিপ্লব ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনাবলী
- ২.৩.৪. আমেরিকার বিপ্লবের ফলাফল ও তাৎপর্য

২.৪. দাসপ্রথা

- ২.৪.১. দাসপ্রথা অবসানের আদিকথা
- ২.৪.২. আব্রাহাম লিঙ্কন ও দাসপ্রথার অবসান

২.৫. আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ও আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা

- ২.৫.১. রাষ্ট্রসংঘের পরাজয়ের কারণ
- ২.৫.২. উপসংহার

২.৬. চীনের আদিম যুদ্ধ

- ২.৬.১. প্রথম আফিম যুদ্ধ
- ২.৬.২. দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ
- ২.৬.৩. আফিম যুদ্ধের কারণ
- ২.৬.৪. অসম চুক্তিসমূহ

২.৭. ঊনবিংশ শতকে জাপানের অগ্রগতি

টিপ্পনী

২.৭.১. জাপানের উন্মুক্তকরণ, কমোডর পেরি এবং শোগুনতন্ত্রের উপর প্রভাব

২.৭.২. অসম চুক্তিসমূহ

২.৮. সংক্ষিপ্তসার

২.৯. শব্দপরিচিতি

২.১০. উত্তরের সাহায্যে অগ্রগতির পরিমাপ

২.১১. প্রশ্নাবলী

২.০. ভূমিকা :

এই এককে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আমেরিকার গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

১৮২০-র দশকে শিল্প বিপ্লব কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন এক ফরাসী। তিনি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে থেকে ব্রিটেনে যে অগ্রগতি শুরু হয়েছিল তা লক্ষ্য করেই শিল্প বিপ্লব কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। বলাবাহুল্য, ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থায় যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল তাকে 'শিল্প বিপ্লব' হিসাবে উল্লেখ করা হয়। যদিও শিল্প বিপ্লবের সর্বোচ্চ গতি পরিলক্ষিত হয়েছিল ১৭৮০ থেকে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। যাইহোক, শিল্প বিপ্লবের ফলে শিল্প সংগঠনের ক্ষেত্রে শিল্পী বা কারিগরের নিজস্ব বাসস্থানের পরিবর্তে বড় কারখানায় উৎপাদন গুরুত্ব পেয়েছিল এবং উৎপাদন ও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে উৎপাদন ব্যবস্থার এই পরিবর্তনের মূলে ছিল নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা এবং নতুন যন্ত্রশক্তির উদ্ভাবন ও যন্ত্রের বহুল ব্যবহার।

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ আফ্রিকা ও এশিয়া ছাড়া ও আমেরিকা মহাদেশে নিজেদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। ব্রিটেন ছিল এদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আমেরিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে একসময় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল রাজতান্ত্রিক শাসননীতি। আমেরিকায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে। শেষপর্যন্ত আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করে আমেরিকার ১৩ টি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। বলা বাহুল্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমেরিকা বাসীর দীর্ঘ সাতবছরের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে এবং ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন আমেরিকার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এছাড়া আমেরিকার বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে আমেরিকার সমাজে নানাবিধ আর্থসামাজিক পরিবর্তন এসেছিল।

২.১. একক উদ্দেশ্য :

এই এককে ঊনবিংশ শতকে চীন ও জাপানের অগ্রগতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে। আলোচ্য সময়ে চীন নানাবিধ সামগ্রী ব্রিটেনে রপ্তানী করত। কিন্তু চীনের কোন দ্রব্যের আমদানি করা প্রয়োজন ছিল না। এই একতরফা বাণিজ্য সমকালীন অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটেনের কাছে কাম্য ছিল না। এরই প্রেক্ষিতে ব্রিটেন আফিম ব্যবসার মাধ্যমে চীনের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল। বলাবাহুল্য ব্রিটেন ভারতবর্ষে উৎপন্ন আফিমকে ব্যবহার করে চীনকে বাধ্য করেছিল অসম চুক্তিসমূহ স্বাক্ষর করতে।

জাপানের ভৌগলিক অবস্থান প্রধান বাণিজ্যপথ থেকে দূরবর্তী হওয়ায় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পশ্চিমী শক্তিবর্গের দৃষ্টি জাপানের উপর পড়েনি। তবে ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌঅধিকর্তা কমোডোর ম্যাথেউ পেরি (Commodore Mathew Perry) জবরদস্তিভাবে জাপানের শতাব্দী প্রাচীন রুদ্ধদ্বার নীতির অবসান ঘটিয়েছিলেন। কমোডোর পেরি জাপানের সাথে যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন তা আপাতভাবে ক্ষতিকর না হলেও এই চুক্তিকে উপলক্ষ্য করেই পশ্চিমী সম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি জাপানের সাথে একাধিক অসম চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল।

- আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ।
- দাসপ্রথা।
- আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ ও আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা।
- চীনে আফিম যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল।

২.২. ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব : কারণ ও ফলাফল :

ইংল্যান্ডেই সর্বপ্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল। তবে শিল্প বিপ্লবের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ ও বিতর্ক রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে যে বিষয়গুলি ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, সেগুলি হল -

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি : ইংল্যান্ডে বসবাসের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং তারসাথে সপ্তদশ - অষ্টাদশ শতকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নতি ইংল্যান্ডে মৃত্যুহার কমিয়ে দিয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে ইংল্যান্ডে অতিরিক্ত খাদ্য, পণ্যসামগ্রী, আবাসস্থল এবং জ্বালানীর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য ইংল্যান্ডে উৎপাদন বৃদ্ধিও জরুরী হয়ে পড়েছিল। এইভাবে ইংল্যান্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ইংল্যান্ডে শ্রমিকদের জোগানও সহজলভ্য হয়েছিল।

২. ভৌগলিক অবস্থানগত সুবিধা : ইংল্যান্ডের কোন অঞ্চলই সমুদ্র থেকে ৭০

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মাইলের চেয়ে বেশি দূরে ছিল না। উপকূল এলাকায় জাহাজ চলাচলের অনুকূল পরিবেশ ছিল। এছাড়া প্রাক্ শিল্প বিপ্লব যুগে ইংল্যান্ডে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকলেও আলোচ্য সময়ে তার উন্নতি ঘটেছিল। ফলে পূর্বে ইংল্যান্ডে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য চলাচলে যেটুকু অসুবিধা ছিল তা শীঘ্রই দূরীভূত হয়েছিল।

৩. আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সহনশীল পরিবেশ : ইংল্যান্ডে দীর্ঘদিন ধরে আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় ছিল এবং কোনরকম ধর্মীয় বা রাজনৈতিক অসন্তোষের পরিবেশ তৈরি হয় নি। হ্যানোভারীয় ইংল্যান্ডের শুল্কনীতি ও আইনকানুন প্রত্যেককে স্বাধীতা দিয়েছিল এবং ব্যাক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করেছিল। সেখানে চিন্তার স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিবেশ থাকায় বণিক শ্রেণী মূলধন সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করতে পেরেছিল। বিদেশী বণিক, যারা ইংল্যান্ডে স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য চলে গিয়েছিল তাদের অসাধারণ শিল্প ও ব্যবসায়ীক দক্ষতা ছিল এবং তারাও ইংল্যান্ডের অগ্রগতিতে অংশ নিয়েছিল। তদুপরি সপ্তদশ শতকের বিশৃঙ্খলার অবসানের পর ইংল্যান্ডে এক রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা এসেছিল। ইংল্যান্ড অভিজাততন্ত্রের প্রভাব থাকলেও অভিজাতরা কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যকে ভালোচোখে দেখত। যেখানে মহাদেশের অন্যান্য দেশের অভিজাতরা ব্যবসা বাণিজ্যকে অবজ্ঞা করত। এছাড়া ইংল্যান্ড বিদেশী আক্রমণের অশান্তি থেকেও মুক্ত ছিল। বলাবাহুল্য এই ধরনের সুস্থিত পরিবেশ পর্তুগাল, স্পেন ও হল্যান্ডেরও ছিল, ফলে এই সব দেশেও শিল্প বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

৪. প্রোটেস্ট্যান্ট তত্ত্ব : কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইংল্যান্ডে পিউরিটানদের চরম প্রোটেস্ট্যান্টবাদ এমন এক দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করেছিল যা সম্পদ সৃষ্টি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়েছিল। একথাও বলা হয় যে, পিউরিটানদের কঠিন পরিশ্রমের মানসিকতা ও সহজ সরল জীবনযাপন পদ্ধতি তাদের বিত্তশালী করে তুলেছিল এবং সেই অর্থ তারা নতুন ব্যবসায়ী উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে পারত। বলাবাহুল্য, বহু ব্রিটিশ শিল্পপতি ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্টপন্থী এবং প্রাচীন পিউরিটান সম্প্রদায় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

৫. ব্রিটেন একটা ব্যবসায়ী রাষ্ট্র : ব্রিটেনে অনেক আগে থেকেই একটা সুষ্ঠ এবং উন্নত বাণিজ্যক ব্যবস্থা ছিল। ফলে শিল্পের বিকাশ ঘটলেও ব্রিটেন তা পরিচালনায় সক্ষম ছিল। ব্রিটেনে জাহাজ, ব্যাঙ্ক, বিমা কোম্পানী এবং বিনিময় সংস্থার অস্তিত্ব ছিল। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস ইউরোপে মুক্ত বাণিজ্যকেন্দ্র তৈরি করেছিল যেখানে অজস্র শুল্কনীতির বেড়াজালে বিভক্ত করেছিল জার্মানী, ইতালি ও ফ্রান্সকে। ব্রিটেনে পৌরসভা বা গিল্ড এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বাধানিষেধ ছিল খুবই অল্প।

৬. অর্থনৈতিক মত : স্কটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ তাঁর 'The Wealth of

Nations' (1776) গ্রন্থে তৎকালীন শিল্পও বাণিজ্য সংক্রান্ত বাধানিষেধ গুলিকে পরিত্যাগের কথা বলেছিলেন । তাঁর এই বক্তব্যে অনেকক রাজনীতিবিদ অবাধ বাণীজ্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন । অ্যাডাম স্মিথ এর অনুগামীরা প্রচার করেছিলেন সংরক্ষণ বিমুক্ত অর্থনীতি (laissez faire)-র তত্ত্ব, যেখানে শিল্প ও ব্যবসা -বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধীতা করা হয়েছিল।

৭. মূলধনের প্রাচুর্য : ব্রিটেনে মূলধনের প্রাচুর্য সেখানে উন্নতমানের কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল যাকে বাণিজ্যক বিপ্লব (Commercial Revolution) বলে অভিহিত করা হয়। সেই সময় ইংল্যান্ডে বিপুল নগদ যোগান ছিল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার সুযোগও ছিল । এছাড়া নগদ অর্থ সহজলভ্য হওয়ায় ইংল্যান্ডে ঋণের সুদের হার হ্রাস পেয়েছিল। বলাবাহুল্য, ইংল্যান্ডে সুদের হার ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে ১০ শতাংশ থেকে কমে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ৩ শতাংশ হয়ে গিয়েছিল এবং এর ফলে ব্যবসার প্রয়োজনে সহজে ঋণ নেওয়াও সম্ভবপর হয়েছিল । এছাড়া ইংল্যান্ডে ব্যবসা প্রসারের পিছনে আরও একটা কারণ ছিল যে, ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা থেকে লব্ধ মুনাফাকে সর্বদা নিজেদের ব্যবসায় পুনর্বিনিয়েগ করতে প্রস্তুত থাকত ; যেখানে ফ্রান্সের মানুষজন তাদের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সরকারী চাকরী ক্রয় করতে উদগ্রীব থাকত।

৮. প্রাকৃতিক সম্পদের সহজলভ্য : ইংল্যান্ড কয়লা ও লোহার মতো প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ছিল, যা ইংল্যান্ডে শিল্পায়নের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়েছিল।

৯. বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও আবিষ্কার :অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক অধ্যাপক এ্যাশটন (Ashton) এর মতে, 'শিল্প বিপ্লব একপ্রকার ভাবের বিপ্লব ছিল বিজ্ঞান বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষের ধারনাকে প্রসারিত করেছিল ।" ('The industrial revolution was also a revolution of ideas - Science had widened men's conception of the universe.") । বিজ্ঞনা সেই সময় মানুষের আগ্রহ ও কৌতুহলের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল । বিজ্ঞান শুধুমাত্র মানুষকে তার চারপাশকে বুঝতে সাহায্য করেনি বরং তাকে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানবজাতির উন্নয়নে সাহায্য করেছিল । কিছু মানুষ নিজস্বার্থের জন্যই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অনুসন্ধান করেছিলেন কিন্তু সেখানেও বাস্তব বিষয়গুলির প্রতি তীব্র আগ্রহ ছিল এবং এই ধরনের আগ্রহের মধ্যেই সপ্তদশ শতকের মহান বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়েছিল । যদিও সেই সময় বিজ্ঞান আজকের দিনের মতো বিশেষত্ব পায়নি । যাইহোক, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারণার প্রক্ষিতেই ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে Royal Society প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এই Royal Society-র সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পপন্যোৎপাদী রসায়নবিৎ (Industrial Chemist), যন্ত্রউৎপাদক এবং ফ্রাঙ্কলিন, জোসেফ প্রিস্টলে (Joseph Pristley), ব্লাক (Black), জন ডালটন ও

টিপ্পনী

টিপ্পনী

হামফ্রে ডেভি (Humphrey Davy) র মতো বিজ্ঞানীরা। বলাবাহুল্য এদের সাথে শিল্পমালিকদের ভালো যোগাযোগ ছিল। যাইহোক বিজ্ঞান মানুষের মধ্যে অনুপ্রেরনা ও উদ্ভাবনী দক্ষতার সঞ্চার করেছিল। এই আবিষ্কার ছাড়া শিল্পের রূপান্তর সম্ভবপর ছিল না।

১০. কৃষি বিপ্লব : ব্রিটেনে কৃষি বিপ্লব অনেক আগেই ঘটেছিল এবং এই কৃষি বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ সমাজে এক ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। বলাবাহুল্য, কৃষি বিপ্লব একদিকে যেমন নতুন শিল্পকেন্দ্র কাঁচামালের যোগানকে সহজলভ্য করেছিল অন্যদিকে তেমন নতুন কারখানায় বহুল সংখ্যায় কৃষি শ্রমিকের যোগান দিয়েছিল।

১১. ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা : ব্রিটেনের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের সূত্র ধরে সেখানে এক নতুন অর্থনীতির সংগঠক হিসাবে 'Private banking' এবং হ্যানিসিয়াটিক লিগ (Hanseatic Leage) এর মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছিল। স্টেটব্যাঙ্ক, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার, প্রত্যর্থপত্র (Promissory note) প্রভৃতি ঋণদান ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ঘটিয়েছিল। এই সমস্ত কিছুর প্রেক্ষিতে অর্থনীতিতে এক উদ্দীপন এসেছিল, যা মানুষকে এর হাতে অতিরিক্ত অর্থের যোগান দিয়েছিল খরচ করার জন্য।

১২. অন্যান্য কারণ : পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতিও শিল্প বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছিল। ইংল্যান্ডরাজ তৃতীয় জর্জের রাজত্বের সূচনা থেকেই খাল পথ গুলির সংস্কার করে ক্রমশ বিভিন্ন জেলার সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। এর ফলে জেলাগুলি লন্ডনের মতো নানা সুবিধা পেয়েছিল। বলাবাহুল্য, খালপথগুলি ইংল্যান্ডের সমস্ত জায়গায় তৈরী করা হয়েছিল। যে খালপথগুলি ইংল্যান্ডের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের খনি ও শিল্পোৎপাদক জেলাগুলিতে তৈরী করা হয়েছিল সেগুলি টেমস উপত্যাকার সাথে এই অঞ্চলগুলিকে যুক্ত করা হয়েছিল। এরফলে অঞ্চলগুলি উপকৃত হয়েছিল। প্রসঙ্গত এই খালপথ ব্যবস্থা 'অন্তদেশীয় নাব্যপথ' (Inland navigation) হিসাবে পরিচিত ছিল এবং যখন রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছিল তা মুলত এই খালপথ ব্যবস্থার মাধ্যমে যে জায়গাগুলিকে যুক্ত করা যায়নি সেই জায়গাগুলির সাথে যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যেই পরিকল্পিত হয়েছিল। যাইহোক, এই খালপথগুলি তৈরির পরিকল্পনা ও অর্থ সহায়তা করেছিলেন ডিউক অব ব্রিজওয়াটার (Duke of Bridgewater) এবং এগুলি নির্মাণ করছিলেন জেমস ব্রিন্ডলে (James Brindley)। শক্তপোক্ত পীচরাস্তা নির্মানও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিল। এই রাস্তায় চারচাকার মোটরগাড়ি ঘন্টায় ১২ মাইল গতিতে চলাচল করতে পারত। খালপথ গুলির ন্যায় এই পীচ রাস্তাগুলিও তৈরি করেছিল পুঁজিবাদী কোম্পানীগুলি এবং যাত্রীদের কাছ থেকে 'পথকর' (Toll Tax) আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

২.২.১. বস্ত্রশিল্পে বিপ্লব :

ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব প্রথম অনুভূত হয়েছিল বস্ত্রশিল্পে সপ্তদশ শতকে কৃষিজাত শিল্পের পরেই বস্ত্রশিল্প ছিল সবচেয়ে বড় শিল্প। বস্ত্রশিল্পে প্রধান উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হত পশম ; যদিও আয়ারল্যান্ডে কিছু রেশম ও লাইনেন (ক্ষৌম) উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। যাইহোক, পুরনো পদ্ধতিতে বস্ত্রবয়নের ক্ষেত্রে প্রথমে কাঁচামাল থেকে পশম সুতো আলাদা করা হত এবং একাজে মুখ্যত মহিলা ও ছোট ছেলেরা যুক্ত থাকত। মহিলারা ঘরে বসেই চরকা দিয়ে সুতো কাটত। এই সুতো দিয়েই মুখ্যত পুরুষেরা বস্ত্রবয়ন করত। এইভাবে বস্ত্র তৈরি কাজ গৃহে ছোট হস্তচালিত তাঁত যন্ত্রের মাধ্যমে করা হত। ব্রিটিশরা কাঁচা পশমের বদলে পশমজাত বস্ত্র রপ্তানি করত, কারণ এটা বেশি লাভজনক ছিল। ইংল্যান্ডের বহু বস্ত্রব্যবসায়ী বস্ত্রবয়নে যুক্ত পরিবারগুলিকে উদ্বৃত্ত উৎপাদনে উৎসাহিত করত। তারা কাঁচা পশমের যোগান দিত এবং উৎপাদিত পশম বস্ত্র সংগ্রহ করত।

সুতো কাটার নানান যন্ত্রের উদ্ভাবন :

উড়ন্তমাকু (Flying Shuttle) : ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জন কে (John Kay) 'উড়ন্ত মাকু' বা (Flying Shuttle nনামে কাপড় বোনার এক উন্নত মানের যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এইযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে দ্রুত বয়ন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এই যন্ত্র মানুষের পরিশ্রম লাঘব করলে বহু তন্তুবায় জীবিকাচ্যুত হয়েছিলেন এবং এর ফলে দাঙ্গাও দেখা দিয়েছিল। বলাবাহুল্য এরূপ দাঙ্গাতেই কে (Kay) প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন এবং শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন ইংল্যান্ড ছেড়ে ফ্রান্সে আশ্রয় নিতে। যাইহোক, এই যন্ত্র বস্ত্র বয়ন ও সুতো কাটার কাজে প্রভেদ এনেছিল এবং এর ফলে সমগ্র বস্ত্রশিল্পে এক নতুন গতি এসেছিল।

স্পিনিং জেনী (Spinning Jenny) : ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে জেমস হারগ্রীভস (Jamxes Hargreaaves) স্পিনিং জেনী আবিষ্কার করেন এই স্পিনিং জেনী ছিল এক ধরনের ছোট হস্তযন্ত্র যার মাধ্যমে, পুরনো সুতো কাটার যন্ত্রে যেখানে একগাছি সুতো কাটা সম্ভব ছিল, আটগাছা সুতো কাটা সম্ভব হয়েছিল এই যন্ত্রে। অল্প সময়ের মধ্যেই ইংল্যান্ড এই যন্ত্রের প্রসার ঘটেছিল। ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ২০০০০ টি যন্ত্র তৈরি হয়েছিল যেগুলি দিয়ে ৮ গাছি থেকে ৮০ গাছি সুতো কাটা সম্ভব ছিল। বলাবাহুল্য, ছোট যন্ত্রগুলির ব্যবহার করা হত কুটিরে এবং বড়গুলির ব্যবহার শুরু হয়েছিল কারখানায়। এই যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলশ্রুতিতেই সুতী (Cotton)-র গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ওয়াটার ফ্রেম (Watedr Frame) : ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে রিচার্ড আর্করাইট (Richard Arkwright) আবিষ্কার করেন 'ওয়াটার ফ্রেম'। এই যন্ত্রে জল শক্তির সাহায্যে সুতো

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কাটা সম্ভব হয়। প্রসঙ্গত, এই যন্ত্র সুতীবস্ত্র উৎপাদনে সাহায্য করেছিল এবং এর ফলে অনেক কারখানা ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নটিংহ্যামের বিত্তশালী বস্ত্র বিক্রেতাদের অর্থসহায়তায় আর্করাইট ক্রমফোর্ড (Cromford) এ ডারওয়েট (Derwent) নদীর তীরে একটা মিল বা কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া কিছু সময় পরে তিনি পার্লামেন্ট থেকে জারি করা একটা পুরনো আইন, যেখানে ছাপা সুতী দ্রব্যাদীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল তার প্রত্যাহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি ডার্বিশায়ার (Derfyshire) ও ল্যাঙ্কাশায়ার (Lancashire) এ কারখানা স্থাপন করেছিলেন।

স্পিনিং মিউল (Spinning Mule) : ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে স্যামুয়েল ক্রমটন (Samuel Crompton) স্পিনিং মিউল আবিষ্কার করেন। উল্লেখ্য স্পিনিং জেনী ও ওয়াটার ফ্রেম বৈশিষ্ট্যকে একত্রিত করে স্পিনিং মিউল তৈরি করা হয়েছিল। এরফলে একদিকে যেমন শক্ত ও সূক্ষ্ম সুতো উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল তেমনি সুতো উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বলাবাহুল্য, ক্রম্পটনের কোন ব্যবসায়ী বুদ্ধি ছিল না, তাই তিনি স্থানীয় উৎপাদন কারীদের কাছে প্রতারিত হয়েছিলেন এবং শেষপর্যন্ত অতিদরিদ্রাবস্থায় মারা যান। তবে অন্যদের কাছে তাঁর আবিষ্কার স্বর্ণখনির সমতুল্য হয়ে উঠেছিল। ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এই যন্ত্র সারা দেশে পাঁচ মিলিয়ন সুতো কাটার টাকুতে ব্যবহৃত হয়েছিল। এছাড়া এই যন্ত্র আবিষ্কারের পরেই ঘরের পরিবর্তে কারখানায় সুতো কাটার বহুল প্রচলন হয়েছিল।

বয়ন যন্ত্রের নানান উদ্ভাবন :

পাওয়ার লুম (Power Loom) : সুতো কাটার পর কারখানাতে বয়ন শুরু হয় ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এডমন্ড কার্টরাইট (Edmund Cartwright) এর 'পাওয়ার লুম' বা জলশক্তি চলিত তাঁত আবিষ্কার এর পর। বলাবাহুল্য, কার্টরাইট ছিলেন একাধারে কবি ও পন্ডিত। কিভাবে কাপড় বোনা হয় তা না দেখেই তিনি তাঁর যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ২০ টি তাঁতযন্ত্র নিয়ে একটি কারখানা স্থাপন করেছিলেন। প্রথমে এই তাঁতগুলি চালনায় পশুশক্তির ব্যবহার করা হত। কিন্তু ১৭৮৯ খ্রিঃএ তিনি এক্ষেত্রে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ব্যবহার করেন। এছাড়া কার্টরাইট একটি ম্যান চেষ্টার ফার্মের সাথে যৌথভাবে ৪০০ টি বাষ্পচালিত তাঁত চালনার এক বড় উদ্যোগও নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই উদ্যোগ শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। যাইহোক, পাওয়ার লুম আবিষ্কারের ফলে বয়ন শিল্পে যুগান্তর এসেছিল।

ড্রেসিং মেশিন (Dresing Machine) : কার্টরাইট এর যন্ত্রকে উন্নত করেছিলেন র‍্যাডক্লিফ (Radcliffe), যিনি ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে ড্রেসিং মেশিন উদ্ভাবন করেছিলেন। এছাড়া হরোকস (Horrocks) এরও এব্যাপারে অবদান ছিল কারন তিনিই ছিলেন

প্রথম ব্যাক্তি যিনি পাওয়ার লুমের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করেছিলেন। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ১০০০০০ এবং ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ২৫০০০০। ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে এলি হুইটনি (Eli Whitney) 'কটন জিন' (Cotton Gin) আবিষ্কার করেছিলেন। এইযন্ত্র দ্রুত তাঁত থেকে তুলোর গোছ পরিষ্কার করে দিতে পারত।

কয়েকটি পরিসংখ্যান থেকে ইংল্যান্ড সুতীবস্ত্র শিল্পে বিপ্লবের বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন যেখানে ৪ মিলিয়ন পাউন্ড কাঁচা তুলোন আমদানি করেছিল সেখানে ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে এই আমদানির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩০০ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি। বলা বাহুল্য ব্রিটেন ভারতবর্ষের থেকে কাঁচা তুলো আমদানি করে বস্ত্র উৎপাদন করত এবং সেই বস্ত্র ভারতবর্ষে বিক্রি করত এমন দামে যে ভারতবর্ষে বস্ত্রশিল্পী বা কারিগররা প্রতিযোগীতায় দাঁড়াতে পারত না।

পশম শিল্পর অগ্রগতির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছিল এবং ইয়র্কশায়ার এব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তবে পশম শিল্পে অগ্রগতি ঘটেছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ইয়কশায়ারে পশম কারখানাগুলিতে ছিল মাত্র ৫০০০ পাওয়ার লুম এবং ১৮৫০ খ্রিঃ -এ এর সংখ্যা ৪২০০০ এর বেশি ছিল না। বলাবাহুল্য সুতিবস্ত্র শিল্প অপেক্ষা পশম শিল্পের ধীর অগ্রগতির পিছনে ছিল নানাবিধ আইনী বাধা নিষেধ। এছাড়া পশমের যোগানও ছিল সীমিত।

২.২.২. লৌহ ও কয়লা শিল্প :

লৌহ (Iron)

সপ্তদশ শতকে লৌহ উৎপাদন প্রক্রিয়া : ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনে লোহার বাৎসরিক উৎপাদন ছিল প্রায় ২০০০০ টন। কিন্তু ব্রিটেনে লোহার চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং লোহার উৎপাদন চাহিদার তুলনায় ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল। তবে ব্রিটেনে আকরিক লোহার প্রাকৃতিক ভান্ডার ছিল প্রচুর কিন্তু সেগুলি উৎখনন করা হয়নি। ফলতঃ ব্রিটেনকে লোহার জন্য সুইডেন, জার্মানী ও রাশিয়ার উপর বহুলাংশে নির্ভর করতে হত। বলাবাহুল্য, ব্রিটেনে আকরিক লোহা উৎখনিত না হওয়ার পিছনে মূল কারণ ছিল লোহা গলানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানীর অভাব। ব্রিটেনে লোহা গলানোর জন্য মূলতঃ জ্বালানী হিসাবে কাঠকায়লার ব্যবহার করা হত। আর এই কাঠকয়লার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ দ্রুত নিঃশেষিত হয়েযাচ্ছিল।

সপ্তদশ শতকে লোহা উৎপাদনের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হত তাতে প্রথমে কাঠকয়লা চালিত ব্লাষ্ট ফার্নেস বা চুল্লীতে আকরিক লোহা ঢালা হত এবং তারপর জলশক্তি চালিত বড় হাপার দিয়ে প্রবলবেগে বাতাস করে চুল্লীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে লোহা গলানো হত। এই পদ্ধতিতে লোহা গলাতে ১৪ দিন সময় লাগত এবং শেষে গলিত লোহা হয় ছাঁচে ফেলা হত নয় বালির খালে জমা করা হত। এইভাবে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

লোহা উৎপাদন করতে প্রচুর কাঠকয়লার প্রয়োজন ছিল। তাই ব্রিটেন আরও কাঠকয়লা কিংবা বিকল্প জ্বালানী পেতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। এছাড়া লৌহ শিল্প জলশক্তির উপরও অনেকাংশে নির্ভর ছিল এবং এই জলশক্তির উৎস নির্ভরযোগ্য ছিল না।

ডার্বির গবেষনা : লোহা গলানোর জন্য কাঠকয়লার পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানী অনুসন্ধানে প্রথম সফল হয়েছিলেন আব্রাহাম ডার্বি (Abraham Darby) নামে স্রপশায়ার (Shropshire) এর ব্যাক্তি। তিনি ১৭০৯ খ্রিষ্টাব্দে চুল্লিতে স্পিগ আয়রণ বা গলিত লোহা উৎপাদনের জন্য কাঠকয়লার বদলে কোক (coke) ব্যবহার করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তবে ১৭৫০ এর দশকের আগে এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় নি।

হেনরি কোর্ট (Henry Cort) : ১৭৮৩ - ৮৪ সালে হেনরি কোর্ট নামে একজন ব্যাক্তি লোহা গলানো ও লোহা উৎপাদনের এক উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এই আবিষ্কারের ফলে লৌহ শিল্পে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছিল। যাইহোক, কোর্টের পদ্ধতিতে লোহা উৎপাদন পূর্বেকার পদ্ধতি থেকে ১৫ গুণ দ্রুত হয়েছিল। কোর্ট এর আবিষ্কারের প্রেক্ষিতেই লৌহ শিল্প কয়লাঞ্চলের সন্নিকটে চলে এসেছিল এবং প্রকৃত লৌহ যুগের সূচনা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, ডার্বির আবিষ্কার পিগ আয়রণ বা গলিত লোহা উৎপাদনে গতি এনেছিল আর কোর্ট তাঁর পদ্ধতির মাধ্যমে খুব সহজে পিগ আয়রন কে বার আয়রণ বা ঢালাই লোহাতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনে পিগ আয়রণ উৎপাদন ৭৫০০০০ টন থেকে বেড়ে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ৬ মিলিয়ন টন হয়েছিল।

কয়লা শিল্প :

অষ্টাদশ শতকে কয়লা শিল্পের বিকাশে নানাবিধ সমস্যা ছিল। লোহা গলানোর জন্য কোক ও কয়লানর চাহিদা বৃদ্ধি করেছিল। এছাড়া গৃহস্থালী ও অনান্য শিল্পেও কয়লা ব্যবহৃত হত। কিন্তু খনির ভেতর বায়ু চলাচলের সমস্যা, ভূগর্ভে জল জমে যাওয়া, এবং ভূগর্ভস্থ গ্যাসের বিস্ফোরণের সমস্যার জন্য ভূগর্ভস্থ কয়লা উত্তোলনের কাজ ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে টমাস স্যাভেরি (Thomas Savery) খনিতে জল জমে যাওয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য একধরণের বাষ্পচালিত পাম্প (Steam pamp) আবিষ্কার করেছিলেন। যদিও এই যন্ত্রটির যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল না। তবে টমাস নিউকোমেন (Thomas Newcomen) এর 'atmospheric' স্টিম পাম্প অনেক বেশি কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু এই যন্ত্রটি চালনায় অনেক জ্বালানী প্রয়োজন হওয়ায় একটা অসুবিধা তৈরি হয়েছিল।

বাষ্পচালিত যন্ত্র (Steam Engine) : জেমস ওয়াট ১৭৬৫ খ্রিঃ এ নিউকোমেন এর

যন্ত্রের জ্বালানী অপচয়ের সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করেছিলেন এবং এরই প্রেক্ষিতে ১৭৬৯ খ্রিঃএ তিনি বাষ্পশক্তির সাহায্যে যন্ত্র চালনার এক উন্নত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। বলাবাহুল্য জেমস ওয়াট এর উদ্ভাবন ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, কারণ এর ফলেই এই প্রথম যেকোন সময়ে যে কোন জায়গায় কার্যকরভাবে বড়বড় যন্ত্রকে বাষ্পশক্তির সাহায্যে চালানো সম্ভব হয়েছিল। ওয়াটের আবিষ্কার লক্ষ লক্ষ শ্রমজিবী মানুষের জীবন বদলে দিয়েছিল।

খনি খননের উন্নতির জন্য উদ্ভাবন : কয়লা খনিতে বায়ুচলাচলের ত্রুটি ও গ্যাস বিস্ফোরণের সমস্যা সমাধানের জন্য 'Exhaust Fan' আবিষ্কার করা হয়েছিল। জন বাডেল (John Buddle) নামে একজন ব্যাক্তি এটি আবিষ্কার করেছিলেন। এছাড়া খনিতে আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার কাজও বাডেল সাহায্য করেছিলেন। প্রসঙ্গত এই সমিতি ই স্যার হামফ্রে ডেভি (Sir Humphrey Davy) কে নিরাপত্তা বাতি' (Safty lamp) তৈরির কাজে নিয়োগ করেছিল। ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ডেভির বিখ্যাত 'নিরাপত্তা বাতি' আবিষ্কৃত হয়েছিল। বায়ু চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি ডেভির 'নিরাপত্তা বাতি' কয়লাখনিতে বিস্ফোরণের বিপদ তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস করে ছিল।কয়লা খনি অঞ্চলে রেললাইন বসিয়ে পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটনা হয়েছিল। এছাড়া খনি থেকে কয়লা বের করে আনার পদ্ধতিতেও উন্নতি ঘটানো হয়েছিল। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে তারের দড়ি (Wire pope) আবিষ্কারের ফলে কয়লা উত্তোলন সহজ ও নিরাপদ হয়েছিল। এই সমস্ত অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতেই ব্রিটেনে কয়লা উৎপাদন ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে ৬ মিলিয়ন টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ৫৫ মিলিয়ন টন এবং ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ১১০ মিলিয়ন টন হয়েছিল।

২.২.৩. শিল্প বিপ্লবের ফল :

শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে ব্রিটেন কৃষি প্রধান দেশ থেকে শিল্প প্রধান দেশে পরিণত হয়েছিল। তবে শিল্প বিপ্লবের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ব্যবসা ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা। শিল্প বিপ্লবের ফলেই ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এরপ্রেক্ষিতেই ব্রিটেনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিশ্ববাজারকে দখল করার জন্য ঔপনিবেশিক সম্প্রসারন। সর্বপরি শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনের অগ্রগতি পরিমাপ করলে দেখা যায় যে এর প্রেক্ষিতে ব্রিটেনে কেবলমাত্র জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় নি তার সাথে সামাজিক মর্যাদার অগ্রগতি ঘটেছিল।

পরিবহন ব্যবস্থায় বিপ্লব :

শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষিতে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক বৃদ্ধি পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকে জরুরী করে তুলেছিল। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতি টমাস

টিপ্পনী

টেলফোর্ড (Thomas Telford 1757 - 1834) রাস্তা ও সেতু নির্মাণে বিশিষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি ১২০০ সেতু এবং ১০০০ মাইল রাস্তা নির্মান করেছিলেন। স্কটিশ ইঞ্জিনিয়ার জন ম্যাকাডেম (John Macadam) ও পরিবহন বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, ১৮১১ তে জন ম্যাকাডেম পীচ দিয়ে রাস্তা নির্মানের কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, যা 'Macadamisation' নামে পরিচিত।

টিপ্পনী

স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর রেলপথের অগ্রগতি পরিবহন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে বিস্তৃত খালপথকে যুক্ত করার জন্য কিংবা ঘোড়ায় টানা কোচগুলির চলাচলের জন্য রেলপথের তৈরি করা হয়েছিল। ওয়াটের বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের এক বাস্তব প্রয়োগ ছিল স্টিম লোকোমোটিভ (Steam locomotive) ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে রিচার্ড ট্রেভিথিক (Richard Trevithick) প্রথম লোকোমোটিভ (রেলইঞ্জিন) 'Captain's Dick's Puffer' তৈরি করেছিলেন। ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে স্টকটন (Stockton) থেকে ডারলিংটন (Darlington) এর মধ্যে নির্মিত রেলপথে প্রথম বাষ্প চালিত দ্রুতগতির রেলইঞ্জিন (Steam locomotive) এর ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে লিভারপুল থেকে ম্যাঞ্চেস্টার পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হলে পরিবহন ব্যবস্থায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ব্রিটিশ রেলপথ ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ৬০ মাইল থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ১৫৫৫৭ মাইল বিস্তৃত হয়েছিল। এর পেছনে যান্ত্রিক অগ্রগতি বিশেষত হাতে করে সংকেত (Signal) দেওয়ার পরিবর্তে যান্ত্রিক 'Signal Post' এর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

শিল্প বিপ্লবের প্রভাব :

শিল্প বিপ্লব চিরাচরিত সমাজে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এই শিল্পবিপ্লবের ফলে যে পরিবর্তনগুলি এসেছিল তা হল -

- ব্যাপকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি।
- জনসংখ্যার স্থানান্তর।
- শিল্পশ্রমিক শ্রেণির উত্থান ও বিকাশ।
- শিল্পী ও কারিগরের পুনর্মিলন।
- নতুন আবিষ্কার।
- জনসাধারণের অভিপ্রায়।
- নগর ও শহরগুলির সৌন্দর্যনষ্ঠ।

অগ্রগতি পরিমাপ কর :

১. শিল্প বিপ্লবের দুটি কারণ লেখ।

২. কে কত খ্রিষ্টাব্দে 'উড়ন্ত মাকু' বা 'Flying Shuttle' আবিষ্কার করেন ?

৩. শিল্প বিপ্লবের চারটি প্রভাব উল্লেখ কর।

২.৩. আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ :

টিপ্পনী

আমেরিকা বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে লেক্সিংটনের যুদ্ধ (Battle of Lexington) -এর মধ্য দিয়ে এবং পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসের চুক্তি (Treaty of paris) দিয়ে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমেরিকায় উত্তর থেকে দক্ষিণে যে মুখ্য উপনিবেশগুলি ছিল সেগুলি হল - মেইনে (Maine), নিউ হ্যাম্পশায়ার (New Hampshire), ম্যাসাচুসেটস (Masachusetts), রোড় উপদ্বীপ (Rhode island) এবং কানেকটিকাট (Connectioncut), নিউইয়র্ক (New York), পেনসিলভেনিয়া (Pennsylvania, নিউ জার্সি (New Jersey), ডেলওয়ের (Delware), মারিল্যান্ড (Maryland), ভার্জিনিয়া (Virginia), উত্তর ক্যারোলিনা (North Carolina), দক্ষিণ ক্যারোলকিনা (South Carolina), এবং জর্জিয়া (Georgia)। মুখ্য শহরগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ম্যাসাচুসেটস এর বোস্টন (Boston), পেনসিলভেনিয়ার উপনিবেশ রাজধানী ফিলাডেলফিয়া (Philadelpia) এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনার রাজধানী চার্লস্টন (Charlestone)।

কানাডা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ। এখানকার মানুষের প্রধান ভাষা ছিল ফরাসী এবং এর পশ্চিমে ছিল আমেরিকা ভূভাগের অবস্থান।

আমেরিকায় ইংরেজভাষী এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ততম বন্দর ছিল বোষ্টন। আমেরিকার উপনিবেশগুলির সাথে ব্রিটিশ রাজের সম্পর্ক ছিল শিলাবৎ। এই উপনিবেশগুলিতে ব্রিটিশরাজ নিযুক্ত গভর্ণরদের সাথে স্থানীয় প্রতিনিধি সভার সদস্যদের কর ব্যবস্থার ব্যাপারে মতপার্থক্য ও সংঘর্ষ লেগে থাকত। এছাড়া কানাজ সহ সেন্টলরেন্স অঞ্চল এবং একইসাথে নিউ ইয়র্কের পশ্চিমাংশ, পেনসিলভেনিয়া ও ভার্জিনিয়াতে ফরাসী প্রভাব ব্রিটিশরাজ ও তার উপনিবেশগুলির সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভ করে এবং আমেরিকার ফরাসী উপনিবেশগুলিতে নিজের প্রভাব বিস্তার করে। এই ঘটনার পরই আমেরিকায় বিপ্লবের পরিবেশ তৈরি হতে শুরু করে ছিল। বলাবাহুল্য, সুবৃহৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিচালনার ব্যায়ভার লাঘব করার জন্য ইংল্যান্ড আমেরিকার উপনিবেশগুলির উপর নিত্য নতুন কর আরোপ ও নানা আইন জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের কতৃত্ব প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু আমেরিকার উপনিবেশ ইংরেজ অধিবাসীরা যেহেতু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করত না, তাই তারা এই নতুন আইন কানুনে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়েছিল এবং এগুলিকে তারা নিজেদের অধিকারের লঙ্ঘনকারী হিসাবে দেখেছিল এরই প্রেক্ষিতে তারা নিজেদের মত প্রকাশের জন্য

টিপ্পনী

১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে 'The Committees of Correspondence' গঠন করে এবং একই সাথে উপনিবেশগুলির প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসে মিলিত হওয়ায় পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য, ব্রিটিশরাজের প্রতি অনাস্থা বুদ্ধির সাথে সাথে এই আঞ্চলিক কংগ্রেসগুলি উপনিবেশ থেকে ক্রমশ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে নিজেরাই প্রশাসকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে আমেরিকাবাসীর বোস্টনে প্রতিবাদ জানালে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ব্রিটেন উপনিবেশগুলিতে স্বশাসনের অবসান ঘটিয়ে সব মানুষকে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশরাজের শাসনধীনে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রসঙ্গত, ব্রিটেনের এই ধরনের কার্যকলাপ ক্ষুব্ধ হয়ে উপনিবেশগুলি ১৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের বিরোধীতায় অবতীর্ণ হয়। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় কনটিনেন্টাল কংগ্রেস (Second Continental Congress) উপনিবেশের প্রতিনিধিরা 'স্বাধীনতা ঘোষনাপত্র' গ্রহণ করে এবং এর ফলে উপনিবেশগুলিতে ব্রিটেনের সার্বভৌমত্ব ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব অবলুপ্ত হয় । এইভাবে আমেরিকা এক গণতান্ত্রিক সংযুক্তরাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। উল্লেখ্য এই সংযুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা রাজ্য আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

২.৩.১. আমেরিকার বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিক ভাবনা :

জনলক (১৬৩২ - ১৭০৪) এর উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গভীরভাবে আমেরিকার বিপ্লবকে অনুপ্রাণীত করেছিল । বলাবাহুল্য, ১৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত প্রকাশিত গ্রন্থমালায় লক যে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছিলেন তা তাঁর উত্তরসূরী জ্যাকরুশো (১৭১২ - ১৭৭৮) কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত রুশোর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Du Contract Social' এ লকের প্রভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয় । এই গ্রন্থে রুশো যে জন্মগত অধিকার (Natural right) তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা আমেরিকাবাসীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল । এছাড়া আমেরিকাবাসীরা তাদের রাষ্ট্র ও জাতীয় সংবিধানের কাঠামো তৈরির জন্য মন্তেস্কু যেভাবে ব্রিটিশ সংবিধানকে বিশ্লেষণ করেছিলেন তার উপরেই নির্ভর করেছিল । ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার উপনিবেশগুলিতেই প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের ভাবনা মুখ্য রাজনৈতিক আদর্শে পরিণত হয়েছিল। এই আদর্শই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রেরণা যুগিয়েছিল। প্রসঙ্গত, এই আদর্শ ব্রিটেন থেকেই আমদানি করা হয়েছিল। ব্রিটেনের 'Country Party' দেশে যে দুর্নিতি চলছিল তা সকলের সমক্ষে তুলে ধরেছিল। বলাবাহুল্য, আমেরিকাবাসীদের স্বার্থের প্রতি ব্রিটেন কতটা আন্তরিক সে ব্যাপারে আমরিকাবাসীদের অনাস্থা এবং একই সাথে ব্রিটনের মত আমেরিকাও যদি দুর্নিতিপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই আশঙ্কায় আমেরিকাবাসীরা প্রজাতান্ত্রিক আদর্শকে গ্রহণ করেছিল এবং তারা নিজেদের অধিকারের ব্যাপারেও বিশ্বাসী ছিল । এটা তাদের উদ্দেশ্য পূরণেও সহায়তা করেছিল। আমেরিকাবাসীরা মনে করত অভিজাততন্ত্র ও

ঔপনিবেশিকদের সঙ্গেই দুর্নীতি জড়িয়ে থাকে। আর এই দুর্নিতিই তাদের কাছে স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। যাইহোক, সেইসময় যেসব বিশিষ্ট ব্যাক্তি বর্গ প্রজাতান্ত্রিক আদর্শকে সমর্থন করেছিলেন তাঁর হলেন -

- স্যামুয়েল অ্যাডামাস্ (Samuel Adams)
- প্যাট্রিক হেনরি (Pattrick Henry)
- জর্জ ওয়াশিংটন (George Washington)
- টমাস পেইন (Thomas Paine)
- বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (Benjamin Franklin)
- জন অ্যাডাম (John Adams)
- টমাস জেকারসন (Thomas Jefferson)
- জেমস ম্যাডিসন (James Madison)
- আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন (Alexander Hamilton)

প্রজাতান্ত্রিক আদর্শে ব্যাক্তিগত বিষয় অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় কর্তব্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত হবে তারাই রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার এবং স্বাধীনতা রক্ষা করবে। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মার্সি ওটিস ওয়ারেন (Merey othis Warren) কে লেখা এক চিঠিতে জন অ্যাডাম ধ্রুপদী ভাবনার প্রতি তাঁর বিশ্বাসকে ব্যক্ত করেছিলেন এইভাবে যে, ব্যাক্তিগত বিষয় রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া তিনি আরও লিখেছিলেন যে -

"জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রের মঙ্গল, রাষ্ট্রের স্বার্থ, সম্মান, ক্ষমতা এবং গৌরব এর প্রতি যথার্থ অনুরাগ থাকা জরুরী তা না হলে সেখানে কোন প্রজাতান্ত্রিক সরকার অথবা প্রকৃত স্বাধীনতা থাকতে পারে না। এবং এই রাষ্ট্রীয় অনুরাগকে সমস্ত ব্যাক্তিগত অনুরাগের উর্দ্ধে রাখা উচিত। সমাজের অধিকারের প্রশ্নে মানুষকে ব্যাক্তিগত আনন্দ অনুরাগ, স্বার্থ এমনকি বন্ধুত্বকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

মহিলারা এ ব্যাপারে তাঁদের সন্তানদের মধ্যে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ গভীরভাবে সঞ্চারিত করে তাঁদের কর্তব্য পালন করতে পারেন। তবে এর জন্য তাঁদের সকল প্রকার কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত থেকে জীবনযাপন করতে হবে। প্রসঙ্গত, এই 'প্রজাতান্ত্রিক মাতৃত্ব' ('Republican Motherhood') এর আদর্শের সংক্ষিপ্তরূল পরিলক্ষিত হয় অ্যাবিগাইল অ্যাডাম (Abigail Adams) ও মার্সি ওটিস ওয়ারেন এর মধ্যে ও। টমাস পেইন এর Common Sense' নামক প্রচার পুস্তিকা জনগণ কর্তৃক গৃহীত ও সমাদৃত হয়েছিল। এই প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে আমেরিকার উদ্দেশ্য প্রচার

টিপ্পনী

এবং উদারনীতিবিদ ও প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের প্রসার ঘটেছিল। এছাড়া এতে ইংল্যান্ড থেকে বিচ্যুতি এবং 'মহাদেশীয় সেনাবাহিনী' (Continentail Army) তে যোগদানের প্রচার বার্তা সমর্থন লাভ করেছিল। বলাবাহুল্য পেইন এর লেখনিধারা আমেরিকার মানুষজনকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেছিল। কারণ, তাঁর লেখার মধ্যে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ থেকে মানুষকে মুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল।

টিপ্পনী

২.৩.২. আমেরিকার বিপ্লব ও স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ :

১. ফরাসী ও ভারতীয় যুদ্ধ : উত্তর আমেরিকায় সংঘটিত ইউরোপীয় সপ্তবর্ষব্যাপী 'ফরাসী ও ভারতীয় যুদ্ধ' (French and Indian war) নামেরও পরিচিত।

উত্তর আমেরিকায় ঔপনিবেশিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেছিল। ব্রিটিশ অধিকারিকরা ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে আলবানি কংগ্রেস (Albany Congres) এ যুদ্ধের জন্য জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা উপনিবেশগুলি থেকে মানুষের পূর্ণ সমর্থন লাভে ব্যার্থ হয়েছিল। তবে এতদ্‌সত্ত্বেও আমেরিকার ঔপনিবেশিকরা প্রশ্নাতীতভাবে ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। অন্যদিকে ফরাসী বাহিনীতে যোগদান করেছিল বিভিন্ন নেটিভ আমেরিকান উপজাতি (Native American Trife) -র মানুষেরা (এই জন্য এই যুদ্ধকে 'ফরাসী ও ভারতীয় যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হয়)। যাইহোক, শেষপর্যন্ত ব্রিটিশরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করছিল এবং ব্রিটিশ কর্তৃক কানাডা ও ওহিও উপত্যাকা (Ohiho Valley)-এর প্রধান ফরাসী শহর ও দূর্গগুলি দখলের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

২. পোনটিয়াক (Pontiac) এর বিদ্রোহ : পোনটিয়া ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী ওট্টাওয়া (Ottawa) সর্দার। তিনি আগ্রাসী শ্বেতাঙ্গদের উপজাতি অঞ্চল দখলের বিরোধী ছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি উত্তপ্ত ওহিও উপত্যাকার বিভিন্ন উপজাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে ব্রিটিশ দূর্গ ও আমেরিকান বসতগুলির উপর পর্যায়ক্রমে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। যদিও শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সেনা পোনটিয়াক এর বিদ্রোহ দমন করেছিল। এরপোর নেটিভ আমেরিকানদের সাথে শান্তি সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট '১৭৬৩ এর ঘোষণা' (Proclaimation of 1763) জারি করেছিল। এতে বলা হয়েছিল যে, কোন চুক্তি বা ক্রয়ের মাধ্যমে নেতধিভদের অঞ্চলে বসতি গড়ার অধিকার পাওয়া ব্যাতীত আমেরিকান ঔপনিবেশিকরা নেটিভ আমেরিকান অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে পারবে না।

৩. ব্রিটেনের সক্রিয় নীতি : 'ফরাসী ও ভারতিয় যুদ্ধ' এ ব্রিটেনের সাফল্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে আমেরিকার উপনিবেশগুলির উপর নিয়ন্ত্রণবৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেছিল। এরই প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জর্জ গ্রেনভিল (George Grenville)

১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রাচীন 'নেভিগেশন আইন' (Navigation Acts) কার্যকর করেছিলেন। এছাড়া তিনি ঐ বছরই চিনির উপর কর আরোপের জন্য 'সুগার অ্যাক্ট' (Sugar Act) এবং বাজার থেকে কাগুজে মুদ্রা (যার বেশিরভাগ ফরাসী ও ভারতিয় যুদ্ধের সময় থেকে প্রচলিত ছিল) তুলে নেওয়ার লক্ষ্যে 'কারেন্সি অ্যাক্ট (Currency Act) প্রবর্তন করেছিলেন। একবছর পর তিনি প্রবর্তন করেছিলেন 'স্ট্যাম্প অ্যাক্ট (Stamp Act) যার মাধ্যমে ছাপানো বস্তুর উপর কর ধার্য্য করা হয়েছিল। এছাড়া তিনি 'Quarterting Act' ও প্রবর্তন করেছিলেন । এই আইনে আমেরিকাবাসীদের বাধ্যতামূলক ভাবে ব্রিটিশ সৈন্যর খাদ্য ও বাসস্থানের দায়িত্ব গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।

টিপ্পনী

৪. প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই কর আরোপ : ব্রিটেন শুধুমাত্র রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যই প্রথম সুগার অ্যক্ট' প্রবর্তন করেছিল। এর প্রেক্ষিতে তেরোটি উপনিবেশের আমেরিকাবাসীরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আমেরিকার কোন প্রতিনিধি ছাড়াই এধরনের কর ধার্য (taxation without representation) এর প্রতিবাদে সরব হয়েছিল এবং প্রতিবাদ স্বরূপ অলিখিতভাবে কিছু ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করছিলন। নিউইয়র্কে স্ট্যাম্প অ্যাক্ট কংগ্রেসে মিলিত হয়ে কিছু ঔপনিবেশিক নের্তৃবর্গ এই প্রত্যাহারের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ও রাজা তৃতীয় জর্জকে আবেদন জানিয়েছিলন । এরই প্রেক্ষিতে পার্লামেন্টে জনতার চাপে ১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে 'স্ট্যাম্প অ্যাক্ট' প্রত্যাহার করে নিয়েছিল । কিন্তু সেই সঙ্গে ঘোষনার আইন (Declaratory Act) জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ঔপনিবেশিকদের উপর কর ধার্যের অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আছে।

৫. 'টাউনসেন্ত অ্যাক্ট' (Townshend Act) ও বোস্টন হত্যাকান্ড : ১৭৬৭ খ্রিঃ এ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'টাউনসেন্ত অ্যাক্ট' জারি করেছিল। এই আইনানুসারে সীসা, রঞ্জক পদার্থ, এবং চা এর উপর কর আরোপ করা হয়েছিল যা 'টাউনসেন্ত শুল্ক' (Townsce) নামে পরিচিত হয়। একইভাবে ব্রিটেন 'Suspension Act' জারি করে 'Quartering Act' কার্যকর না করার জন্য নিউইয়র্ক যে অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল তা স্থগিত করে দিয়েছিলন । হিংসাত্মক প্রতিবাদ এড়ানোর জন্য ম্যাসাচুসেটস এর গভর্ণর টমাস হাচিনসন (Thomas Hutchinson) ব্রিটিশ সেনার সাহায্য নিয়েছিলেন। ১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ৪০০০ ব্রিটিশ সেনা বোস্টন শহরে অবতরণ করেছিল শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। এতৎসত্ত্বেও ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে ৫ মার্চ একদল উন্মত্ত জনতার সাথে ব্রিটিশ সেনার সংঘর্ষ হয়েছিল। এই সংঘর্ষে পাঁচজন বোষ্টনীবাসী নিহত হয়েছিল এবং এই বোষ্টন হত্যাকান্ড' এর সংবাদ দ্রুত অনান্য উপনিবেশে ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল।

৬. বোস্টন টি পার্টি (Boston Tea Party) : ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'চা আইন' (Tea act) প্রবর্তন করেন। এই আইন মারফৎ ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী

টিপ্পনী

আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে চা রপ্তানী করার একচেটিয়া অধিকার পেয়েছিল। বলাবাহুল্য এই আইনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমেরিকার বিভিন্ন শহরের চা আড়তদার ইস্তফা দেয় কিংবা তাদের অর্ডার বাতিল করে এবং ব্যবসায়ীরা প্রেরিত মাল নিতে অস্বীকার করে। কিন্তু ম্যাসাচুসেটস এর গভর্ণর এই আইন কার্যকর করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনটি জাহাজ বোস্টন বন্দরে এলে সেই সব জাহজের মাল খালাস করা এবং সেই মালের উপযুক্ত অর্থ যেন প্রদান করা হয়। যদিও ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ ডিসেম্বর বোস্টন বন্দরে জাহাজগুলি এলে ৬০ জন ঔপনিবেশিক নেটিভ আমেরিকানদের ছদ্মবেশে জাহাজে উঠে সব চা এর বাক্স সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়। এই ঘটনা 'বোস্টন টি পার্ট' নামে খ্যাত।

৭. Intolerable Act' ও 'Quebec Act' : ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'দমনমূলক আইন বা 'Coedricive Act' প্রবর্তন করে। এই আইনই 'Intolerable Act' নামে পরিচিত। এই আইন জারি করে বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং যতদিন না পর্যন্ত বোস্টন টি পার্টি' ঘটনায় ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যা ক্ষতি হয়েছে তা পরিশোধ করা হচ্ছে তা বন্ধ থাকবে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে নিউ ইংল্যান্ডের তীব্র শীতে ঠান্ডা ও ক্ষুধা থেকে বোস্টন বাসীদের রক্ষা করার জন্য সমস্ত উপনিবেশ থাকে আমেরিকাবাসীরা স্থলপথে বোস্টনে খাদ্য ও অনাণ্য সামগ্রী পাঠিয়েছিল।

পার্লামেন্ট একইসাথে ; 'Quebec Act' জারি করেছিল। এই আইনে ফরাসী কানাডিয় ক্যাথলিক (French Canadian Catholien) দের বেশ কিছু অতিরিক্ত অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এবং ফরাসী কানাডিয়া এলাকার সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছিল দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে নিউইয়র্ক ও পেনসিলভেনিয়ার সীমানা পর্যন্ত।

৮. প্রথম কনটিনেন্টাল কংগ্রস এবং বয়কট : 'Intplerable Act' এর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিরা ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে শরৎকালে ফিলাভেলফিয়াতে প্রথম কনটিননেন্টাল কংগ্রেসে (First Continental Congres) একত্রিত হয়েছিলেন। এই অধিবেশনে তাঁরা পুনরায় ইংল্যান্ডরাজ তৃতীয় জর্জ ও ব্রিটেনবাসীদের কাছে এই আইন প্রত্যাহার করে সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনার প্রার্থনা জানিয়ে এক আবেদনপত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁরা উপনিবেশগুলিতে ব্রিটিশ পন্য বয়কট করার সিদ্ধান্তও গ্রহন করেছিলেন।

৯. লেক্সিংটন, কনকর্ড (Concord) এবং দ্বিতীয় কনটিনেন্টাল কংগ্রেস : ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৯ এপ্রিল বোস্টনের ব্রিটিশ বাহিনীর একটা সেনাদল পাশের শহর কনকর্ড এ উপনিবেশিক সামরিক অস্ত্রাগার দখল করতে গিয়েছিল। কিন্তু লেক্সিংটন (Lexington) ও কনকর্ডের স্থানীয় সৈনিকরা তাদের বাধা দিয়েছিল এবং আক্রমণ করেছিল। দুই পক্ষের সংঘর্ষে শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সেনাদল বোস্টনে ফিরে যেতে বাধ্য

হয়েছিল। শুধু তাই নয়, স্থানীয় সৈনিকদের সাহায্যার্থে নিকটবর্তী উপনিবেশের হাজার হাজার স্থানীয় সৈনিক বোস্টনে একত্রিত হয়েছিল।

এই সময়ে বিভিন্ন উপনিবেশের প্রতিনিধিরা দ্বিতিয় কনটিনেন্টাল কংগ্রেসে মিলিত হয়ে বিকল্প ব্যবস্থনার সন্ধানে আলোচনা শুরু করেছি । এবং শান্তিপূর্ণ সমঝোতার শেষ প্রচেষ্টা স্বরূপ তারা ব্রিটেনের কাছে একটা আবেদনপত্র পাঠায়, যা 'Olive Branch Petition' নামে পরিচিত। এই আবেদনপত্রে তারা ইংল্যান্ডরাজ তৃতীয় জর্জের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রকাশ করে এবং রাজাকে তাদের অভাব অভিযোগের প্রতি মনোনিবেশ করতে আবেদন জানায়। কিন্তু ইংল্যান্ডরাজ তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং সরকারীভাবে উপনিবেশগুলিকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করে বলপূর্বক দমন করতে উদ্যত হন।

টিপ্পনী

২.৩.৩. আমেরিকার বিপ্লব ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনাবলী :

আমেরিকার বিপ্লব শুরু হয়েছিল ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে। এই সময় বোস্টনের ব্রিটিশবাহিনীর একটা অংশ কনকর্ডে ও অস্ত্রশস্ত্র অবরোধ করতে গিয়ে স্থানীয় সৈনিকদের প্রবলবাধার সম্মুখীন হয়েছিল এবং তারা বাধ্য হয়েছিল বোস্টনে ফিরে আসতে। কিন্তু অসন্তোষের আগুন তখন চারিদিকে ও ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং দক্ষিণের ১৩টি উপনিবেশে সংখ্যায় কম ব্রিটিশ গ্যারিসনগুলির ক্রমাগত পরাজয় ঘটেছিল। টিকোন্তেরোগা দূর্গ (Fort Ticonderoga) -র পতন ঘটেছিল মে মাসে এবং মন্ট্রেয়াল (Montreal) এর আগস্টে। অক্টোবরে ব্রিটিশ বাহিনী বোস্টন ত্যাগ করেছিল । ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষে উত্তর আমেরিকায় ব্রিটেনের আধিপত্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পেয়েছিল। এই সময়ে তার দখলে ছিল শুধু কানাভিয় উপকূল এবং কানাভার কিউবেক শহরের একটি গ্যারিসন।

১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন বিদ্রোহ দমন করতে ৭৫০০০ সেনা উত্তর আমেরিকায় পাঠিয়েছিল। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসে ঔপনিবেশিকরা ফিলাডেলাফিয়াতে মিলিত হয় এবং ৪ জুলাই তারা ইংল্যান্ডের থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তবে ঔপনিবেশিক সেনারা উন্নত অস্ত্রসজ্জিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করতে পারেনি। বস্তুত তারা ব্রুকলিন হাইটের যুদ্ধ (battle of Brooklyn Heights) এ লজ্জাজনকভাবে ব্রিটিশদের কাছে পরাজিত হয়। এরই ফলশ্রিতিতে ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের শেষে কিউবেক, নিউইয়র্কশহর, এবং নিউজার্সির অধিকাংশ অঞ্চল ব্রিটিশদের দখলে চলে আসে। যদিও বড়দিনের সপ্তাহে জেনারেল জর্জ ওয়াশিংটন পেনসিলভেনিয়া থেকে নিউজার্সিতে ফিরে এসেছিলেন এবং উপস্থিত হয়েছিলেন ট্রেনটন (Trenton) ও প্রিন্সটন (Princeton) এর দূরবর্তী ব্রিটিশ গ্যারিসনগুলিতে এরই প্রেক্ষিতে যুদ্ধ একটা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে যা শেষপর্যন্ত বলবৎ ছিল। ব্রিটিশরা যে অঞ্চলগুলি দখল

টিপ্পনী

করেছিল - মুখ্যত নিউইয়র্ক শহর ও ফিলাডেলফিয়া - সেখানে তাদের বলিষ্ট শাসনক কায়েম করেছিল। বাকি অঞ্চলগুলি ছিল ঔপনিবেশিকের শাসনাধীনে।

১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ১০০০০ সৈন্যর একটা সেনাদল কিউবেক থেকে এসেছিল। একই সময়ে নিউজার্সির অপেক্ষাকৃত বড় সেনাদলটি ডেলাওয়ের (Delaware) নদী অতিক্রম করে এবং উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম শহর ও ঔপনিবেশিক রাজধানী ফিলাডেলফিয়া দখল করে নেয়। যদিও টিকোনডেরোগা (Ticonderogo) পুনর্দখলের পর উত্তরের বাহিনীকে পরপর Bennington, Fort Starwix এবং Saratoge এর নিকট দুটি যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হতে হয়। অক্টোবরের মধ্যে ৫৭০০ সৈন্য মন্ট্রেয়াল এর দক্ষিণে ১৩০ মাইল দূরে দুর্গম স্থানে স্বল্পরসদ সহ আটকে পড়ে।

১৭ অক্টোবর জেনারেল Buroyne নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশবাহিনী ঔপনিবেশিকদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। ব্রিটিশদের পরাজয়ের সংবাদ জার্মানটাউন এর যুদ্ধ (Battle of Germantown) কেও প্রভাবিত করে এবং ঔপনিবেশিক বাহিনীর চাপে বিভ্রান্ত হয়ে অপ্রতিরোধ্য ব্রিটিশ সেনা পলায়ন করে। এরপর বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ফরাসীদের আশ্বস্ত করলে এবং উত্তর আমেরিকা থেকে ঔপনিবেশিকদের সম্ভাব্য জয়ের সংবাদ এলে ফরাসীরা ঔপনিবেশিকদের পক্ষ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই যুদ্ধে ফরাসীরা অংশ গ্রহণ করলে এই সংঘর্ষ জীবন মরণের যুদ্ধে পরিণত হয়। ঔপনিবেশিকরা একটা শক্তিশালী ছিল না যে ফিলাভেলফিয়া ও নিউইয়র্ক থেকে ব্রিটিশদের উৎখাত করতে পারে। তবে ব্রিটিশরা নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও গ্রামাঞ্চল এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রধান বসত এলাকাগুলির উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারেননি। এছাড়া উপনিবেশগুলির অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিল এবং ব্রিটিশ অর্থনীতিও ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ ব্যায় ও আমেরিকায় এক বিশাল সৈণ্যবাহিনীর ভরণপোষণ করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করে দক্ষিণের উপনিবেশগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। জেনারেল কর্নওয়ালিস এর নেতৃত্বে ৭০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরিত হয়। এই বাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ছিলন দক্ষিণে যারা ব্রিটিশদের সমর্থক তাদের সাহায্য করা। কিন্তু ন্যাথানিয়েল গ্রীনি (nathaniel Greene) কর্ণওয়ালিসের বিরোধীতা করেছিলেন। বলাবাহুল্য, প্রতিটি যুদ্ধে গ্রীনি পরাজিত হয়েও কর্ণওয়ালিসের বাহিনীর মনোবল ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। যাইহোক শেষ পর্যন্ত রসদের অভাবে কর্ণওয়ালিস তার বাহিনীকে ভার্জিনিয়ার ইয়র্কটাউন (Yorktown)-এ স্থানান্তর করেন এবং রসদ ও সাহায্যের জন্য অপেক্ষায় থাকেন।

প্রসঙ্গত, স্থলযুদ্ধে ব্রিটিশবাহিনী ও ঔপনিবেশিক বাহিনী যখন সংগ্রামে রত তখন ফরাসী নৌবাহিনী ৫ সেপ্টেম্বর চেসাপিকের যুদ্ধ (Battle of the Chesapeake) এ ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে। এরফলে কর্ণওয়ালিস পর্যাপ্ত সেনা ও রসদ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। এই পরিস্থিতিতে জর্জ ওয়াশিংটন নিউইয়র্ক থেকে সেনা সরিয়ে নেনে এবং ১৬-১৭ হাজারের ঔপনিবেশিক ফরাসী যৌথবাহিনী মিলিতভাবে ইয়র্কটাউনের যুদ্ধ শুরু করে ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে ৬ অক্টোবর। এতে কর্ণওয়ালিস ক্রমশ কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। ১৯ অক্টোবর ব্রিটিশ বাহিনী আবার ঔপনিবেশিকদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে।

১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্স (House of Commons) এ আমেরিকার উপনিবেশগুলির সাথে ব্রিটেনের যুদ্ধ সমাপ্তির ঘোষণার্থে একটি বিলপাশ করা হয়। যুদ্ধে সমর্থক লর্ড নর্থ বহিষ্কৃত হন। ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে গ্রীষ্মের মধ্যে ব্রিটেনে দক্ষিণ ক্যারোলিনার চারর্লেস্টন এবং জর্জিয়ার সাভানা (Savannah) থেকে সৈন্যবাহিনী প্রত্যহার করে নেয়। ১৭৮২ খ্রিঃ এ নভেম্বর মাসে এক শান্তির পরিবেশ ফিরে আসে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের প্রকৃত সমাপ্তি ঘটেছিল ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে প্যারিসের সন্ধি (Treaty of Paris)- র মাধ্যমে।

স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র ও প্যারিসের চুক্তি :

প্যারিসের চুক্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' এর স্বীকৃতি দানের মধ্য দিয়ে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল।

স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র (Declaration of Independence) :

দ্বিতীয় কনটিনেন্টাল কংগ্রেসে জর্জ ওয়াশিংটনকে সেনাপতিপদে বরণ করে তাঁর হাতে উত্তরে বোস্টন অবরোধকারী সেনাবাহিনীর দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল। এছাড়া এই কংগ্রসে ক্ষুদ্র নৌবহর গঠন এবং স্থানীয় সৈনিকদের পেশাগত কনটিনেন্টাল সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার উপযুক্ত করে তোলার জন্য কিছু অর্থও বরাদ্দ করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, ঔপনিবেশীকদের বলিষ্ঠ সামরিক অভিযানে উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছু ঔপনিবেশীক (Colonist) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিন থেকে স্বশাসন লাভের পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা প্রচার করতে শুরু করেছিল। পরের বছরই ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ২ জুলাই কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষেই ভোট দেয়। ভার্জিনিয়ার এক তরুণ আইনজীবি টমাস জেফারসন (Thomas Jefferson) স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া রচনা করেন। এটা ঘোষণাপত্রের মধ্য দিয়েই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (United States) এর উদ্ভব ঘটেছিল।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্যারিসের চুক্তি (Teaty of Paris) :

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে। এই সময় প্যারিসের শান্তি বৈঠকে ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও স্পেন আলাপ আলোচনার জন্য সমবেত হয়েছিল। এখানেই প্যারিসের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল। এই চুক্তিতে পশ্চিমী শক্তির অধিকৃত সকল এলাকার আমেরিকাবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রকে এক সাম্প্রতিক নতুন এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ সেনার শেষ দলটি নিউইয়র্ক ত্যাগ করে এবং সেই মাসেই আমেরিকার সরকার নতুন রাষ্ট্রের সকল নিয়ন্ত্রণ হাতে পায়। বলাবাহুল্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে হাইস অব কমনস্ যখন ইয়র্কটাইনে ব্রিটিশ সেনার আত্মসমর্পনের সংবাদ পেয়েছিল তখন সদস্যদের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। যুদ্ধে পরাজয়ের আশঙ্কার তাঁরা অন্যপন্থা ভাবতে শুরু করেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড সেলবার্ণ (Lord Shelburne)। লর্ড সেলবার্ণ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসানের পর আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি রিচার্ড অসওয়াল্ড (Richard Oswald) কে প্যারিসে পাঠিয়ছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জন অ্যাডাম এবং জন জে (John Jay) প্রমুখ আমেরিকান প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনার জন্য। ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে ৩ সেপ্টেম্বর প্যারিসের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ এপ্রিল এর কিছু সংশোধন করা হয়। যদিও সংশোধিত চুক্তিতেও পূর্বের আমেরিকার স্বাধীনতা বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ছিল।

প্যারিসের চুক্তির শর্তসমূহ :

চুক্তির শর্তানুসারে ব্রিটেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করে নেয়। ব্রিটেন আমেরিকা থেকে সকল সেনা প্রত্যাহার করে নিতে সম্মত হয়। এছাড়া এই চুক্তিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র সীমানারও পুনগর্ঠন করা হয় এবং উত্তরে গ্রেট লেক (Graeat Lakes) থেকে দক্ষিণে ফ্লোরিডা এবং আটল্যান্টিক মহাসাগর থেকে মিসিসিপি নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ন অঞ্চল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আসে।

এই চুক্তিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র শান্তিপূর্ণভাবে আমেরিকা থেকে ব্রিটিশ সেনার অপসারণে সম্মতি দেয়। আমেরিকা ব্রিটেনের সমস্ত ধন পরিশোধ করতে সম্মত হয়। এছাড়া আমেরিকা আশ্বাস দেয় যে, আমেরিকায় ব্রিটিশ অনুগতদের কোনরকম নির্যাতন করা হবে না এবং যারা যুদ্ধের সময় আমেরিকা ত্যাগ করেছে তাদের ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়।

২.৩.৪. আমেরিকার বিপ্লবের ফলাফল ও তাৎপর্য :

আমরিকার বিপ্লবের সাফল্যে আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এই রাজ্যগুলি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করলে নতুন সংবিধান রচনা করা হয় এবং সনদও গ্রহণ করা হয়। আমেরিকায় নতুন সংবিধান প্রনয়ন করা হয় ১৭৮৭ খ্রিঃ। তবে এই সংবিধান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্যকে সুদৃঢ় করলেও এর মধ্যে কিছু পরস্পর বিরোধী প্রতিবিধান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একদিকে যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের 'সাম্য' (equality) এর অধিকারের কথা বলা হয়েছিল অন্যদিকে সেখানে অ্যাঙ্গো-আমেদরিকান দাসপ্রথাকেও বজায় রাখা হয়েছিল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে নেটিভদের বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। কারণ, এরপর আরও বেশি সংখ্যায় ঔপনিবেশিক অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের আগমন ঘটেছিল আমেরিকায়। এর প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিকদের সাথে নেটিভদের সংঘর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এসব সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার বিপ্লবের তাৎপর্যকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ, সেই সময় অর্থাৎ ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং সকল মানুষের সম্মতিতে শাসনকার্য পরিচালনার ঘটনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমেরিকার বিপ্লবের সাফল্য ফ্রান্স ও লাতিন আমেরিকার বিপ্লবকে উৎসাহিত করেছিল। আমেরিকার বিপ্লবের স্বাধীনতা ও স্বশাসনের আদর্শ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আলোকদিশা হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

আমেরিকার জ্ঞানদীপ্তি আন্দোলন আমেরিকার বিপ্লবের আদর্শগত ভিত্তি প্রদান করেছিল। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, উদারনিতিবাদ ও প্রজাতন্ত্রবাদ বিপ্লবী আদর্শকে সমৃদ্ধ করেছিল। আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের এই মহান ভাবাদর্শগুলি সামাজিক - সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে পরিবর্তন এনেছিল এবং এমন এক বৌদ্ধিক পরিমন্ডল গড়ে তুলেছিল যা প্রগতিশীল সমাজ গঠনে সহায়ক হয়েছিল।

১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে নারীদের সাম্যের আদর্শ এবং তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রদানের ধারণা তৎকালীন সময়ের নিরিখে যথেষ্ট অভিনব ছিল। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে আমেরিকা সকলকে অর্থাৎ সম্পত্তিহীন মানুষ, নারী, এবং যেকোন বর্ণের মানুষকে নাগরিকত্ব প্রদানে উদ্যোগী হয়েছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের তাৎপর্য :

বিশ্বের ইতিহাসে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এক যুগান্তকারী ঘটনা এর ফলাফল ও তাৎপর্য ছিল সুদূর প্রসারী।

১. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নামে এক নতুন রাষ্ট্রেরের উদ্ভব ঘটেছিল। প্যারিসের চুক্তি

টিপ্পনী

টিপ্পনী

(১৭৮৩) র মাধ্যমে ইংল্যান্ড আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল।

২. ওয়েস্ট ইন্ডিজের টোবাগো (tobago) এবং পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল (Senegal) ফরাসি অধিকারে এসেছিল। মিনোর্কা (Minorca) এবং ক্লোরিডা-র উপর স্পেনের ও নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হয়েছিল।

৩. ইংল্যান্ড ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। ইংল্যান্ড শুধু মাত্র উপনিবেশগুলি হারায় নি, তার সাথে জাতীয় ঋণের বোঝা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে ব্রিটিশ নৌশক্তির প্রাধান্য ম্লান হয় নি। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ নৌশক্তির কাছে ফরাসী ও স্পেনীয় নৌবহর চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছিল।

৪. আমেরিকার বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করে ফ্রান্স কেও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই যুদ্ধের সময় নৌশক্তি ও সামরিক খাতে ফ্রান্সকে যে বিপুল ব্যায় করতে হয়েছিল তার ফলে রাজকোষে টান পড়েছিল এবং শেষপর্যন্ত ফরাসী সরকার দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতি ফরাসী রাজতন্ত্রের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। কারণ ফরাসীরা আগেই প্রত্যক্ষ করেছিল আমেরিকাবাসীরা কিভাবে রাজতন্ত্রকে অপসৃত করেছিল। তাই তারা আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকে কার্যকরী করতে উদ্যত হয়েছিল।

৫. বিপ্লবের পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কনটিনেন্টাল কংগ্রেস যে সংবিধান কাঠামো তৈরি করেছিল তার ফলে এক নতুন সংবিধান রচিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, ফিলাডেলফিয়াকে একটা বিশেষ দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এই সংবিধান রচনা করেছিল। এই প্রতিনিধিদের সম্মেলন ১৭৮৭ খ্রিঃ এর সাংবিধানিক সম্মেলন (Constitutional Convention) নামে পরিচিত।

৬. আমেরিকা নতুন প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে। এর মাধ্যম রাজতন্ত্র ও মানুষের উপর রাষ্ট্রের অবাধ নিয়ন্ত্রণের ধারণা পরিত্যাক্ত হয়। এছাড়া এই যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক চরিত্র পরিলক্ষিত হয়। বলাবাহুওল্য, এটাই ছিল প্রথম রাষ্ট্র যেখানে প্রকৃত অর্থে জনগণের সম্মতিতে শাসন শুরু হয়েছিল।

আমেরিকার বিপ্লব সাংবিধানিক শাসনতন্ত্র সূচনা করেছিল। যুদ্ধের শেষে ঔপনিবেশিকরা প্রথমে 'Articles of confederation' এর পরিমার্জন ঘটিয়েছিলো। আসলে এই ধারার মাধ্যমে প্রকৃত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বাঁধন ছাড়াই উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনভাবে একত্রিত করা হয়েছিল। তাই প্রবল আপত্তি সহকারে নেতৃবর্গ এই ধারাগুলি বর্জন করে ১৭৮৭ খ্রিঃ সংবিধানের পরিমার্জন ঘটিয়েছিলেন। এই পরিমাজর্নের পরিনতিতেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বর্তমান রূপ নিয়েছিল। যাইহোক ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিলে জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বিপ্লব আমেরিকার ধর্মীয় জীবনকেও আলোড়িত করেছিল। এর প্রেক্ষিতে আমেরিকাবাসীর কঠোর ক্যালভিনবাদ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছিল। যদিও তারা বিশ্বাস করত যে, 'মানুষের প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার আছে, আত্মসুখের সন্ধান মানুষের জন্মগত অধিকার সকল মানুষই সমান, সমাজের উন্নতির জন্য ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা জরুরী .....'

বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে আমেরিকান ও ইউরোপীয় বিশেষত ইংলিশ চার্চের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েগিয়েছিল। 'Congregational' চার্চগুলি পূর্ণস্বশাসন পেয়েছিল এবং 'Presbyterian' চার্চগুলি 'ইংলিশ' চার্চগুলির সাথে বন্ধন বজায় রেখেছিল। বিপ্লবের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল 'Bill of Rights' প্রণয়ন। সংবিধানে প্রথম যে দশটি সংশোধন করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল ধর্মসংক্রান্ত। এই সংশোধনের ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রভাব অপসৃত হয়েছিল। তবে এর ফলে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগীতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অগ্রগতির পরিমাপ কর :

৪. আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ কবে শুরু হয়েছিল?

৫. অষ্টাদশ শতকে আমেরিকায় প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ সমর্থনকারী তিনজনের নাম লেখ।

৬. পোনটিয়াককে ছিলেন?

৭. আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ কবে শেষ হয়েছিল?

২.৪. দাসপ্রথা

ষোড়শ শতাব্দী থেকে আমেরিকায় দাসপ্রথা প্রচলন হয়। দাস ব্যবসার প্রথম সূচনা করেন জনৈক ওলন্দাজ বণিক। ষোড়শ শতাব্দীতে এই বণিক মাত্র কুড়িজন নিগ্রোকে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে ধরে নিয়ে এসে আমেরিকার জেমস টাউন এ বিক্রি করে। তারপর থেকেই এক শ্রেনীর ব্যাবসায়ী আফ্রিকা থেকে নিগ্রোদের ধরে এনে আমেরিকার বিভিন্ন উপনিবেশে বিক্রি করত প্রচুর লাভের বিনিময়ে। তবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিপ্লবের সময় কিছু আমেরিকান রাষ্ট্র দাসপ্রথার বিরোধীতা করেছিল। ডেলাওয়ের ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং ভার্জিনীয়া ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে আফ্রিকা থেকে দাস আমদানি নিষিদ্ধ করেছিল। ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ভার্মান্ট প্রথম রাষ্ট্র হিসাবে দাস প্রথার অবলুপ্তি ঘটিয়েছিল। রোড আইল্যান্ড ১৭৭৮ খ্রিঃ এ উপনিবেশ থেকে দাস সংগ্রহ নিষিদ্ধ করেছিল এবং ১৭৮০ খ্রিঃ পেনসিলভার্নিয়া ক্রমশ দাসদের মুক্ত করতে শুরু করেছিল।

আমমেরিকার সংবিধান যখন রচিত হয়েছিল তখন দাসপ্রথার বিষয়ে বিশেষ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কিছু উল্লেখ করা হয় নি। তবে সংবিধানের একটা ধারায় পলাতকদের ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়েছিল, এবং এই পলাতকদের মধ্যে অপরাধীদের সাথে দাসদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, জনসংখ্যা নির্ধারণ ও প্রতিনিধি সভায় (House of Rebresentatives) প্রতিনিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রের একজন দাসকে একজন সাধারণ মানুষের ৩/৫ অংশ হিসাবে ধরা হবে। অর্থাৎ ৩ জন দাস ৫ জন সাধারণ মানুষের সমান হিসাবে বিবেচিত হবে।

তবে আমেরিকার সংবিধান দাস বা দাসপ্রথার বিষয়ে যথেষ্ট নম্র ছিল। তাই দেখা যায় সংবিধান দ্বারা দাসদের আমদানি নিষিদ্ধ করার সময় 'দাস' বা 'দাসত্ব' জাতীয় শব্দ সংবিধানে উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে দাসব্যবসাকে প্রথম শ্রেণীর অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আমরিকার মানুষরা সাধারণভাবে মনে করত সময়ের সাথে দাসপ্রথার অবলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল। আমেরিকার দক্ষিণের মানুষেরা একটা সময় দাসপ্রথাকে অশুভ বলে মনে করত কিন্তু ক্রমশ তারা দাসপ্রথাকে সমর্থন করতে শুরু করেছিল এবং এর মধ্যে তারা এক সদর্থক দিক প্রত্যক্ষ করেছিল।

২.৪.১. দাসপ্রথা অবসাচনের আদিকথা :

আমেরিকায় দাসপ্রথা অবসানের উৎস নিহিত ছিল আমেরিকার বাইরে। অষ্টাদশ শতকে গ্রেট ব্রিটেন দাস ব্যবসার মাধ্যমে আর্থিক দিক দিয়ে বেশ লাভ করেছিল। ট্রাস আটল্যয়ান্টিক দাসব্যবসা, যা ত্রিকেটনিক দাস ব্যবসা হিসাবে পরিচিত ছিল, তিনভাবে পরিচালিত হত : আফ্রিকার ক্রিতদাসদের বিনিময় হত ইউরোপীয় পণ্যের সাথে, আমেরিকান কৃষকরা আফ্রিকার দাস ক্রয় করত এবং উৎপাদিত ফসল ইউরোপে ভোগের জন্যে রপ্তানি করা হত।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে ইউরপে দাসপ্রথার বহুল প্রচলন ছিল এবং খুব কম সংখ্যক মানুষই এর বিরোধীতা করত। ব্রিটেনে দাস ব্যবসার ভালো কদর ছিল, কারণ এর ফলে দেশের আয় বাড়ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। কারণ এই সময় কোয়েকাররাও ও অনান্য ধর্মীয় শীর্ষ স্থানীয় ব্যাক্তিরা দাসব্যবসাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শুরু করছিলেন। তাঁরা এই দাসব্যবসার সাথে জড়িত অমানুষিকতা ও নৃশসংসতার ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলেন। ইংল্যান্ডের টাস ক্লার্কসন (১৭৬০ -১৮৪৫) ছিলেন দাসপ্রথার চরম বিরোধী। তিনি এবং দাসপ্রথা উচ্ছেদের আর এক সমর্থক গ্রেনভিলম শার্প ১৭৮৭ খ্রিঃ যৌথ প্রচেষ্টার গঠন করেছিলে 'Association for the Eliminator of the Slave Trade' নামে একটি সংগঠন। এঁরা দুই জনই সহস্রাধিক নাবিকের সাথে সাক্ষাৎকার করে দাসদের দুরাবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁরা পার্লামেন্টে দাসপ্রথার

অবসান এর ব্যাপারে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পার্লামেন্টের সদস্য উইলিয়াম উইলাবারফোর্স এর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। এছাড়া তাঁরা দাসপ্রথার অবসানের জন্য জনমত সংগঠন করেছিলেন এবং বিনভিন্ন প্রতিবাদী প্রচার পুস্তিকার প্রকাশন, র‍্যালি সংগঠন এবং বক্তৃতা ও তহবিল গঠনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে এব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিলেন। যাইহোক 'Society for the Afolition of slave Trade' সংগঠন প্রতিষ্ঠার কুড়ি বছর পর দাসপ্রথার অবসানের সমর্থনকারীদের নিরলস প্রচেষ্টা কিছুটা ফলপ্রসূ হয়েছিল। কারণ ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে দাস ব্যবসা বন্ধের জন্য আইন (Slave Trade Act) পাশ করা হয়েছিল এই আইন ট্রাস আটল্যান্টিক দাস ব্যবসায় ব্রিটেনের অংশগ্রহন নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।

টিপ্পনী

দাস ব্যবসা আইন শুধুমাত্র দাসব্যবসা নিষিদ্ধ করেছিল কিন্তু দাসপ্রথার অবসান ঘটায় নি। তবে এই আইনে দাসপ্রথাকে বৈধ বলেও উল্লেখ করা হয় নি। যাইহোক এরপর দাসপ্রথা উচ্ছেদকারীদের দীর্ঘ সংগ্রামের পরিপেক্ষিতে ১৮২৪ খ্রিঃ এ এলিজাবেথ হেরিক (1769 -1831) 'IMMMEDIATE NOT GRANUAL ABOLITION' শীর্ষক প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে দ্রুত দাসপ্রথা অবসনের দাবি জানিয়েছিলেন। এলিজাবেথের এই আবেদন ব্রিটেনে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছিল।

গ্রেট ব্রিটেনে এলিজাবেথ হেরিক এর দাস প্রথার দ্রুত অবসানের দাবি সাত বছর পর প্রকৃত অর্থে কার্যকর হয়েছিল। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে পার্লামেন্টে দাসপ্রথা অবসান আইন পাশ করা হয়েছিল এবং পরবর্তী চারবছরের মধ্যে সমস্ত দাসদের মুক্ত করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। এমনকি এই আইনে দাস মালিকদের ক্ষতিপূরন দানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

গ্রেট ব্রিটেনে দাস প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন আমেরিকা গভীর ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিল। আমেরিকাতেও ব্রিটেনের দাসপ্রথা বিরোধী সংবাদ ও পত্রপত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল এবং ওয়েষ্ট ইন্ডিয়ানদের মুক্তির সংবাদে আমেরিকার দাসপ্রথার অবসানে সমর্থনকারীরা আনন্দিত হয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে একইভাবে আমরিকাতেও দাসপ্রথার অবসান ঘটবে।

আমমেরিকায় দাস প্রথা অবসানের লক্ষ্যে উগ্র আন্দোলন :

গ্রেট ব্রিটেনে দাসপ্রথার অবসানের পর আমেরিকাতেও দাসপ্রথা অবসান আন্দোলনে গতি আসে। এতদিন যে আন্দোলনে মন্থরভাব ছিল তার মধ্যে হঠাৎ তীব্রতা আসে। দাসপ্রথার সাথে ধর্মীয় আবেগ যুক্ত করে তাকে একধরনের অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া আরও বলা হয় যে, আমেরিকায় দাসপ্রথা বজায় রেখে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' কে অবমাননা করা হয়েছে। এইসব বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিয়েই আরও অধিকতর উৎসাহী দাসপ্রথা উচ্ছেদে সমর্থনকারী কর্মীদল চিরাচরিত

ভাবে দাসপ্রথার ক্রম অবসনের পরিবর্তে দ্রুত অবসানের পন্থা অবলম্বণ করে।

দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা ব্যবহারেও পরিবর্তন আসে। দাসপ্রথার অবসানে সমর্থক মানুষেরা আরও বেশি উগ্রভাবা এবং চিত্তাকর্ষক ছবি ব্যবহার করতে থাকে দাসপ্রথার দ্রুত অবসান এর লক্ষ্যে। নম্রভাবে এই প্রথার অবসানের আবেদন করার পরিবর্তে তারা মানুষকে নাটকীয় ভাষায় এব্যাপারে উদ্দীপিত করতে থাকে। দাসপ্রথা বিরোধীদের র‍্যালি ও সম্মেলনে শুধু লেখা পোষ্টার নয় চিত্তাকর্ষক ছবিও ব্যবহার করা হচ্ছিল। আসলে শুধুমাত্র লেখার মাধ্যমে তাদের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত বার্তা সকলের কাছে পৌছে দেওয়া সম্ভব নয় একথা উপলব্ধি করেই তারা ছবি ও চিত্রের ব্যবআর শুরু করেছিল। চিত্রগুলিতে দাসপ্রথাকে অলিকভাবে প্রদর্শন করা হয়েছিল। তাদের প্রচারবার্তা এবং চিত্রগুলির মধ্যে দাসদের দাসত্ব মুক্ত করার পর তাদের সমাজ থেকে বহিষ্কার না করে তাদের সমান নাগরিক অধিকার প্রদান করার আবেদনও পরিলক্ষিত হয়েছিল। এছাড়া এগুলির দ্বারা বোঝানে হয়েছিল যে, প্রকৃত আমেরিকান সমাজে কোন ধরনের জাতপাত এবং দাসত্বের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

টিপ্পনী

১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে ডেভিড ওয়াকার এর 'A REQUEST TO THE COLOURE NATIVES OF THE WORLD' - শীর্ষক আবেদনপত্রে দাসপ্রথা বিলোপের এক নতুন উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত, ডেভিড ওয়াকার ছিলেন একজন মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ। তাঁর জন্ম হয়েছিল উত্তর ক্যারোলিনায়, পরবর্তীকালে তিনি বোস্টনের এক পুরনো জামা কাপড়ের দোকানের মালিক হয়েছিলেন। যাইহোক তিনি তাঁর 'আপীল' বা আবেদনপত্র সমস্ত রকম বৈষম্য ও জাতপাতগত কুসংস্কারের নিন্দা করেছিলেন এবং দাসপ্রথার অবমানের জন্য সকল কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকাবাসীদের সংগঠিত হতেও প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের কথাও বলেছিলেন। এছাড়া তিনি শ্বেতাঙ্গদের সতর্ক করে বলেছিলেন যে, যদি তারা পাপাচার বন্ধ না করে তাহলে তাদের ঈশ্বরের রোষানলে পড়তে হবে। এ প্রসঙ্গে এই 'আপীল' এ বাইবেল ও 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' এর অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছিল। এছাড়া তিনি প্রাচীন আফ্রিকান সভ্যতার উৎকর্ষতা ও অবদানের কথাও তুলে ধরেছিলেন। শ্বেতাঙ্গ পাঠকদের প্রতি তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্য ছিল -'Don't tell us anymore about colonization for America it is ac much our country as it is yours'

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতিরোধ এবং গ্যারিসন (Garrison) এর উত্থান :

আমেরিকার উত্তরের মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ ও দক্ষিণের দাসদের মধ্যে দাস প্রথা বিরোধী আইনগুলি ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল। আফ্রো-আমেরিকানদের মুক্তির লক্ষ্যে সংঘটিত বিদ্রোহ উত্তরে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তরের রাজ্যগুলির কৃষ্ণাঙ্গরা স্বাধীনতার সমর্থনে নিজেদের মধ্যে দল গঠন করতে

শুরু করেছিল । বলাবাহুল্য ১৮২০ র দশকের শেষদিকে দাসপ্রথা বিরোধী সংগঠনগুলিতে কৃষ্ণাঙ্গদের সদস্যপদ তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ইতিমধ্যে ওয়াকার এর প্রতিবাদী ভাষা দাসমালিক ও দাসপ্রথার শ্বেতাঙ্গ সমালোচকের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । স্বাধীন কৃষ্ণাঙ্গ নাবিকেরা গোপনে দক্ষিণে প্রচার পুস্তিকা ছড়াতে শুরু করলমে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির কাছে তা চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়ায় এবং কিছু রাষ্ট্র ওয়াকারের ক্ষতি করতে উদ্যত হয়। বলাবাহুল্য, ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে রহস্যজনকভাবে ওয়াকার এর মৃত্যু হয়েছিল।

বোস্টন থেকে প্রকাশিত উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসন (Willam Lloyd Garrison) এর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'The Liferator' এ নতুন প্রজন্মের দাসপ্রথা বিলোপন্থীদের চিন্তাধারা স্থান পেয়েছিল । বলাবাহুল্য, গ্যারিসন নিজেকে কঠোর বাস্তববাদী ও ন্যায়পরায়ন হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। দাসপ্রথার অবসানের ব্যাপারে তিনি কোনপ্রকার সমঝোতা করতে চান নি । যাইহোক, তাঁর 'The Liberator' পত্রিকা কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল এবং তারাই ছিল এর মুখ্য গ্রাহক।

গ্যারিসন যখন দাসমালিকদের বিরুদ্ধে লিখতে নিয়ে তাদের 'ব্যাভিচারী ও বিকৃত প্রজন্ম এবং বিষধর সাপের জাত' বলে ভৎসনা করেন তখন দক্ষিণীরা তাঁর নিন্দায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল। যাইহোক গ্যারিসন শীঘ্রই কুখ্যাত হয়েগিয়েছিলেন। তাঁর কিছু বক্তব্যতো দাসপ্রথা বিলোপপন্থীদের কাছেও যথেষ্ঠ আক্রমণত্মাক মনে হয়েছিল । গ্যারিসনের দ্রুত দাসপ্রথা বিলোপের দাবি অনেকের সমর্থন আদায় করেছিল। গ্যারিসনের 'Thought on American Colonization' শীর্ষক প্রচার পুস্তিকা আমেরিকান সমাজের অংশ হিসাবে কৃষ্ণাঙ্গদের গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরিতে সাহায্য করেছিল। বলাবাহুল্য, দাসপ্রথা বিরোধী ও দাসপ্রথার বিলোপ সংক্রান্ত অনেক জার্নাল সেই সময় প্রকাশিত হলেও গ্যারিসনের 'The Liberator' এর মতো কোন পত্রিকাই জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি।

দাসপ্রথা বিলোপপন্থীদের বিভিন্ন কৌশল ও দাসপ্রথা বিলোপ বার্তার সঞ্চারণ :

দাসপ্রথা বিলোপপন্থীরা আমেরিকায় দাসপ্রথার অবসানের জন্য নানাবিধ কৌশল ও পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে তাঁরা দাসপ্রথা বিরোধী মানসিকতা সম্পন্ন মানুষদের নিয়ে দল তৈরি করে এক জোটে দাস প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন । American Anti - Salvery Society র মত দলগুলি প্রাথমিক কৌশল হিসাবে বক্তৃতা এবং মানুষের মধ্যে দাসপ্রথাবিরোধী প্রত্যয় উৎপাদনকে বেছে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে দলের সক্রিয়কর্মীরা আরও উন্নত ও প্রত্যক্ষ কৌশল অবলম্বন করেছিল যখন তারা উপলব্ধী করেছিল যে শুধুমাত্র উৎসাহ প্রদান কর্মসূচী ফলপ্রদ

টিপ্পনী

হচ্ছে না।

আমেরিকায় দাসপ্রথা বিলোপ আন্দোলন ধীরে ধীরে গতি পেয়েছিল এবং প্রথমে উত্তরাঞ্চলের সর্বত্র প্রসার লাভ করেছিল। শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং মুদ্রণ প্রযুক্তির অগ্রগতি দাসপ্রথার বিলোপবার্তা প্রচারে সাহায্য করেছিল। ১৮৩৩ খ্রিঃ এ 'American Anti - Salvery Society' গঠন থেকে সেই দশকের শেষের দিক পর্যন্ত সময় পর্বে প্রায় এক লক্ষ উত্তরাঞ্চলের মানুষ দাসপ্রথার অবসান আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, কৃষক, শ্রমিক, কারিগর ও দোকানদারের মতো সাধারণ নাগরিকরা এই আন্দোলনে সরিক হয়েছিল। নিউইয়র্কের আর্থার ও লুইস তাপান (Lewis Tapan) এর মত কিছু বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরাও এই আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছিল।

টিপ্পনী

অনেক দক্ষিণীরা মনে করত যে দাসদের মুক্তি লাভের জন্য শক্তিপ্রয়োগ করা উচিত। এই চিন্তাভাবনা আরও শক্তিশালী হয় 'The Liberator' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর যখন নাটটার্নার এর বিদ্রোহের সুত্রপাত ঘটেছিল। তবে এই চিন্তাভাবনা বেশী দৃঢ়মূল হয়নি। কারণ, যদিও দাসপ্রথা বিলোপপন্থীরা দাস প্রথার অবসানের জন্য আক্রমণাত্মক ভাষায় তাদের বক্তব্য প্রচার করেছিল তবুও তারা বিশ্বাস করত যে, হিংসার মাধ্যমে দাসপ্রথার অবসান আদর্শ কাজ হবে না।

দাসপ্রথা বিরোধী প্রচার কার্য ও সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে দাসপ্রথা বিলোপপন্থীরা মুখ্যত সমাজ সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তারা উপলব্ধি করেছিল যে গণতন্ত্রে জনমত সংগঠন কচরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তারা রাজনৈতিক ব্যাক্তিদের সাথে যোগ সাজেশের চেষ্টা না করে দাসপ্রথার অশুভ দিকগুলির প্রতি সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায় ব্যপ্ত হয়েছিল। আর জনসমর্থন লাভ ও উত্তেজক ভাষা ব্যহার করেছিল।

দাসপ্রথা বিলোপপন্থীদের কর্মসূচীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'Underground Railroad' যেখানে পলাতক দাসেরা আশ্রয় নিত। এই 'Underground Railroad' ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে কানাডা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল এবং এখানে হাজার হাজার পলাতক দাসেরা নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিল।

দাসপ্রথা বিলোপপন্থীদের দাস প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সাধারণ মানুষের মনে ভাবগত পরিবতর্ন নিয়ে এসেছিল। তারা জ্যাকসনিয়ান আমেরিকার (Jaksonian America) স্বাধীনতার ধারণাকে জাগ্রত করেছিল। যেখানে বলা হয় সম্পত্তির মালিক হলেই ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা পাওয়া যায় না বরং তা আসে নিজের অন্তর থেকে এবং নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার সক্ষমতা থেকে। দাসপ্রথা বিলোপপন্থীরা মনে

করত যে, আমেরিকার সমাজে দাসপ্রথা এত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে এর অবসানের জন্যে উত্তর দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের মানসিক ধ্যানধারনার পরিবর্তন খুবই জরুরী। তারা বারবার বলত ব্যাক্তিগত স্বাধীনতার চূড়ান্ত অধিকারের মধ্যেই প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়া যায়।

দাসপ্রথা বিলোপপন্থীদের 'Higher Law' এর আহ্বান :

বিলোপপন্থীরা দাস প্রথার অবসানের জন্য ক্রমশ সরব হচ্ছিল। দাসপ্রথার সাথে দাসমালিকরাও আমেরিকায় নিন্দিত হচ্ছিল। এমনই পরিস্থিতিতে দাসপ্রথা বিলোপপন্থী সমিতির সদস্যরা আমেরিকা স্বাধীনতা উদযাপন দিবস (৪জুলাই) এর অনুধাবনে মিলিত হয়েছিল এবং সেখানেই তারা আমেরিকার বিধিবদ্ধ আইন (Statute) কে মৃত্যু এবং নরকের সাথে সমঝোতা (Agreement with Death and Hell) বলে উল্লেখ করে তা বর্জন করার কথা ঘোষনা করেছিল। বলাবাহুল্য বিলোপপন্থীরা 'Higher Law' এ বিশ্বাসী ছিল। যেখানে সংবিধানকে সামনে রেখে দাসপ্রথাকে সমর্থন করার বদলে দাসপ্রথার অবসানের নৈতিক প্রতিশ্রুতি দানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া তারা 'Fugitive Salve Act' মানতেও অস্বীকার করেছিল। এরফলে দাস মালিক কিংবা তাদের প্রতিনিধিরা পলাতক দাসদের বন্দী করতে গেলে বিলোপপন্থীদের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হত। এরইপ্রেক্ষিতে দক্ষিণীদের ধারণা হয়েছিল যে, উত্তরাঞ্চলের মানুষেরা যেখানে আশা করত দক্ষিণীরা সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলবে সেখানে তারা নিজেরা কিন্তু ইচ্ছামত আইন মানত বা মানত না। এর ফলে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রাজনীতি, দাসপ্রথার অবসান, আব্রাহাম লিঙ্কন ও আগ্রাসী ক্রুসেড :

আমমেরিকায় দাসপ্রথা বিলোপ আন্দোলনের ক্রমশ প্রসার ঘটেছিল এবং ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হুইগ দল ও নেটিভ আমেরিকান দল (Native American Party) একসাথে দাসপ্রথার বিরোধীতায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং গঠন করেছিল নতুন প্রজাতান্ত্রিক দল (Republican Party)। এই প্রজাতান্ত্রিক দলেরই প্রার্থী আব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln) চারবছর পর রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে কানসান নেব্রাঙ্কা আইন (Kansas-Nnebraska Act of 1854) কানসাস অঞ্চলের মানুষদের হাতেই ঐ অঞ্চল দাসপ্রথা বলবৎ থাকবে কিনা তা নির্ধারণের ও অধিকার দিয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে দাসপ্রথার সমর্থক ও দাসপ্রথা বিরোধী উভয় দলই কানসাস অঞ্চলে উপনীত হয়ে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধিতে তৎপর হয়েছিল এবং এর ফলে হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দাসপ্রথা সমর্থনকারী গোষ্ঠীগুলি লরেন্স শহর আক্রমণ করেছিল এবং এর প্রতিশোধ স্বরূপ জন ব্রাউন নামে এক দাস প্রথাবিলোপপন্থী আক্রমণ চালিয়ে ৫ জন দাসপ্রথার সমর্থককে

টিপ্পনী

হত্যা করেছিল। এরই প্রেক্ষিতে কানসাস অঞ্চল 'রক্তাক্ত কানসান' (Bleeding Kansas) নামে পরিচিত হয়েছিল।

টিপ্পনী

ড্রেডস্কট বনাম স্যান্তকোর্ড মামলা এবং উত্তরাঞ্চল দক্ষিণাঞ্চল বিভাজন :

দাসপ্রথাকে কেন্দ্র করে আমেরিকা উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে মতপার্থক্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টে ড্রেডস্কট বনাম স্যান্তফোর্ড (Dred Scott vs Sandford) মামলার রায় বিলোপপন্থীদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। এই মামলার বিচারে সুপ্রীম কোর্ট ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে মিসৌরি মীমাংসা (Missouri Compromise of 1820) কে অবৈধ ঘোষণা করেছিল, এবং বলা হয়েছিল আফইকান বংশোদ্ভূত কারোর নাগরিকত্ব স্বীকার করা হবে না। দক্ষিনাঅঞ্চলের রাজ্যগুলি দাসপ্রথার সমর্থনে নানা আইন প্রবর্তন করেছিল। এই আইনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল 'নিগ্রো নাগরিকত্ব' (Nigro Citizenship) নিষিদ্ধ করা আইন। এই আইনের মাধ্যমে দাস নয় এমন কৃষাঙ্গদের সাধারণ অধিকারগুলিকে সংকুচিত করা হয়েছিল। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলে ঠিক এর বিপরীতে ঘটনা ঘটেছিল। যেখানে রাজ্যগুলিতে বসবাসকারী কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছিল। যাইহোক, আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের রায় উত্তরাঞ্চলের মানুষদের হতাশ করেছিল।

১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আমেরিকায় দাসব্যবসা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে Clotilde' নামে এক জাহাজ ১১০-১৬০ জন দাসকে নিয়ে আলবামা (Albama) তে পৌছেছিল। বলাবাহুল্য এটাই ছিল শেষ জাহাজ যা দাসদের নিয়ে আমেরিকা বন্দরে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে, দাসপ্রথা বিলোপপন্থীরা নানবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করলেও আমেরিকায় দাস আমদানি কার্যকলাপকে রোধ করতে পারেনি।

২.৪.২. আব্রাহাম লিঙ্কন ও দাসপ্রথার অবসান :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
80

১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দৃঢ়ভাবে দাসপ্রথার বিরোধীতা করেছিলেন। বলাবাহুল্য, দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের কাছে দাসরা ছিল মানব সম্পত্তি (Human Property) স্বরূপ। তারা যেখানেই যেত সঙ্গে তাদের দাসদের নিয়ে যেত। আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার যেসব অঞ্চলে দাসপ্রথা বলবৎ ছিল সেইসব অঞ্চলে কোন হস্তক্ষেপ করেন নি, কিন্তু তিনি এই প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং যেকোন প্রকারে এই দাসপ্রথার প্রসার রোধ করতে

চেয়েছিলেন। তাঁর এই ধরনের পদক্ষেপের প্রেক্ষিতেই দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি সংঘ (Union) ত্যাগ করতে চেয়েছিল। যাইহোক, পরবর্তীকালে আব্রাহাম লিঙ্কন দাসপ্রথার উচ্ছেদ ঘোষণা (Emanicipation Proclamation) করেছিলেন। এর মাধ্যমে গৃহযুদ্ধ (Civill War) চলাকালীন আমেরিকার যেসব অঞ্চলে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল সেই সব অঞ্চলের দাসদের মুক্ত করা হয়েছিল।

আব্রাহাম লিঙ্কনের দাসপ্রথা উচ্ছেদের ঘোষণা :

টিপ্পনী

আমেরিকান ইউনিয়ন (American union) ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে অ্যান্টিয়েটাম এর যুদ্ধ (Battle of Antitam) এ জয়লাভ করেছিল এবং এরপর লিঙ্কন সারাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছিলেন। এই সময় ঘোষণা করা হয়েছিল যে, দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি ইউনিয়নে যোগ দিতে অসম্মত হলে সেখানকার দাসেরা স্বাধীন হিসাবে বিবেচিত হবে। এরপরই ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন দাসপ্রথা উচ্ছেদ ঘোষণা করেছিলেন।

লিঙ্কনের দাসপ্রথা উচ্ছেদ ঘোষণার কার্যকারীতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন এই ঘোষণা আমেরিকায় দাসপ্রথার সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়েছিল। আবার কারও মতে এই ঘোষণা ছিল বস্তুত রাষ্ট্রপতি সুলভ ডিক্রি (Presidential Decree) যা কার্যত কাউকেই স্বাধীনতা দেয় নি। যদিও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দুটি মতেই ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আসলে এই ঘোষণাতে বলা হয়েছিল যে, যেসব রাজ্য সংঘ বা ইউনিয়ন ত্যাগ করবে সেখানে দাসপ্রথার অবসান ঘটবে। সাধারণ মানুষের কাছে এই ঘোষণা পৌছাবার পরই দেখা যায় বিদ্রোহী রাজ্যগুলি থেকে দাসদের দলে দলে প্রস্থান। কিন্তু এই ঘোষণা মারফৎ যে রাজ্যগুলি তখনও ইউনিয়নের প্রতি অনুগত ছিল কিংবা যেগুলি পরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেগুলিতে দাস প্রথার অবসান ঘটানো হয় নি। এই ঘোষণায় কৃষ্ণাঙ্গদের যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনা হিসাবে বিদ্রোহী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধকরার কথাবলা হয়েছিল। যদিও লিঙ্কন পূর্বে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীতে কৃষ্ণাঙ্গদের যোগদানে বিরোধী ছিলেন।

উত্তরাঞ্চলের সমর্থনের উপরেই দাসপ্রথা উচ্ছেদ ঘোষণার সাফল্য নির্ভর করেছিল। বলাবাহুল্য, এই ঘোষণার কিছু মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও কিছু দাস তাদের স্বাধীনতার ব্যাপারে অবহিত ছিল না। তবে এতদসত্ত্বেও এই ঘোষণা সাধারণভাবে গোটা দেশে এবং বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে মনুষ্যোচিত বন্ধণ কর ধারণার উপর একটা প্রভাব ফেলেছিল। ইহা যুদ্ধের সময় মানুষের চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন এনেছিল এবং আমেরিকার দাসপ্রথার সংরক্ষণের বদলে তার অবসান ঘটানোর মানসিকতা তৈরি করেছিল। এইভাবে আমেরিকায় দাসপ্রথা চিরতরে উচ্ছেদের পটভূমি তৈরি হয়েছিল।

টিপ্পনী

তেরোতম সংশোধন :

দাসপররথা উচ্ছেদে ঘোষণার দুই বছর পর এবং গৃহযুদ্ধের অবসানের তিনমাস আগে ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ৩১ জানুয়ারী আমেরিকান কংগ্রেসে তাৎপর্যপূর্ণ ১৩ তম সংশোধনী আইন পাশ করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ২৫০ বছরের পুরনো দাসপ্রথার অবসান ঘটানো হয়েছিল।

অগ্রগতি পরিমাপ কর :

৮. ট্রাস আটল্যান্টিক দাস ব্যবসা বলতে কি বোঝ ?

৯. আমেরিকার কোন রাজ্যে প্রথম দাসপ্রথার অবসান ঘটেছিল ? কবে এই দাসপ্রথার অবসান ঘটেছিল ?

১০. ডেভিড ওয়াকার কে ছিলেন ? আমেরিকায় দাসপ্রথা উচ্ছেদে তিনি কি ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১১. দাসপ্রথার অবসানের জন্য দাসপ্রথা বিরোধী গোষ্ঠীগুলি কি কৌশল অবলম্বন করেছিল ?

২.৫.আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ও আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা :

আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদের কাছে লিঙ্কনের এই জয় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থের পরিপন্থী হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে দক্ষিণাঞ্চলের এক শক্তিশালী দল ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পক্ষপাতিত্ব করেছিল। তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আব্রাহাম লিঙ্কন পরিচালিত সরকার দাসপ্রথা অবসানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বলাবাহুল্য ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচন আমেরিকায় শক্তিসাম্যে পরিবর্তন এনেছিল এবং দাসমালিকরা আশঙ্কা করেছিল যে দক্ষিণে প্রজাতান্ত্রিক দলের সম্প্রসারন তাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করবে। তাই এই ধরণের ভাগ্য বিপর্যয়কে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে সুদূর দক্ষিণের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ আমেরিকার ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

আব্রাহাম লিঙ্কন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পরই দক্ষিণ ক্যারলিনা থেকে টেকসাস পর্যন্ত বিস্তৃত সাতটি রাজ্য (দক্ষিণ ক্যারলিনা, আলবামা, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, লুসিয়ানা, মিসিসিপি, ও টেকসাস) ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই রাজ্যগুলি তাদের বহুসংখ্যক দাসদের নিয়ে সুদূর দক্ষিণে 'কার্পাসতুলা অঞ্চল' (Cotton Territory) গঠন করেছিল। বলাবাহুল্য সর্বাধিক দাসের বাস দক্ষিণ ক্যারোলিনা প্রথম আমেদরিকান ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ২০ ডিসেম্বর আইনসভা ইউনিয়ন ত্যাগ করার পক্ষে ভোট দিয়েছিল। এখানে 'Declaration of

the Immediate Cause of Secession' এ ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মূল কারণ হিসাবে দাসপ্রথার কথা বলা হয়েছিল। এরপর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ১২ এপ্রিল বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সামটার দুর্গ আক্রমণ করলে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং এই সময় উত্তর ক্যারোলিনা, আরকানানসাস, টেনিসি (Tennessee) ও ভার্জিনিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

দক্ষিন রাষ্ট্রসংঘ (Sout Confederacy) :

দাসপ্রথা অব্যহত রাখা, এবং শ্বেতাঙ্গদের যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকার ও সংবিধানিক স্বাধীনতা রক্ষা প্রভৃতি রাজনৈতিক কারণ দেখিয়ে দক্ষিণের এগারোটি রাজ্য আমেরিকান ইউনিয়ন ত্যাগ করে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে 'Assocciated States of America' নামে নতুন রাষ্ট্রসংঘ গঠন করে। মিসিসিপির জোফারসন ডেভিস (Jafferson Davis) নতুন কনফেডারেশন বা রাষ্ট্রসংঘের প্রথম রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। এই রাষ্ট্রসংঘ আমেরিকান ইউনিয়নের সাথে শান্তিপূর্নভাবে এক পৃথক সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিল কিন্তু ইউনিয়ন এই বিচ্ছিন্ন করণ ও মেনে নেয়নি। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ১২ এপ্রিল সামটার দূর্গ আক্রমণের মধ্য দিয়ে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং পরবর্তী চারবছর তা অব্যাহত থাকে।

জেকারসন ডেভিস শুরুর দিকে তাঁর সরকার গঠন করেছিলেন আকলবামার মন্টগোমেরি (Montgomery) তে। রাষ্ট্রসংঘের বিধি অনুসারে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির কার্যমেয়াদকাল ছয়বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল কোনরকম পুনর্নিবাচনের প্রতিবিধান ছাড়াই। বৈদেশিক দাসবাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে রাষ্ট্রসংঘের অভ্যন্তরে দাসরাখার অধিকার বজায় ছিল। কংগ্রেসকে 'Shietding tax' আরোপ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ও ব্রিটেনের হাউস অব কমন্স (নিম্নকক্ষ) এর কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠন করা হয়েছিল, যেখানে ক্যাবিনেট সদস্যরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারতেন।

রাষ্ট্রপতি পদের শর্ত এবং রাষ্ট্রপতি পদের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা ছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও নতুন রাষ্ট্রসংঘের সংবিধানের যে মূল পার্থক্যগুলি ছিল তা হল -

রাষ্ট্রসঙ্ঘে যুক্ত রাষ্ট্রগুলি দাসপ্রথার সমর্থক রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। সেখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্টে প্রত্যেকটা রাজ্যকে আলাদাভাবে বিচার করা হত এবং দাসপ্রথার বিষয়টি রাজ্যভেদে আলোচনা করা হত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আধিকারিকদের অপসারণ করার ক্ষমতা বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার হাতে অর্পণ করা হয়েছিল।

House of Repreentatives বা প্রতিনিধি সভায় ক্যাবিনেট আধিকারিকরা

বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

রাষ্ট্রসংঘের গঠন :

ডেভিসের সরকার শুরুর দিকে প্রাথমিক সমস্যা কাটিয়ে নিজ অবস্থান সুদৃঢ় করেছিল। সামরিক শক্তি সংগঠনে রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়েছিল। তবে সংবিধান প্রণয়নের পর আমেরিকান ইউনিয়ন যেমন বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ভাগ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল ঠিক তেমনি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল নতুন রাষ্ট্রসংঘ। এই সমস্যা ডেভিস-কে ব্যস্ত রেখেছিল এবং একটা সময় জার্জিয়ার বাসিন্দা উপরাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার এইচ স্টিকেনস (Alexander H. Stephens) রাষ্ট্রসংঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পরিকল্পনা করেছিলেন।

রাষ্ট্রসংঘের সরকার আর্থিক দিক দিয়ে খুব বেশি সমৃদ্ধশালী ছিল না। দারিদ্র্যতা ছিল এই সরকারের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা। বলাবাহুল্য, যুক্তরাষ্ট্রীয় অবরোধ ক্রমশ দক্ষিণের রাজ্যগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যকে সংকুচিত করেছিল এবং ঋণলাভের প্রচেষ্টার ফলপ্রসূ হয়নি। রাজস্ব সচিব ক্রিস্টোফার জি. মেমিংগার (Christopher G. Memminger) অর্থনীতিকে সফল করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেভাবে সফল হতে পারেন নি। কংগ্রেস কৃষকদের ঋণ দিয়ে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা করেছিল। যদিও প্রাথমিক সাফল্যের পর এই পদক্ষেপও ব্যর্থ হয়েছিল।

আর্থিক সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করেছিল এবং কিছু অপ্রিয় আইন এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। রাজস্ব সচিব মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও তা ছিল স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। তবে রাষ্ট্রপতি ডেভিস ছিলেন এক দৃঢ়চেতা প্রশাসক। আব্রাহাম লিঙ্কন যেমন ল্যাজস ফেয়ার (Laissez Faire) আইন গ্রহনের ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছিলেন তেমনি তিনিও কেন্দ্রীকরণ নীতি অণুসরনে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। যদও তাঁর প্রচেষ্টা রাষ্ট্রসংঘকে গৃহযুদ্ধে সাফল্য এনে দিতে পারে নি।

রাষ্ট্রপতি ডেভিসের বিদেশনীতির লক্ষ্য ছিল ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের সমর্থন আদায়। বলাবাহুল্য ফ্রান্স রাষ্ট্রসংঘের জয় আশা করেছিল কিন্তু ব্রিটেন এর থেকে সরে এলে ফ্রান্সও তার সমর্থন প্রত্যাহার করেছিল। আসলে ইংল্যান্ডের জনসাধারণের একটা বড় অংশ রাষ্ট্রসংঘকে সমর্থন করলে সেখানকার সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী লিঙ্কনের মুক্ত ভাবাদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। যাইহোক, 'কার্পাস তুলাবলয়' (Cotton Belt) এর উপর ইউনিয়ন এর নিষেধাজ্ঞা রাষ্টসংঘকে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল এবং এরূপ পরিস্থিতিতে সংঘের রাষ্ট্রসচিব Judah P. Benjamin অন্যান্য তুলা উৎপাদক রাষ্ট্রগুলির কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়েছিলেন। যদিও যুদ্ধের জন্য কোন রাষ্ট্রই সাহায্য করতে পারে নি।

দাসপ্রথা ও অপরাপর কিছু বিষয়ে উত্তরাঞ্চলের সাথে মতপার্থক্য থেকেই

টিপ্পনী

রাষ্ট্রসংঘের উদ্ভব ঘটেছিল। এবং এটা শক্তিশালী সংঘ হিসাবে রাষ্ট্রসংঘকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে এগুলি ছাড়াও নানাবিধ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হত। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ গঠনের পর যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল তার মধ্য দিয়েই সংঘের দুর্বলতার দিকগুলি প্রকাশ পেয়েছিল। যাইহোক, রাষ্ট্রপতি ডেফোরসন ডেভিস ও তার দলের আক্রমনাত্মক রক্ষণশীল কৌশল গ্রহণ সত্ত্বেও গৃহযুদ্ধের শেষে দক্ষিণ রাষ্ট্রসংঘ ভেঙে পড়েছিল। বলাবাহুল্য, রাষ্ট্রসংঘের এই পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। বিস্ময়কর ব্যাপার হল যে রাষ্ট্রসংঘ চার বছর ধরে যুদ্ধ পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল।

টিপ্পনী

২.৫.১. রাষ্ট্রসংঘের পরাজয়ের কারণ :

নেতৃত্ব ও সরকার :

রাষ্ট্রসংঘের কর্ণধার জেফারসন ডেভিস ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে কেনটাকি (Kentucky) তে জন্মগ্রহণ করেছিলন। ঐতিহাসিকরা তাঁকে 'একাকী, অদম্য ও রসহীন (Aloot, Stubborn and Humorless) ব্যাক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যাইহোক ডেভিসের মধ্যে লিঙ্কনের মত রাজনৈতিক নমনীয়তা ও সাধারণ বোধের অভাব ছিল। এই অক্ষমতার ফলেই তিনি রাষ্ট্রসংঘের সঠিক নেতৃত্বদানে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

ডেভিস সাধারণ মানুষের কাছে যুদ্ধের যৌক্তিকতা সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেন নি। এর সাথে দলীয় ব্যবস্থার কাঠমোগত দুর্বলতা রাষ্ট্রসংঘের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। বলাবাহুল্য, আমেরিকান ইউনিয়ন যেখানে দলীয় ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করেছিল সেখানে রাষ্ট্রসংঘের কাছে ইহা ছিল জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। এরফলেই ডেভিস সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেন নি এবং তাদের যুদ্ধের যথার্থতা বোঝাতে অক্ষম হয়েছিলেন।

ডেভিসের অধীনে রাষ্টসংঘের পুরানো দক্ষিণের তুলনায় অনেক বেশি কেন্দ্রীমুখী ছিল। সরকার কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই সেনাবাহিনী গঠন, রেলপথের নির্মান ও কৃষি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের কার্পাস তুলা চাষের পরিবর্তে খাদ্যশষ্য চাষের আবেদন করা হয়েছিল। সরকারের কাছে এটা ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের পদক্ষেপ এবং সরকার ভেবেছিল এর ফলে গ্রেট ব্রিটেনের বস্ত্র কারখানাগুলো দক্ষিণের তুলার অভাবে বিপর্যস্ত হবে এবং এতে কার্যত গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে রাষ্ট্রসংঘকে সমর্থন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত ঘটনাই ঘটেছিল। গ্রেট ব্রিটেন গমের জন্য উত্তরের কাছে যতটা নির্ভরশীল ছিল ঠিক ততটাই তুলার জন্য দক্ষিণের কাছে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ১৮৫৯ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে যে তুলা উৎপাদন হয়েছিল তার একটা বড় অংশ ব্রিটেনে মজুত ছিল। তাই দক্ষিণ রাষ্ট্রসংঘের তুলাচাষ বন্ধের পদক্ষেপ ইংল্যান্ডের

বিরুদ্ধে যায়নি। বস্তুত 'তুলা কূটনীতি' (Cotton Diplomacy) কার্যকরী হয়নি।

ইউলিয়ন ও রাষ্ট্রসংঘের সুবিধা :

আমেরিকান ইউলিয়ন নিশ্চিতরূপে দক্ষিণের থেকে ভালো অবস্থায় ছিল। দক্ষিণে ৯ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ৫.৫ মিলিয়ন ছিল শ্বেতাঙ্গ (মুক্ত কৃষাঙ্গরা ছিল অবহেলিত) অন্যদিকে উত্তরে ২২ মিলিয়ন জনসংখ্যার বাস ছিল। কৌশলগত দিক দিয়ে উত্তর দক্ষিণের থেকে এগিয়ে ছিল। উত্তরাঞ্চল ছিল মুখ্যত শিল্প প্রধান অঞ্চল এবং দক্ষিণ রাষ্ট্রসংঘ এই দিক দিয়ে তার দুর্বলতা ইউরোপ বিশেষত গ্রেট ব্রিটেনের সাথে বাণিজ্যের মাধ্যমে কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তরাঞ্চল কঠোর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে দক্ষিণকে আশাহত করেছিল। এর উপর বিদ্রোহী দাসেরা দক্ষিণের বিপত্তি আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। আসলে অনেক বিদ্রোহী দাস দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলে পলায়ন করেছিল এবং সেখানে তারা হয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল নয় শ্রমিক হিসাবে কাজ শুরু করেছিল। এর ফলে রাষ্ট্রসংঘ দুই দিক দিয়ে আঘাত পেয়েছিল।

রাষ্ট্রসংঘের নাগরিকরা তাদের নেতৃবর্গ নীতিসমূহের ব্যাপক সমালোচনা করত। নের্তৃবর্গ যুদ্ধে যেকোন প্রকারে জয়লাভ করার জন্য নাগরিকদের উপর কিছু বিষয় জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল এবং নাগরিকরা তা স্বীকার করে নিয়েছিল। এপ্রসঙ্গে কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন যে, রাষ্ট্রসংঘের নেতৃবর্গের প্রতি নাগরিকদের উদাসীনতা তাদের রাষ্ট্রসংঘ থেকে দূরে সরিয়ে ইউনিয়নের প্রতি ক্রমশ অনুগত করে তুলেছিল। তবে সাম্প্রতিক গবেষনায় দেখা যাচ্ছে যে, যদিও দক্ষিণের নেতৃবর্গের নীতিগুলি জঘন্য ছিল তবুও দক্ষিণের নাগরিকরা এর বিরুদ্ধে বিকল্প হিসাবে উত্তরকে সমর্থন করেনি।

বলাবাহুল্য, রাষ্ট্রসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ছিল তার বিকাশ আয়তন, যা ৭৫০০০০ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল। ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন বেশিরভাগ দক্ষিণীরা তাদের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। তারা ভেবেছিল তাদের এলাকার বিশালত্ব ইউনিয়নের পক্ষে আক্রমণ, দখল ও জয় করাকে কঠিন করে তুলবে। উত্তরাঞ্চল আক্রমণ করবে আর তারা তা প্রতিহত করবে এবং এর ফলে উত্তরাঞ্চল প্রভুত ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তবে রাষ্ট্রসংঘ অশ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে কোনপ্রকার সাহায্য নেয়নি বরং রাষ্ট্রসংঘের সেনাবাহিনীতে উত্তরাঞ্চল অপেক্ষা অনেক বেশি শ্বেতাঙ্গ যোগদান করেছিল।

দুই অঞ্চলের মধ্যে যুদ্ধের লক্ষ্য ও অনুপ্রেরণার উৎস ভিন্ন ছিল। যেখানে দক্ষিণীরা তাদের দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধ করেছিল সেখানে উত্তরাঞ্চলের লক্ষ্য ছিল পুণৈর্ক্য সাধন। দক্ষিণীরা ভেবেছিল তাদের লক্ষ্য যুদ্ধকে আরও বলিষ্ঠ ও উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে

টিপ্পনী

জয়লাভে সাহায্য করবে। এছাড়া যুদ্ধের পূর্বে দক্ষিণ সামরিক সংগঠনের ব্যাপারে উত্তরের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। সামরিক অধিকর্তরা ভেবেছিলেন কারখানার শ্রমিকদের তুলনায় কৃষকরা ভালো সৈনিক হবে।

তবে যুদ্ধে দক্ষিণীরা প্রাথমিক সাফল্য লাভ করলেও বাস্তবে দক্ষিণীরা যা ভেবেছিল তা সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত হয়নি। ইউনিয়ন এর বাহিনীর সাফল্য পেতে শুরু করেছিল ভার্জিনিয়ার সীমান্তে এবং ধীরে ধীরে তারা গোটা রাজ্যটিকে দখল করে নিয়েছিল। তারা মিসিসিপি নদীর উপরও দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করেছিল। এছাড়া তারা রাষ্ট্রসংঘের উপকূল রেখা বরাবর অবরোধ জারি করেছিল এবং ধীরে ধীরে রাষ্ট্র সংঘের আভ্যন্তরীণ এলাকায় প্রবেশ করছিল। ট্রান্স-আপ্পেলেশিয় (trans-Appalachian) অঞ্চলেও ইউনিয়ন বাহিনী সাফল্য পেয়েছিল। যুদ্ধের সময় ওহিও নদী (Ohio River)র নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা ইউনিয়নের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে রাষ্ট্রসংঘ তাদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য দক্ষিণাঞ্চল তাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করেছিল। যাইহোক, এই অঞ্চলের উপর উত্তরের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন কৌশলগত দিক দিয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

রাষ্ট্রসংঘের সুযোগের হাতছাড়া :

ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রসংঘ যুদ্ধ জয়ের বেশ কিছু সুযোগ হাতছাড়া করেছিল এবং কিছু কিছু বিষয় তাদের ভাগ্যের প্রতিকূলে নিয়েছিল। বলাবাহুল্য রাষ্ট্রসংঘ প্রথম মানাসাস (Manassas) বিজয়ের পর আক্রমণাত্মক কৌশল গ্রহণ করতে পারত। রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে ব্রিটেনের যুদ্ধে যোগদান না করাও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ছিল।

১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করেছিল এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আরও সফলতা এনে দিতে পারত। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দেও সুযোগ তৈরি হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে। বলাবাহুল্য, লিঙ্কনের রাষ্ট্রপতি পদে পুনর্নির্বাচন তাঁর সামরিক সাফল্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। যদি রাষ্ট্রপতি ডেভিস জেনারেল ক্লেব্রুণ (Cleburne) এর প্রস্তাব মেনে নিয়ে দাসদের সেনাবাহিনীতে যুক্ত করে লোকবল বৃদ্ধি করতেন তাহলে দক্ষিণ হয়ত সামরিক সাফল্য অর্জন করত।

নারী এবং রাষ্ট্রসংঘ :

এই যুদ্ধ দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ নারীদের উপর মাত্রাহীন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল। গৃহকর্তা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় আকস্মিকভাবে নারীদের উপর গৃহস্থলীর সমস্ত কাজের ভার অর্পিত হয়েছিল এবং তারা বাড়ির কর্তার ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়েছিল। গৃহস্থলীর কাজের পাশাপাশি তাদের খামার, গাছপালা, ব্যবসায়ীক কাজ এবং দাসদের পরিচালনার কাজও দেখাশোনা করতে হত। উত্তরাঞ্চলের নারীরাও যুদ্ধে

টিপ্পনী

সৈনিকদের সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছিল এবং ঘরের বাইরে তা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কর্মেও লিপ্ত হয়েছিল। তারা কারখানা ও অনান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মে লিপ্ত হয়েছিল।

দক্ষিনের নারীরা তাদের লক্ষ্যে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু যুদ্ধের গতি রাষ্ট্রসংঘের বিরুদ্ধে প্রবাহিত থাকলে পরিস্থিতি ক্রমশ অবণতি ঘটতে থাকে এবং নিহতের সংঘ্যাত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে দক্ষিণের নারীরা উপলব্ধী করতে শুরু করেছিল যে স্বাধীনতার জন্য তাদের চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। ফলতঃ যুদ্ধের প্রতি নারীদের মনে ক্রমশ অসন্তোষ তৈরি হতে শুরু করেছিল, যা তাদের পরিজনদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিপত্রের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে নাগরিকদের মধ্যে এক যুদ্ধ অনিহা তৈরি হয়েছিল এবং অনেকে সেনাবহিনীও ত্যাগ করেছিল।

টিপ্পনী

রাষ্ট্রসংঘের সামরিক কৌশল :

উত্তরের ইউনিয়ন এবং দক্ষিণের রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে দুই পক্ষের সমর নীতিও আলাদা ছিল। রাষ্ট্রপতি ডেভিস যে সমরনীতি গ্রহণ করেছিলেন তাকে ঐতিহাসিক 'আক্রমণাত্মক রক্ষনাত্মক (Offensive Defensive') কৌশল বলে উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ ছিল যে, যতবেশি সম্ভব বিস্তৃত অঞ্চলে সামরিক বাহিনীকে ছড়িয়ে দেওয়া যাতে তারা আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে এবং একমাত্র পরিস্থিতি সহায়ক হলেই আক্রমণের নীতি গ্রহণ করে। তবে ডেভিসের বিশ্বস্ত সামরিক পরামর্শদাতা এই নীতির বিরোধীতা করেছিলেন। জেনারেল লী (Lee) ডেভিসের কৌশলকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি সর্বদা 'আক্রমণই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রক্ষণ ('Offense is the best defense) - এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন যদিও তাঁর এই আক্রমণ নীতি সঠিক-ভাবে কার্যকরী হয় নি। সম্ভবত 'নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসন (Controlled agrarian') নীতি কার্যক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো বিকল্প ছিল। এরফলে ইউনিয়নের যুদ্ধের পরিব্যাপ্তী ঘটত এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ রসদের প্রয়োজন হত। ঐতিহাসিক Grade Mcwhiney ও Perry Jamieson মনে করেন যে, লীর আক্রমণাত্মক মনোভাবের মূল্য দিতে হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষিণী সৈন্যদের। বাস্তবত যুদ্ধের প্রথম তিনবছরে দক্ষিণীদেরই প্রাণ হারাতে হয়েছিল। লী অনেকক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ হওয়ায় তাঁর বিচারক্ষমতায় ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছিল। এছাড়া ইউনিয়নের বাহিনী রাইফেলের সাথে নিপুনভাবে রণসজ্জিত হয়েছিল যেখানে দক্ষিণের সৈনিকরা ব্যবহার করেছিল গাদাবন্দুক।

অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক নীতি যে ফলপ্রদ হত না তা সহজেই পরিলক্ষিত হয়েছিল জেনারেল জো জনস্টন (Joe Johnston) এর অতিরক্ষণাত্মক নীতির মধ্যে। বলাবাহুল্য, জেনারেল জনস্টন ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর ভার্জিনিয়া ও ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে জর্জিয়ার যুদ্ধে বেশি প্রতিরোধ না করেই বিশাল এলাকা সমর্পণ করেছিল ইউনিয়নের

হাতে। রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধ জয়ে সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি ছিল ধারাবাহিক যুদ্ধে যতটা সম্ভব ব্যাক্তিগত জয় নিশ্চিত করা। এতে যুদ্ধক্ষেত্র দ্বৈত প্রভাব পড়ত ; একদিকে ইউনিয়ন এর মনোবল ভেঙে পড়ত এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রসংঘের সেনাবাহিনীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেত। এছাড়া এর ফলে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মত দেশের কাছে রাষ্ট্রসংঘের মর্যাদা বৃদ্ধি পেত এবং রাষ্ট্রসংঘ হয়ত এই দুই দেশের সমর্থন আদায়ের সক্ষম হতে পারত।

টিপ্পনী

দক্ষিনের সামরিক কৌশলের অনাণ্য গুরুত্বর্পূ ত্রুটিগুলির মধ্যে অণ্যতম ছিল অদক্ষ সেনাপতি নির্বাচন। পশ্চিম দিকের সেনাপতি অ্যালবার্ট জনস্টন তাঁর টেনেসি ও কামবারল্যান্ড (Cumberland) নদীর প্রতিরক্ষা অঞ্চলে ইউনিয়ন বাহিনীর প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। জেনারেল ব্রাগ (General Bragg) নিজের সেনাবাহিনীর সাথেই কলহে লিপ্ত হয়েছিলেন। General Beauregard এমন এক পরিকল্পনা গ্রহণ করছিলেন যা না ছিল বাস্তবসম্মত না কার্যকরী। জেনারেল জো জনস্টন ছিলেন অতিরক্ষনাত্মক এবং সহজেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদ পসরণকারী। জেনারেল হুড (General Hood) ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে কিছু যুদ্ধের ব্যার্থতার জন্য দায়ি ছিলেন।

ইউনিয়নের বাহিনীর মধ্যে বেশ কিছু ত্রুটি ছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে ইউনিয়ন দক্ষিণকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাষ্ট্রসংঘ সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। ইউনিয়ন ১৮৬৪ - ৬৫ খ্রিষ্টাব্দে শেষ যুদ্ধ জিতছিল বিশাল সেনাবাহিনীর সহায়তায়। এই সেনাবাহিনী শত্রুপক্ষ অপেক্ষা অনেক উন্নত রনসজ্জায় সজ্জিত ছিল। ডেভিস ও লী র পরিকল্পনা মাফিক রাষ্ট্রসংঘ অনেক যুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল। তারা কিছুমাত্র ইউনিয়ন বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিল যদিও শেষপর্যন্ত তারা তাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল। উল্লেখ্য; যদি রাষ্ট্রসংঘ তার ক্ষমতা ও দুর্বলতার তুলনামূলক সঠিক পরিমাপ করে যুদ্ধের জন্য সঙ্গতিপূর্ণ নীতি গ্রহণ করত তাহলে হয়ত যুদ্ধের ফল অন্য হত এবং যা নিশ্চিতভাবে ইতিহাসের গতিকে বদলে দিত।

আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ :

যুদ্ধের অগ্রগতির সাথে সাথে রাষ্ট্রসংঘে সন্দেহ ও অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল এবং সামাজিক পরিবর্তনও ঘটতে শুরু করেছিল, যা সার্বিকভবে সংঘকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। যুদ্ধের শুরুতে দক্ষিণীরা আত্মবিশ্বাসী ছিল এবং রাষ্ট্রসংঘের লক্ষ্য পূরণের স্বার্থে তারা একত্রিত হয়েছিল। দক্ষিণের সেনাবাহিনী স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে সাধারণ মানুষের মধ্যে যুদ্ধের প্রতি অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং এব্যাপারে তাদের ক্রমশ মোহমুক্তি ঘটেছিল।বলাবাহুল্য দক্ষিণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ক্রমশ দলাদলি ও বিচ্ছিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

টিপ্পনী

রাষ্ট্রসংঘের ইচ্ছাশক্তি :

ঐতিহাসিক মার্টন কুলটার (Merton Coulter) উল্লেখ করেছেন যে, যুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের নাগরিকরা যুদ্ধে সফল হওয়ার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করে নি, আর এটাই ছিল রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রকৃত কারণ। বস্তুত ঐতিহাসিকরা সাধারণভাবে মনে করেন যে, রাষ্ট্রসংঘের নাগরিকরা যদি নিজেদের ইচ্ছাশক্তি ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়ে দৃঢ়ভাবে প্রচেষ্টা করত তাহলে হয়ত রাষ্ট্রসংঘ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারত। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে মানাসাস যুদ্ধের মত দক্ষিণীদের প্রাথমিক সাফল্য বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। সেনাবাহনীরা দ্রুত আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছিল এবং তাদের মধ্যে অসন্তোষ ও যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগের মানসিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছিলন। এরফলে রাষ্ট্রসংঘ যেসব স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তা ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল এবং সংগ্রাম কার্যত অর্থহীন হয়ে দাড়িয়েছিল। তবে কিছু সময়ের জন্য তুলেও দক্ষিণীরা ইউনিয়নকে কঠিন প্রতিরোধের মুখে ফেলেছিল এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি ব্যাতীত এটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এত্যসত্ত্বেও রাষ্ট্রসংঘ পরাজিত ও ইউনিয়ন যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল।

উপসংহার :

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তির কিছু বছর পর যখন জেনারেল পিকেট (General Pickett) কে জিজ্ঞাসা করা হয় জেটিসবার্গ (Gettysburg) এর যুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘ কেন ব্যার্থ হল , তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'I believe the yomeews had Nomewhat to do with it'. তাঁর এই উক্তির সার কথা ছিল যে, ইউনিয়ন রাষ্ট্রসংঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপকভাবে জয়লাভ করেছিল এবং রাষ্ট্রসংঘ স্বেচ্ছায় পরাজিত হয় নি।

যুদ্ধে গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা সর্বদা ইউনিয়নের ই বেশি ছিল। যুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘকে সুবিধা অর্জন করতে গেলে তার সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল উত্তরের ইচ্ছাশক্তিকে দমন করা। এর জন্য একটা দীর্ঘকালীন যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল এবং তা হয়েও ছিল কিন্তু এই যুদ্ধে দক্ষিণের তুলনায় উত্তরের সাফল্য ছিল অধিক। ঐতিহাসিক দলিল ও উত্তরের সৈনিকদের চিঠিপত্রের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, যুদ্ধের ব্যাপারে উত্তর অনেকবেশি সচেতন এবং লক্ষ্য অভিসারী ছিল। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে লিঙ্কন যখন দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তখন তিনি ৮০ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন উত্তরের সৈনিকদের কাছ থেকে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, লিঙ্কনের মতাদর্শের প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। ১৮৬৫ খ্রিঃএ ইউনিয়ন বলপূর্বক রাষ্ট্রসংঘকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছিল। দক্ষিণ যেভাবে যুদ্ধ করেছিল তাতে জয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাদের রণকৌশল কোনভাবেই কার্যকর হয় নি। রাষ্ট্রসংঘকে এক উন্নত সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তাই সাহসীকতার

সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত তারা ব্যার্থ হয়েছিল।

যাইহোক আমেরিকার গৃহযুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের পরাজয়ের জন্যে যে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়গুলি দায়ী ছিল, সেগুলির কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। যুদ্ধ শেষে দেখা যায় যে, ভার্জিনিয়া বাসীদের একটা বড় অংশ দাস প্রথার অবসানকে মেনে নিতে অসম্মত হয়েছিল। তবে ভার্জিনিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা যুদ্ধ শেষে যেসব বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তাতে আনন্দিত হয়েছিলেন।

টিপ্পনী

অগ্রগতি পরিমাপ কর :

১২. আমেরিকার গৃহযুদ্ধ কবে শুরু হয়েছিল ?

১৩. জেকারসন ডেভিস কে ছিলেন ? তিনি রাষ্ট্রসংঘকে পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছিলেন কেন।

২.৬. চীনের আফিম যুদ্ধ :

সপ্তম শতকে চীনে আফিম গাছ আমদানি করেছিল তুর্কী ও আরব বণিকেরা। প্রথমদিকে চীনারা মুখ্যত ওষুধ হিসাবে আফিমের ব্যবহার করত। কিন্তু এর কয়েক শতাব্দী পরেই চীনের ধনী পরিবারের মানুষেরা আফিমকে নেশার সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। তবে এই আফিমের নেশা ধীরে ধীরে চীনের স্বচ্ছল পরিবারের মানুষদের গ্রাস করতে শুরু করলে তা চীনা সরকারের উদ্বিগ্নের কারণ হয়ে ওঠে। মানুষের শরীর ও মনের উপর আফিমের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা জানতে পেরে চীনা সম্রাট Youn Zheng (১৭২২ - ১৭৩৫) ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে এক রাজকীয় আদেশনামা জারি করে আফিম বিক্রি ও সেবনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ছিলেন। শুধুমাত্র ওষুধ তৈরির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ আফিমের ব্যবহার মঞ্জুর করা হয়েছিল। এছাড়া এই আদেশনামায় আফিমের বিক্রি ও মজুতকরণকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। যদিও এই আদেশনামায় আফিমের উৎপাদন ও আফিমের আমদানির জন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয় নি। ইউরোপীয় বণিকেরা এই সুবিধার সদ্ব্যবহার করেছিল। ইউরোপীয় বণিকেরা চীনে সরাসরি আফিম সেবনের পরিবর্তে তামাকের সাথে আফিম মিশিয়ে তা সেবনের রীতি চালু করেছিল। এরফলে আফিম সেবনে নেশাগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি আফিমের মূল্য ও হ্রাস পেয়েছিল। প্রথমদিকে আফিমের ব্যবসা লাভজনক ছিল না, কারণ আফিমের উচ্চমূল্যের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে এর চাহিদা ছিল কম। কিন্তু আফিমের মূল্য হ্রাস পেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আফিমের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। বলাবাহুল্য, আফিম ছিল একমাত্র উচ্চমূল্যের ব্যবসায়ীক সামগ্রী যা চীনকে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল।

টিপ্পনী

১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে চিং রাজদরবার যখন প্রথম আফিমের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তখন চীনে বাৎসরিক আফিম আমদানির পরিমাণ ছিল ২০০ চেষ্ট (পেটী)। ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে বাৎসরিক আমদানি বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছিল ৪০০০ চেস্টেরও বেশি। সম্রাট Jia Qing (১৭৯৬ - ১৮২০) ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আফিম চাষ এবং ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে আফিম আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তবে এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও চীনে দুর্নীতিপরায়ণ স্থানীয় সরকারী আধিকারিক ও লোভী চীনা ব্যবসায়ীদের সহায়তায় আফিম ব্যবসা অব্যহত ছিল। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ১৮০০ থেকে ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে চীনে আফিমের গড় আমদানি ছিল ৪০১৬ পেটী, ১৮১১ থেকে ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এর গড় আমদানির পরিমাণ ছিল ৪৪৯৪ পেটী, ১৮২১ থেকে ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইহা বৃদ্ধি পেবে দাড়িয়েছিল ৯৭০৮ পেটী এবং সর্বপরি ১৮২১ থেকে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে বাৎসরিক আফিম আমদানির পরিমান ছিল ৪০০০০ পেটী। প্রসঙ্গত, ইউরোপের অনাণ্য দেশগুলি আফিম ব্যবসায় যুক্ত থাকলেও চীনে অবৈধ আফিম ব্যবসায় একচেটিয়া কতৃত্ব স্থাপন করেছিল ব্রিটিশ বণিকেরা।

ইঙ্গ-চীন বাণিজ্যিক সম্পর্ক :

ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইঙ্গ চীন বাণিজ্যক সম্পর্ক চীনের অনুকূলেই ছিল। ব্রিটিশ বণিকেরা চীন থেকে মূলত চীনা সিল্ক ও চা কিনত। বস্তুত অষ্টাদশ শতকে ব্রিটেনে চা এর কদর অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল, ফলতঃ চীন থেকে চা আমদানির উপর ব্রিটেন বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এর বিনিময়ে ব্রিটেন চীনের বাজারে তাদের শিল্পজাত ও অনাণ্য পণ্যকে বেশিমাত্রায় বিক্রি করতে পারত না। আসলে চীনের মত ভৌগলিক দিক দিয়ে বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হত। এই উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে যথেষ্ট ছিল। তাই চীনারা বিদেশী বণিকদের কাছে পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী ছিল না। এর ফলশ্রুতিতে ইংল্যান্ড থেকে প্রচুর রূপা চীনে চলে এসেছিল। ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল যে এই একপেশে বাণিজ্যে দেশের রৌপ্যভান্ডারের ক্রমনিষ্কাশন ঘটেছে এবং এতে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে ব্রিটিশরা চীনের সাথে বাণিজ্যিক ভারসাম্য গড়ে তুলতে এবং এই বাণিজ্যিকে নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য ভয়ঙ্কর নেশাজাত দ্রব্য আফিমকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার পন্থা গ্রহণ করেছিল।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডীয়া কোম্পানীর আধিপত্য :

ব্রিটিশরা চীনে আফিম ব্যবসায় অনান্য ইউরোপীয়দের তুলনায় অনেক বেশি সফল হয়েছিল। এর পিছনে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কোম্পানী খুব সহজেই ভারতবর্ষ থেকে আফিম আমদানি করে চীনের বাজারে চালান

দিত। ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানী ভারতবর্ষে আফিম উৎপাদনে একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল। কোম্পানী নিজ শর্তাবলীতে ভারতীয় কৃষকদের আফিম চাষে বাধ্য করত এবং তাদের কাছ থেকে আফিম সংগ্রহ করত। কোম্পানী চীনে আফিমের চোরাচালান করত প্রাইভেট বণিকদের মাধ্যমে, যারা কোম্পানীর লাইসেন্স নিয়ে কাজ করত। বলাবাহুল্য, যেহেতু লাইসেন্সধারী বণিকরা আইনত কোম্পানীর সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল না তাই আইনত কোম্পানীর আফিমে অবৈধ ব্যবসায়ে কোনভাবে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল না। এক্ষেত্রে কোম্পানীর যুক্তি ছিল যে যেকোন স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী অথবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কোম্পানীর কাছ থেকে আফিম বা যেকোন দ্রব্য ক্রয় করতে পারে এবং তারা সেই দ্রব্য কোথায় বা কাকে বিক্রি করছে তা নিয়ে কোম্পানীর কোন দায়বদ্ধতা থাকবে না। কারণ, কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে চীনে আফিম বিক্রি করছে না। এইভাবে কোম্পানী সুচতুর ভাবে একদিকে চীনে অবৈধ আফিম বিক্রি করছিল এবং অন্যদিকে চীনের সাথে সমস্ত ধরণের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল।

কোম্পানী লাভের কথা বিবেচনা করেই সীমিত পরিমাণে আফিম চীনে চোরাচালন করত। প্রথমত, আফিম ব্যবসায় কোম্পানীর লাভের মাত্রা ছিল বেশ সন্তোষজনক। দ্বিতীয়ত, সীমিত যোগান এবং ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা আফিমের উচ্চমূল্য বজায় রাখতে কার্যকর ছিল। তৃতীয়ত, আফিমের সীমিত চালান চীনা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করেনি। কিন্তু ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ কোম্পানী ভারতবর্ষে আফিম উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার হারাতে শুরু করেছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বাণিজ্যগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগীতার ফলে একদিকে আফিমের মূল্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল অন্যদিকে চীনে আফিমের ব্যবহারও ক্রমশ বাড়ছিল। এরপর ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানী চীনে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার হারালে নতুন নতুন বণিক গোষ্ঠী চীনের বাজারে প্রবেশ করেছিল। এছাড়া একইসাথে অনাণ্য ইউরোপীয় বণিকদের প্রতিযোগিতা থেকে অপসৃত করতে এবং অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় ব্রিটিশ বণিকরা আফিমের দাম আরও হ্রাস করেছিল। এরফলে সাধ্যমূল্যে আফিম পাওয়া যেতে শুরু করলে তার চাহিদা বিপুল পরিমাণ বেড়ে যায় এবং চীনা সমাজের একটা বড় অংশ এমনকি দরিদ্র মানুষেরাও আফিমের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষনের প্রেক্ষিতে আফিম চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এরফলে চীনে আফিমের চোরাচালান অব্যহত থাকে। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে চীনে অবৈধ আফিম ব্যবসা মাত্রারিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। আফিমের নেশা সক্রমনের মত চীনে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছিল। স্বাস্থ্যের পক্ষে এই নেশা ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং প্রাণনাশক। আফিমের নেশা শুধুমাত্র চীনের মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল না তা একই সাথে চীনের আর্থিক সংকট ডেকে এনেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে চীনের কাছে দুটি পথ খোলা ছিল।

টিপ্পনী

হয় আফিম ব্যবসাকে বৈধ ঘোষণা করে রাজস্ব আয় করা নয় আফিমের চোরাচালান বন্ধ করে জাতীয় জীবন রক্ষা করা।

২.৬.১. প্রথম আফিম যুদ্ধ :

টিপ্পনী

আফিমের নেশা চীনাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়েছিলন এবং একইসাথে চীনা অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। এর ফলে চীনা সরকার উদ্বীগ্ন হয়ে পড়েছিল এবং অবৈধ আফিম ব্যবসাকে বন্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিল।

প্রত্যক্ষ কারণ : আফিম বাজেয়াপ্তকরণ

চীনে মাঞ্চু সরকার বেআইনি আফিম ব্যবসা উচ্ছেদ করার জন্য ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে লিন-যে-সু (Lin Zxesu) নামে এক ব্যাক্তিকে ক্যান্টন (Canton) এর কমিশনার বা রাজপ্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করেছিল। লিন-যে-সু ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ কনফুসীয় পন্ডিত। তিনি ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আফিমের চোরাচালান বন্ধের উদ্দেশ্য ক্যান্টনে উপনীত হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, রাজাজ্ঞা অনুযায়ী আফিম সমস্যার সমাধানের জন্য লিন তিনটি পন্থা গ্রহন করেছিলেন। প্রথমত তিনি আফিম সেবনকারী নেশাগ্রস্তদের আফিম সেবন ত্যাগ করার কথা বলেছিলেন এবং চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার নিশ্চয়তা ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি চীনে আফিম ব্যবসায়ীদের হয় আত্মসমর্পন এবং রাজক্ষমা লাভ নয় গ্রেপ্তারের সম্মুখীন হওয়ার বিকল্প দিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, তিনি বিদেশী বণিকদের সত্বর আফিমের চোরাচালান বন্ধ করা এবং তিনদিনের মধ্যে তাদের মজুত করা আফিম তাঁর কাছে জমা দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি এই মর্মে তাদের এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বলেছিলেন যে, তারা ভবিষ্যতে আর আফিমের চোরাচালানের কাজে যুক্ত থাকবে না। যদি তারা এই চুক্তিপত্র লঙ্ঘন করে তাহলে শাস্তি স্বরূপ তাদের মৃত্যুদন্ড হবে। যাইহোক লিনের প্রথম দুটি কার্যপন্থা অত্যন্ত সফল হয়েছিল। অনেক হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। এবং সেখানে অসংখ্য নেশাগ্রস্ত মানুষ চিকিৎসালাভের সুযোগ পেয়েছিল। এছাড়া অনেক স্থানীয় আফিম ব্যবসায়ী আত্মসমর্পন করেছিল। অনেকে আত্মগোপন করেছিল আবার অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং সর্বপরি আফিম চক্র ভেঙে গিয়েছিল। বলাবাহুল্য লিনের এই পদক্ষেপ এতটাই কার্যকর হয়েছিলন যে বিদেশী বণিকেরা অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে আফিম বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকললেও তারা কোন স্থানীয় আফিম ব্যবসায়ী খুঁজে পায় নি।

তবে লিনের তৃতীয় পদক্ষেপ সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। আসলে লিনের নির্দেশে কিছু বিদেশী বণিক সহমত হলেও ব্রিটিশ বণিকরা তাদের গচ্ছিত আফিম লিনের হাতে সমর্পন করতে অস্বীকার করেছিল। এরপ্রেক্ষিতে লিন বাধ্য হয়ে বিদেশীদের ক্যান্টনে অবরোধ করে রেখেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে

একমত্র গচ্ছিত আফিম সমর্পণ করলেই অবরোধ তুলে নেওয়া হবে এবং ব্যবসা - বাণিজ্য পুনরায় চালু করা হবে। যাইহোক এই অবরোধ ছয় সপ্তাহ কার্যকর ছিল। সেই সময় চীনে বাণিজ্যিক তত্ত্বাবোধয়ক ও ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি ছিলেন ক্যাপ্টেন চার্লস এলিয়ট (Captain Charles Elliot) নামে এক নৌ আধিকারিক। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে চীনে ব্রিটিশ বণিকদের তত্ত্বাবোধণ ও ব্রিটিশ বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষার জন্য নিয়োগ করেছিল। অবরোধের চাপে এলিয়ট সকল ব্রিটিশ বণিকদের গচ্ছিত আফিম তাঁর কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৮৩৯ খ্রিঃ মে মাসে ব্রিটিশ বণিকরা ২১০০০ পেটী আফিম এলিয়টের কাছে জমা দিয়েছিল, এবং এলিয়ট সেগুলিকে লিনের হাতে তুলে দিয়েছিল। বাজেয়াপ্ত আফিমকে লিন প্রকাশ্যে নষ্ট করেছিল। এরপর তিনি অবরোধ তুলে নিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে চীনে আফিমের চোরাচালান না করার শর্তে বাণিজ্য করার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ব্রিটীশরা ছাড়া অনেক বণিকই লিনের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে তাঁর শর্তস্বরূপ দাবি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু লিন ব্রিটিশ বণিকদের চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করতে বললে তারা তা অস্বীকার করে এবং চীনাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশরাজের সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগ তোলে। যাইহোক, এরপর লিনের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর না করেই এলিয়টসহ ব্রিটিশ বণিকরা ক্যান্টন ছেড়ে পর্তুগীজদের বাণিজ্যকেন্দ্র ম্যাকাও (Macao) তে চলে গিয়েছিল। এই ঘটনার পর এলিয়ট ব্রিটিশ বিদেশ সচিব লর্ড পামারস্টোন কে চীনে ব্রিটিশদের স্বার্থরক্ষা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য চীন, ব্রিটেনের মধ্যে এই সম্পর্কের তিক্ততা প্রথম আফিম যুদ্ধের সময় তুঙ্গে উঠেছিল।

সামরিক অভিযান :

ম্যাকাওতে ব্রিটিশরা স্থানান্তরিত হওয়ার কয়েকমাস পরেই একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাসে একদল ব্রিটিশ নাবিক কাউলুন (Kowloon) এ এক চীনা গ্রামবাসীকে হত্যা করে। লিন তৎক্ষাৎ অপরাধীদের চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পন করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এলিয়ট এই নির্দেশের বিরোধীতা করেন এবং জানিয়ে দেন যে, ব্রিটিশ প্রজাদের বিচার করার কোন আইনগত অধিকার চীনা কর্তৃপক্ষের নেই। এলিয়টের অসহযোগীতা লিনকে ক্ষুব্ধ করেছিল। তাই লিন পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে ব্রিটিশদের ম্যাকাও থেকে বহিস্কৃত করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ আগস্ট ব্রিটিশরা ম্যাকাও ত্যাগ করে হংকং এ আশ্রয় নেয়। এই সময় কিছু ব্রিটিশ বণিক চীনে বাণিজ্য করার অধিকর ফিরে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল এবং তারা ভেবেছিল চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা থেকে তাদের বিরত রাখা এবং বাণিজ্য বন্ধ রাখার কোন অধিকার এলিয়টের নেই। তাই এলিয়ট যখন পরবর্তী সরকারী নির্দেশ এর আশায় অপেক্ষামান তখন কিছু বণিক এলিয়টের আদেশ অগ্রাহ্য করে ব্যাক্তিগতভাবে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করে বাণিজ্য অধিকার ফিরে পায়। এর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রেক্ষিতে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে যখন এক ব্যাক্তিগত বাণিজ্য জাহাজ বোগ বন্দরে প্রবেশ করে তখন ব্রিটিশ নৌবাহিনী তার উপর আক্রমন চালায়। চীনা নৌবহরও ঐ জাহাজকে রক্ষা করার জন্য পাল্টা আক্রমণ করে। এই ভাবে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল।

ক্যান্টনে ব্রিটিশদের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সংবাদ লন্ডনে পৌছেছিল ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে আগস্ট মাসে। এর প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ আফিম বণিকদের প্রতিনিধিরা শিল্প পুঁজিপতিদের সমর্থন পেয়ে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে চীনের বাজার ব্রিটিশ পন্যাদির জন্য উন্মুক্ত করার দাবি তোলে। বলা হয় যে, ফ্যাক্টরি (বাণিজ্য কেন্দ্র) অবরোধ ও আফিম বাজেয়াপ্ত করে চীন একই সথে অবাধ বাণিজ্যে বাধা প্রদান এবং ব্রিটিশরাজের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ১ অক্টোবর ব্রিটিশ ক্যাবিনেট চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে ৩১ জানুয়ারী ভারতবর্ষে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্বদেশের সরকারের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তবে মাঞ্চুসরকার আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে অ্যাডমিরাল জর্জ এলিয়টের নেতৃত্বে এক বিশাল নৌবহর চীনে উপস্থিত হয়।

প্রথম আফিম যুদ্ধকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ের স্থায়িত্ব ছিল ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে জুনে ব্রিটিশ নৌবহর আগমন থেকে ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারী তে চুয়েনপি কনভেনশন (Chuenpi Convention) স্বাক্ষর পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে যুদ্ধ ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এবং তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল চার্লস এলিয়টের প্রত্যাবর্তন এবং ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে আগস্ট মাসে হেনরি পটিংগার (Henry Pottinger) এর আগমনের মধ্য দিয়ে।

১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসে বিশাল ব্রিটিশ নৌবহর চীনে উপস্থিত হলে লিন ক্যান্টনে ব্রিটিশ শক্তির মোকাবিলা করার জন্য নৌশক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশরা ক্যান্টনে একত্রিত চীনা বাহিনীর সাথে সংঘাত এড়িয়ে সেখানে নৌ অবরোধ জারি করে এবং দ্রুত উপকূল রেখা বরাবর বেজিং এর দিকে অগ্রসর হয়। ব্রিটিশরা যাত্রাপথে গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলি অবরোধ করে এবং ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ আগস্ট তিয়ানসিন (Tianjin) এর নিকটবর্তী Beihe তে উপস্থিত হয়। ব্রিটিশদের এই কৌশলী অভিযান মাঞ্চু সরকারকে ভীত করে তোলে। রাজধানী বেজিং (Beijing) এর সন্নিকটে ব্রিটিশদের আগমন মাঞ্চু সরকারকে এতটাই আতঙ্কিত করে তোলে যে চীন সম্রাট দ্রুত লিন সে - সু- কে অপসারিত করে চি শান (Qishan) নামে এক সম্রান্তবংশীয় চীনাকে লিনের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তাঁর হাতেইও বিদেশী শক্তির মোকাবিলার দায়িত্ব অর্পিত হয়। চি শান তিয়েনসিনে ব্রিটিশদের সাথে সংগ্রামে অবতির্ণ হন। এবং শেষপর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে আপোস - মীমাংসা হয় ও ব্রিটিশরা পশ্চাদপসরণ করে। এই আপোসের ফলশ্রুতিতে পরের বছর ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে ২০

জানুয়ারী ব্রিটিশ প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন চার্লস এলিয়েট ও চীনা রাজপ্রতিনিধি চি-শান এর মধ্যে চুয়েনপি কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়। এই কনভেনশন অণুযায়ী স্থির হয় যে, চীন ব্রিটেনকে হংকং প্রদান করবে এবং ছয় মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেবে। এছাড়া এতে দুই দেশের আধিকারিকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন এবং ক্যান্টনকে ব্রিটিশ বণিকদের জন্য অবিলম্বে উন্মুক্ত করার কথা বলা হয়। এর পরিবর্তে ব্রিটিশরা Dinghai ছেড়ে দিতে, বোগ নিকটস্থ দূর্গগুলি প্রত্যার্পন করতে এবং ক্যান্টনে সীমিত বাণিজ্যে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু বেজিং ও লন্ডন উভয়ই এই চুক্তিপত্র প্রতাখ্যান করেছিল। মাঞ্চু সম্রাট তাওন - কুয়াং (Tao Kuang) চীনা প্রতিনিধির উপর যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কারণ তিনি মাঞ্চু সরকারের অণুমোদন ছাড়াই ব্রিটেনকে এর শর্তে সম্মতি দিয়েছিলেন । এরই প্রেক্ষিতে তিনি চিন-শান কে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করেছিলেন এবং মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিয়েছিলেন । যদিও পরে তিনি মৃত্যুদন্ডের আদেশ প্রত্যাহার করে তাঁকে নির্বাসনের শাস্তি দিয়েছিলেন । ক্যাপ্টেন এলিয়ট এরও একই ধরনের পরিণতি হয়েছিল। পামারস্টোন (Palmerston) চীনের উপর চাপ সৃষ্টিতে ব্যর্থতার জন্য এলিয়টকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে এলিয়টকে পদচ্যুত করে হেনরি পটিংগারকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিল।

১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে আগস্ট মাসে পটিংগারের চীনে আসা অবধি এলিয়টই ব্রিটিশদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যাইহোক প্রথম আফিম যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বের স্থায়িত্ব ছিল সাতমাস। চি-শানকে অপসারন করার পর মাঞ্চুসরকার তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র ই শান (I - Shan) কে কমিশনার পদে নিযুক্ত করে এবং তাঁকে একটা বিশাল বাহিনীর জেনারেল ঘোষণা করে ব্রিটিশদের সাথে মোকাবিলার ব্যবস্থা করে। এই সুযোগে এলিয়ট চীনা কর্তৃপক্ষের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং দ্রুত তিনি পার্লনদী (Pearl River) র সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি দখল করে নেন এবং ক্যান্টন অবরোধ করেন। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে ২৭ মে ক্যান্টনে দুই পক্ষের মধ্যে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্তগুলির মধ্যে ছিল - (১) ব্রিটিশদের সাতদিনের মধ্যে ছয় মিলিয়ন ডলার প্রদান। (২) ৬ দিনের মধ্যে ক্যান্টন থেকে ৬০ মাইল দূরে চীনাবাহিনীর অপসারণ। (৩) বেগে থেকে ব্রিটিশ বাহিনীর অপসারণ। (৪) যুদ্ধবন্দীদের বিনিময় এবং (৫) হংকং প্রদান স্থগিত করণ। আফিমের যুদ্ধের তৃতীয় পর্যায়ে চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটেন এক আগ্রাসী কর্মসূচী নিয়েছিল। হেনরি পটিংগার চীনে আসার পরই তার বাহিনীকে উপকূল বরাবর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল এবং উত্তরে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়া এলিয়ট পূর্বে যে বন্দর দখল করেছিলেন সেগুলিকে পটিংগার পুনরায় দখল করেন এবং বেজিং এর সন্নিকটে উপনীত হন । তিনি ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে ২২ জুলাই এর মধ্যে অ্যাময় (Amoy), নিংপো (Ningpo) সাংহই, ঝেনজিয়াং (Zhenjiang) দখল করে

টিপ্পনী

নিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য ঝেনজিয়াং এর যুদ্ধ ছিল এই পর্বের শেষ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। ইয়াংসি নদী ও গ্রান্ড ক্যানাল (Grand Canal) যখানে পরস্পরকে ছেদ করেছে তার সন্নিকটে অবস্থিত ঝেনজিয়ং ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন কেন্দ্রস্থল। এখান থেকেই দক্ষিণের অঞ্চল থেকে আগত পণ্যাদি রাজধানীতে প্রেরণ করা হত। তাই ব্রিটিশরা এই স্থান দখল করে নিলে মাঞ্চু সরকার বাধত্য হয় শান্তি স্থাপনের আবেদন জানাতে।

টিপ্পনী

চীন সরকারের শান্তি স্থাপনের আবেদনের পরিনতিতে ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ আগস্ট নানকিং চুক্তি (Theaty of Nanjing) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই সময় ব্রিটিশরা চীনের কাছ থেকে তাদের কাঙ্খিত সকল দাবি আদায়ে বদ্ধপরিকর ছিল। যদিও ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের সূত্রপাত আফিমকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল, তথাপি এই চুক্তিতে আফিমের কোন উল্লেখ ছিল না। ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ অক্টোবর নানকিং সন্ধিচুক্তির পরিপূরক রোগের চুক্তি (Treaty of Bogue) চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। শীঘ্রই ইংল্যান্ডের দেখাদেখি ফ্রান্স ও আমেরিকাও চীনের সাথে একই ধরনের সন্ধি স্থাপনের আবেদন জানায়। মাঞ্চু সরকারের কাছে তখন বিশেষ কিছু বিকল্প ছিল না, তাই শেষ পর্যন্ত চীন ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ৩ জুলাই আমেরিকার সাথে ওয়াশিংয়ার চুক্তি (Treahty of Wangshia) এবং ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ২৪ অক্টোবর ফ্রান্সের সাথে হোয়নাম্পেয়ার সন্ধিচুক্তি (Treaty of Whampoa) সম্পাদন করে।

২.৬.২. দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ :

নানকিং চুক্তির শর্তানুযায়ী চীন পাঁচটি বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। যদিও এই পাঁচটি বন্দরের মধ্যে ক্যান্টন ব্যাতIত বাকি চারটিও বন্দর শর্তানির্ধারিত সময়ে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

ক্যান্টন শহর বিতর্ক :

ক্যান্টনের কমিশনার ও গভর্নর জেনারেল চি ইং (Qiying) ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ক্যান্টন উন্মুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ক্যান্টনের স্থানীয় অধিবাসীরা বিদেশীদের শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দিতে রাজি ছিল না এবং এব্যাপারে তারা সরকারের বিরোধিতা করেছিল। আসলে ক্যাপ্টেন চার্লস এলিয়টের সমরাভিযান কালে ক্যান্টনবাসীদের উপর ব্রিটিশরা চরম অত্যাচার করেছিল। তাই ক্যান্টনবাসীদের উপর ব্রিটিশরা চরম অত্যাচার করেছিল। তাই ক্যান্টনবাসীরা ব্রিটিশদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। সেই সময় ব্রিটিশ প্রতিনিধি ছিলেন জন ডেভিস, যিনি ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে পটিংগারের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে চিইং ও জন ডেভিসের মধ্যে এক পারস্পরিক বোঝাপড়া হয় যেখানে ব্রিটিশরা ক্যান্টনের অভ্যন্তরে প্রবেশ স্থগিত রাখতে সম্মত হয় এই শর্তে যে, চীন অন্য কোন বৈদেশিক শক্তির হাতে Zhousan Island ছেড়ে দিতে পারবে না। চীনের

সাথে ব্রিটিশদের এই আপোস ক্যান্টনবাসীদের সাহস বৃদ্ধি করেছিল এবং তাদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ তীব্র হয়েছিল। ব্রিটিশদের উপর ক্যান্টনবাসীদের আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ডেভিসের নেতৃত্বে ব্রিটিশরা ক্যান্টনে একটা সশস্ত্র অভিযান চালায়। এই অভিযানে ব্রিটিশরা বোগ দূর্গ সহ ক্যান্টনের ১৩ টি ফ্যাক্টরি জেলা দখল করে। কমিশনার চিইং দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ব্রিটিশদেদর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ৬ এপ্রিল এ। এই চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে ঠিক দুই বছর পরে ব্রিটিশদের ক্যান্টন শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। এছাড়া অপরাধীদের শাস্তি প্রদান এবং ক্যান্টনে ব্রিটিশ বণিক ও মিশনারীদের যথাক্রমে পণ্যাগার ও চার্চ তৈরির অধিকার প্রদানের কথাও বলা হয়।

টিপ্পনী

প্রত্যক্ষ কারণ : 'এ্যারো' সংক্রান্ত ঘটনা :

'এ্যারো' (Arrow) ছিল ইউরোপীয় কাঠামো অথচ চীনা পাল বিশিষ্ট একটি দো আঁশলা জাহাজ। এইজ জাহাজের মালিক ছিল একজন হংকংবাসী ও চীনা। কিন্তু জাহাজটি হংকং এর একটি ব্রিটিশ কোম্পানীর কাছে রেজিস্ট্রিকৃত ছিল। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ৮ অক্টোবর জাহাজটি ক্যান্টনে অবস্থান করার সময় কিছু চীনা অফিসার জনৈক কুখ্যাত জলদস্যুকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে সৈন্য সহ জাহাজটিতে উঠে পড়ে। সেইসব জাহাজটির লাইসেন্স মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও জাহাজটিতে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন ছিল। যাইহোক, তারা জাহাজের চীনা নাবিকদের গ্রেপ্তার করে এবং ধস্তাধস্তিতে ব্রিটিশ পতাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্যান্টনের ব্রিটিশ কনসাল হ্যারি পার্কস (Harry Parkes) এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বন্দী নাবিকদের মুক্তি এবং চীনা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিখিত ক্ষমাপ্রার্থনা দাবি করেন। ব্রিটিশদের বক্তব্য ছিল যে, 'এ্যারো' যেহেতু ব্রিটিশ কোম্পানীর কাছে রেজিস্ট্রিকৃত ছিল, তাই সেটা প্রকৃত অর্থে বিদেশী জাহাজ ছিল। আর নানকিং চুক্তির অতিরাষ্ট্রীয় সংক্রান্ত ধারায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, বিদেশী জাহাজের কোন কার্যকলাপে চীনা কর্তৃপক্ষ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তাই ব্রিটিশ কনসালের কাছে পরোয়ানা না দিয়ে চীনা অফিসারদের জাহাজে ওঠা এবং নাবিকদের গ্রেপ্তার করা সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ ছিল। অন্যদিকে চীনের বক্তব্য ছিলন এ্যারোর ব্রিটিশ লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ব্রিটেনের পতাকা উত্তোলেন করার কোন অধিকার ছিল না। এছাড়া এই জাহাজের মালিক ছিল একজন চীনা এবং ঘটনাটি ঘটেছিল চীনা বন্দরে। তাই এটা ছিল চীন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলার ব্যাপার। যাইহোক, ব্রিটিশরা শেষপর্যন্ত জাহাজটিকে বাজেয়াপ্ত করে এবং এই দাবিতে অটল থাকে যে, যেহেতু জাহাজটিতে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন ছিল এবং সেটাকে চীনা অফিসাররা নামিয়ে দিয়েছিল তাই ক্যান্টনের গভর্নরকে ব্রিটিশ পতাকার অবমাননার জন্য আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে লিখিত

ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সে সময়ে ক্যান্টনের ভাইসরয় ইয়া-মিন-চিং (yeih-Min-Ching) ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ২২ অক্টোবর বন্দী নাবিকদের মুক্ত করে দেন। কিন্তু 'এ্যারো' ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেন। এই ক্ষুদ্র ঘটনাই চীনে আর একটা যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছিলল। পরের দিনই ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ ক্যান্টনে বোমাবর্ষন করে। ২৮ অক্টোবর চীন এর প্রত্যুত্তর দেয়। এই ভাবেই দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের সূচনা হয়। যেহেতু এ্যারো সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছিল, তাই এই যুদ্ধ 'এ্যারো যুদ্ধ' (Arrow War) নামেও পরিচিত।

টিপ্পনী

সামরিক অভিযান :

চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের সামরিক অভিযানে ফ্রান্স, আমেরিকাও রাশিয়া সমর্থন করেছিল। তবে আমেরিকা ও রাশিয়া চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরাসরিভাবে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু ফ্রান্সের ব্রিটেনের সাথে সামরিক অভিযানে অংশ নিয়েছিল। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রেবরুয়ারী মাসে গোয়াংশি (Guangxi) প্রদেশে চীনা কর্তৃপক্ষ এক ফরাসী মিশনারীকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল। এই ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়ার লক্ষ্যেই ফ্রান্স চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের সাথে সশস্ত্র অভিযানে লিপ্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের সমরাভিযান পর্বকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বের সুচনা হয়েছিল ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ২৩ অক্টোবর ক্যান্টন শহরে বোমাবর্ষনের মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয়েছিল ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসে তিয়েন্তসিন সন্ধি (Treahyes of Tianjin) দিয়ে। দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়েছিল ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে এবং সমাপ্তি ঘটেছিল ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে পিকিং কনভেনশন (Peiking Convention) স্বাক্ষর এর মধ্য দিয়ে।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৮ ডিসেম্বর ইঙ্গ ফরাসী যৌথ-বাহিনী ক্যান্টন দখল করে নিয়েছিল। যৌথবাহিনী- ক্যান্টনের গভর্ণর ইয়ে-মিন-ইং কে বন্দী করে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বলাবাহুল্য, ইয়ে-মিন-চিং এর ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতাতেই বন্দি অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল। যাইহোক, বিদেশীরা ইয়ে মিন চিং এর পূর্ববর্তী সহযোগী ও মাঞ্চু বংশোদ্ভুত বো-গাই (Bo-gai) কে গভর্ণর পদে নিযুক্ত করে বস্তুত তাঁকে ক্রীড়ণকে পরিণত করেছিল। প্রকৃত ক্ষমতা ন্যাস্ত ছিল ক্যান্টনের ব্রিটিশ কনসাল হ্যারি পার্কস এর উপর। ১৮৬০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্যান্টন যৌথবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। চীনে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার লর্ড এলগিন (Lord Elegin) ও ফরাসি কূটনীতিবিদ্ জ্যাঁ ব্যাস্টিস্ট লুই গ্রস (Jean Baptiste Louis Gros) এর নেতৃত্বে যৌথবাহিনী উত্তরমুখী অভিযান চালিয়ে পিকিং (বেজিং) এর উপকণ্ঠে উপনীত হয়েছিল। তারা ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে Dagu দুর্গ ও তিয়েন্তাসিন হয়ে শেষ পর্যন্ত চিংরাজদরবার আপোস মীমাংসার লক্ষ্যে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীন পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিল। এই চুক্তিগুলি একত্রে তিয়েন্তসিন চুক্তি (Treaties of Tianjin) নামে

পরিচিত।

তিয়েন্তসিন সন্ধির শর্তাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, এই চুক্তি স্বাক্ষরের এক বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে এর অনুমোদন করা হবে পিকিং এর রাজদরবারে। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে মে মাসে বিদেশীরা যখন চুক্তি অনুমোদনের জন্য ফিরে আসে তখন এক সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়। আসলে চীনা কর্তৃপক্ষ পিকিং এর বদলে এই চুক্তিকে সাংহাইতে অনুমোদন করে চেয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ দূত ফ্রেডারিক ব্রুস (Fedarick Bruce) অনুমোদনের জন্য পিকিং যেতে চেয়েছিলেন এবং তাই তিনি যুদ্ধ জাহাজ সম্বলিত একটি নৌবহর নিয়ে পিকিং এর অভিমুখে অগ্রসর হন। ১৮ জুন ব্রিটিশ বাহিনী Beihe তে পৌঁছায়। কিন্তু চীনারা এই পথে বিদেশীদের পিকিং যাত্রাকে অনুমেদন করেনি। এর পরিবর্তে তারা Beitang হয়ে উত্তরের পথ অনুসরনের কথা বলেছিল। আমেরিকান দূত চীনের প্রস্তাবিত পথই অণুসরণ করে পিকিং পৌঁছায়। কিন্তু ফ্রেডারিক ব্রুস তাঁর নিজের সম্মানার্থেই তিয়েন্তসিন থেকে মূল পথ ধরেই পিকিং পৌঁছাতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তাই ব্রিটিশ বাহিনী মূল পথ ধরেই পিকিং এর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যাত্রাপথে ব্রিটিশরা আকস্মিকভাবে কঠিন চীনা প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে ব্রিটিশ বাহিনীর চূড়ান্ত ক্ষতি হয়। ব্রিটিশ ও ফরাসী দূতেরা সাংহাই (Sanghai) তে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এরপর ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মে মাসে এক বিশাল ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ বাহিনীর সমাবেশ ঘটে হংকং এ। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে আগস্টে এই বাইনী পিকিং এর অভিমুখে অগ্রসর হয়। তারা যাত্রাপথে চীনা প্রতিরোধ চূর্ণ করে ২৩ আগস্ট তিয়েন্তসিন পৌঁছায়। এখান থেকে যৌথবাহিনী অন্তবর্তী স্থলপথে পিকিং এর দিকে অগ্রসর হয়। পিকিং আক্রমণের সংবাদে সন্ত্রস্ত চীনা সম্রাট জিয়ান ফেং (Xianfeng, 1851 - 1861) বাধ্য হয়ে শান্তিপূর্ণ আপস মীমাংসার আবেদন জানান। এর প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড এলগিন এর অভ্যর্থনার জন্য হ্যারিপার্কস এর নেতৃত্বে একটি দল পূর্বেই পিকিং এ প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু পার্কস চীনা কর্তৃপক্ষের সাথে বিতর্কে জড়ীয়ে পড়েন এবং ১৮ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার হন। যদিও পার্কস শীঘ্রই মুক্তি পেয়ে ছিলেন , কিন্তু ব্রিটিশরা অভিযোগ তোলে পার্কসের অনুগামী কিছু সদস্যকে চীনা কর্তৃপক্ষ অত্যাচার এবং হত্যা করেছে। এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ব্রিটিশ সেনাপতি এলগিন ২১ সেপ্টেম্বর পিকিং আক্রমণ করেন। তিনি চীনা বাহিনীকে পরাস্ত করে ৮ অক্টোবর বেজিং এ পৌছান। বলাবাহুল্য মাঞ্চু সম্রাট জিয়ানফেং তাঁর রাজদরবার সহ জেহল (Jehol) এ পালিয়ে গিয়েছিল। তবে পিকিং ত্যাগের পূর্বে সম্রাট মাঞ্চু সরকারের পক্ষ থেকে বিদেশীদের সাথে আপোস মীমাংসা করার জন্য যুবরাজ কুং (Kung) কে রাজদূত হিসাবে পূর্ণক্ষমতার বহাল করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে ক্রুদ্ধ এলগিন পার্কসকে বন্দী করার শাস্তি হিসাবে মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদ সাধন এবং একইসাথে মাঞ্চু রাজপ্রাসাদ (যা নিষিদ্ধ শহর বা 'Forbidden city' নামে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পরিচিত) অগ্নিদগ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ফ্রান্স ও রাশিয়ার যুক্তিতে সম্মত হয়ে তিনি তাঁর পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এবং বাহিনীকে পিকিং এর দুটি রাজকীয় উদ্যান - গ্রীষ্মকালীন রাজপ্রাসাদ (Quingyiyuan) ও পূর্বতন গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ (Yuanmingyuan) ধ্বংস করার আদেশ দেন। বিদেশী বাহিনী বহু শিল্পকর্ম লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে এবং ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ অক্টোবর রাজউদ্যানগুলি অগ্নিদগ্ধ করে। যাইহোক, শেষপর্যন্ত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮৬০ খ্রিঃ এ ২৪ অক্টোবর অপমানজনক পিকিং কনভেনশন (Picking Convention) স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে।

২.৬.৩. আফিম যুদ্ধের কারণ :

চীনাদের কাছে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ইঙ্গ - চীন সংঘর্ষের মূল কারণ ছিল আফিমের চোরাচালান ও তার ফলে চীনে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে অবনতি। অন্যদিকে ব্রিটিশদের কাছে আফিম ছিল যুদ্ধের উপলক্ষ মাত্র। তাদের কাছে প্রধান বিষয় ছিল যে, ব্রিটিশদের প্রতি চীনা কর্তৃপক্ষের অপমানজনক ব্যবহার এবং ব্রিটিশ রাজের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন। এছাড়া নানকিং চুক্তিতে আফিমের কোন উল্লেখ না থাকায় প্রমানিত হয় নযে, ব্রিটিশদের কাছে আফিম মুখ্য বিষয় ছিল না। ব্রিটিশরা লিন - সে- সু কর্তৃক আফিম নষ্টের ঘটনাকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে চীনের কাছ থেকে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করতে চেয়েছিল। দুই দেশের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার আমূল পার্থক্যই এই সংঘর্ষের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক পালন করেছিল। বলাবাহুল্য এই দুই দেশের মধ্যে যে সব বিষয়ে মূল পার্থক্য ছিল তা হল -

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতি মনোভাব : পশ্চিমের দেশগুলিতে যে ধরনের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি বলবৎ ছিল তা চীনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেকটা আলাদা। সপ্তদশ শতকে অর্দ্ধভাগ থেকে বিশেষত ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ওয়েষ্টকালিয়া শান্তিচুক্তি (Peace treahy of Westphalia)র পরবর্তী সময়ে পশ্চিম অনান্য দেশগুলিকে সমান সার্বভৌম রাজনৈতিক সত্ত্বা হিসাবে গ্রহণ করতে শিখেছিল। ইউরোপ ক্রমশ সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ কিংবা মিত্রবর্গের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি এবং সমঝোতাকে মান্য করতে শিখেছিল। অন্যদিকে চীনাদের নিজেদের সভ্যতা সম্পর্কে বেশ গর্ব ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল চীন বিশ্বসভ্যতার কেন্দ্রভূমি। তারা চীনা সম্রাটকে 'স্বর্গের সন্তান' এবং বিশ্বজগতের একমাত্র বৈধ সম্রাট বলে মনে করত। তাই চীনের কাছে বিশ্বের সকল দেশ ছিল করদরাজ্য স্বরূপ। চীন সকল দেশের কূটনৈতিক দৈত্যকে নজরানা বাহক বলেই মনে করত। ফলত চীনের বিদেশনীতির প্রকৃতি ছিল শাসক ও অনুগত প্রজার মত। ব্রিটেন চীনে তিনবার কূটনৈতিক দৌত প্রেরণ করেছিল, যথা - ম্যাকর্টনি মিশন (Macartney mission 1793), আমহার্স্ট মিশন (১৮১৬) এবং নেপিয়ার মিশন (১৮৩৪)। এই মিশনগুলির মাধ্যমে ব্রিটেন সাধারণ চুক্তির ভিত্তিতে চীনের সাথে

কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ব্রিটেনের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল কারণ, মাঞ্চু রাজদরবার মনে করত চীনা সম্রাট কখনই বিদেশীদের সাথে সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন।

২. সাংস্কৃতিক সংঘাত : চীন তার করদ রাজ্যগুলির কাছে নিজের উজ্জ্বল ভাবমূর্তী ধরার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্য অনুমোদন করেছিল। এক্ষেত্রে করদ রাজ্যের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা চীনা রাজদরবারে চৈনিক 'কাউ-টাউ' (Kow-Tow) প্রথায় নতজানু হয়ে চীনা সম্রাটকে নজরানা দিতে হত। অতঃপর সম্রাট আনুষ্ঠানিকভাবে বাণিজ্য করার অনুমতি দিতেন। চীন বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এই ধরনের রীতি দুই হাজার বছর ধরে অনুসরণ করে আসছিল। কিন্তু পশ্চিমের দেশগুলিতে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের রীতি নীতি চীনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। পাশ্চাত্যের দেশগুলি চীন সম্রাটের কাছে বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকার করেছিল। ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা চীনা রাজদরবারের ;কাউ-টাউ' প্রথাকে মানতে চায় নি। এর ফলে তাদের সাথে চীনের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল।

৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি : উনবিংশ শতকে ইউরোপে অর্থনৈতিক জীবনের কেন্দ্রে ছিল শিল্প পুঁজিবাদ। এর ফলশ্রুতিতেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। পশ্চিমের দেশগুলির কাছে বাণিজ্য লাভজনক প্রতিভাপন্ন হয়েছিল এবং তারা অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করেছিল। অন্যদিকে চীন স্বদেশে বৈদেশিক বাণিজ্য কঠোর নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। চীনের কাছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা পাশ্চাত্যের থেকে আলাদা ছিল। চীন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ। চীনারা বিশ্বাস করত যে, সমৃদ্ধশালী মধ্যবর্তি রাজ্য হিসাবে চীনের বিদেশীদের কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই, মহান সম্রা দয়ালু বৈদেশিক বাণিজ্যের অণুমোদন দিয়েছেন। চীনের কাছে বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থ ছিল একদিকে চীনের প্রতি করদ রাজ্যগুলোর কদর বজায় রাখা এবং অণ্যদিকে বিদেশী বর্বরদের নিয়ন্ত্রণে রাখা। যদিও তাং যুগ থেকেই চীন একটা বাণিজ্যগার হিসাবে পরিচিত ছিল কিন্তু চীনা রাজদরবার তখন থেকেই নজরানা প্রথার রীতি অণুসরণ করে আসছিল। চীন নিজের ইচ্ছানুযায়ী বৈদেশিক বাণিজ্যকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের পরবর্তিকালে মাঞ্চুরাজদরবার বিদেশীদের উপর নানাবিধ বাণিজ্যক বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল, যা কার্যত ইঙ্গ-চীন সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছিল।

৪. ক্যান্টন বাণিজ্য প্রথা : ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে চীনে ক্যান্টনই ছিল একমাত্র বন্দর যেখানে বিদেশীরা বাণিজ্য করতে পারত। মাঞ্চু রাজদরবার কিছু চীনা বনিকদের এই বৈদেশিক বাণিজ্য দেখাশোনা করার বিশেষ অধিকার দিয়েছিল। তারা কো-হং (Cohong) নামে একটি বাণিজ্যিক সংগঠন তৈরি করেছিল। চীনা সরকার এই বণিকদের উপর ক্যান্টনে আগত বিদেশী জাহাজের তত্ত্বাবোধান, শুল্ক আদায়,

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বিদেশীদের খাদ্য-বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং তাদের আচারণবিধি লক্ষ্য করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। বাণিজ্যের মরসুম স্থায়ী থাকত অক্টোবর থেকে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত। বিদেশী বণিকরা জাহাজে করে পণ্য নিয়ে ক্যান্টনে আসত এবং বিদেশী কুঠি বা ফ্যাক্টারী গুলিতে আশ্রয় নীয়ে ব্যবসা করত। তারপর তারা হয় ম্যাকাওতে কিংবা বা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করত। বিদেশী বণিকরা তাদের জাহাজ বোঝাই পণ্য কো-হং বণিকদের কাছে হস্তান্তর করত এবং তাদের কাছ থেকে চীনা দ্রব্য আসত। তারপর কোহং বণিকেরা বিদেশী পণ্য সম্ভারের দাম নির্ধারণ করে দেশের অভ্যন্তরে বিতরণ করে দিত। যেহেতু কোহংরা চীনা সরকার এবং বিদেশীদের মধ্যে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক (Buffer) হিসাবে কাজ করত, তাই মাঞ্চু রাজদরবার এদের উৎসাহীত করত। বৈদেশিক বাণিজ্যে কোহং সংঘ (গিল্ড) এর একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল। বিদেশীরা কোহং কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে তাদের বাণিজ্য পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য থাকত। কোন পণ্য ক্রয় করার ক্ষেত্রেও একই বাধ্যবাধকতা ছিল। অষ্টাদশ শতকে যেসব ইউরোপীয়রা চীনের সাথে বাণিজ্য করতে চাইত তাদের চীনা নিয়মবিধি মান্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু ঊনবিংশ শতকে প্রাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেলে এবং ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকলে তারা চীনে এই কঠোর বাণিজ্যিক বিধি নিষেধ বিলোপ করার দাবি তুলতে থাকে।

৫. আইন সম্পর্কে ধারণা : চীনা আইনব্যবস্থা কনফুসীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। কনফুসীয় দর্শনে বিশ্বাস করা হত যে, যদি সমাজ ও পরিবার প্রত্যেকের মধ্যে মূল্যবোধের সঞ্চারণ করতে পারে তাহলে সেখানে কোন অপরাধ ঘটতে পারে না। তাই কনফুসীয় দর্শনে দন্ডবিধি অপেক্ষা মানবিক মূল্যবোধের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ফলতঃ চীনা সমাজে কোন পরিবারের সদস্যদের দোষ ত্রুটির নৈতিক দায় বর্তাতো পরিবারের কর্তার উপর একইভাবে কোন গোষ্ঠীর একজন সদস্যর অপরাধের নৈতিক দায় বর্তাতো গোষ্ঠী প্রধানের উপর এবং গভর্ণর জেনারেলও তাঁর শাসনাধীন এলাকায় সংগঠিত অপরাধের জন্য দায়ী থাকতেন। এইভাবে বিদেশী বণিকদের আচরণের জন্য কোহং দায়ী থাকত এবং ব্রিটিশদের যেকোন কাজের জন্য দায়ী থাকত প্রথমে ব্রিটিশ বাণিজ্য তত্ত্বাবোধয়ক এবং পরে ব্রিটিশ কনসাল। ব্রিটিশদের কাছে এই ধারনার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। কারণ, ব্রিটিশ আইনে কোন ব্যাক্তি তার কৃতকর্মের জন্য নিজেই দায়ী থাকত। এছাড়া চীনের অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জলপথ সম্পর্কে চীনাদের কোন ধারনাই ছিল না। তাই দেখা যায় ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ জাহাজ আন্তর্জাতিক জলপথে অবস্থান করা সত্ত্বেও চীনা সৈন্যবাহিনী সেই জাহাজটিতে বেআইনিভাবে উঠে পড়েছিল আফিম বাজেয়াপ্ত করার জন্য। এমনকি চীনাদের এ সম্পর্কেও কোন ধারণা ছিল না যে, যখন চার্লস এলিয়ট সমস্ত ব্রিটিশ বণিকদের পক্ষ থেকে লিন-সে-সু-র

হাতে আফিম সমর্পন করেছিলেন সেই পণ্য কিন্তু তখনও ব্রিটিশ রাজের সম্পত্তি ছিল কারণ, এলিয়ট ছিলেন ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি।

২.৬.৪. অসম চুক্তিসমূহ :

প্রথম আফিম যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের পরবর্তী ছয় দশকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ চীনের সাথে একাধিক অসমচুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। বস্তুত সমগ্র ঊনবিংশ শতক জুড়ে পশ্চিমী শক্তিবর্গ এই অসমচুক্তিগুলি মারফৎ চীনের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ে ব্যস্ত ছিল, এবং এর ফলে চীনে ক্রমশ তার সার্বভৌমত্ব হারাচ্ছিল। যাইহোক, এই অসম চুক্তিগুলির মধ্যে প্রথম চুক্তি ছিল নানকিং চুক্তি, যা প্রথম আফিম যুদ্ধের পর ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ আগস্ট স্বাক্ষর করা হয়েছিল। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী -

চীন যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ২১ মিলিয়ন ডলার ব্রিটেনকে প্রদান করতে সম্মত হয়।

ক্যান্টন, অ্যময়, ফুচাও, নিংপো ও সাংহাই - এই পাঁচটি বন্দর চীন ইংরেজদেদর কাছে বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং এই পাঁচটি বন্দর শহরে ব্রিটিশ বণিকদের বসবাস ও ব্রিটিশ কনসাল নিয়োগ করার অধিকার প্রদান করে।

হংকং ইংরেজদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

দুইদেশের মধ্যে সরকারী চিঠিপত্রের ব্যাপারে সমতা স্বীকৃত হয়।

নানকিং চুক্তিতে যেহেতু শুল্ক নির্ধারণের মত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয় নি। তাই ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ৮ অক্টোবর একটি পরিপূরক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল চীন ও ইংরেজদের মধ্যে। এই চুক্তি বোগের সন্ধি চুক্তি (Treaty of Bogue) নামে পরিচিত। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী স্থির হয় যে -

চীনে আমদানিকৃত ব্রিটিশ পণ্যের উপর ৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে।

ব্রিটিশরা চীনে অতিরাষ্ট্রীয় অধিকার (Extra Territorial Rights) লাভ করবে।

ব্রিটিশরা পাঁচটিও উন্মুক্ত বন্দরে যুদ্ধ জাহাজ নোঙর করতে পারবে।

ব্রিটেনকে চীন সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত রাষ্ট্র (Most favoured nation) এর মর্যাদা দেবে।

শীঘ্রই অনান্য দেশগুলিও চীনের সাথে একাই ধরণের চুক্তি সম্পর্ক গড়ে তুলতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। মাঞ্চু সরকারের কাছে কোন বিকল্প না থাকায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ৩ জুলাই ওয়ংসিয়া চুক্তি (Treaty of Wangixia) এবং ১৮৪৪ খ্রিঃ এ ২৪ অক্টোবচর ফ্রান্সের সাথে হোয়াসম্পোবার চুক্তি (Treaty of Whampoa) স্বাক্ষর করেছিল।এছাড়া চীন ১৮৪৭ খ্রিঃ এ ২০ মার্চ সুইডেন নরওয়ে সাথে ক্যান্টন চুক্তি (Treaty of Canton) স্বাক্ষর করেছিল।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

যাইহোক ওয়াংসিয়া চুক্তির শর্তানুযায়ী -

আফিম ব্যবসা নিষিদ্ধ হয়।

আমেরিকা অতিরাষ্ট্রীয় অধিকার ও সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত দেশ এর মর্যাদা লাভ করে।

আমেরিকানরা পাঁচটি উন্মুক্ত বন্দরে গীর্জা ও হাসপাতাল তৈরির অধিকার পায়।

১২ বছর পর এই চুক্তির পুনববির্ন্যাস করার কথা বলা হয়।

অপর দুটি সন্ধিচুক্তিচর শর্তাদি প্রায় একই ছিল। শুধুমাত্র হোয়াম্পোয়ার চুক্তিতে অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে ফরাসীরা ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের অধিকার পেয়েছিল।

প্রথম আফিম যুদ্ধের পর ব্রিটিশদের অগ্রগতি রাশিয়াকে উৎসাহিত করেছিল এবং রাশিয়াও চীনে নিজের স্বার্থ রক্ষার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। ১৮৫১ খ্রিঃ এ রাশিয়া ও চীনের মধ্যে ঈলির চুক্তি (Traty of Yili) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তি অনুযায়ী ঈলি (আধুনিক Yining) ও Tarbagatai (আধুনিক Tocheng) শহরের উপর রাশিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শহর দুটিতে রাশিয়া বাণিজ্য করার, পণ্যাগার তৈরি ও কনসাল নিয়োগ করার অধিকার পেয়েছিল।

দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের পরাজয়ের পর চীন বাধ্য হয়ে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকার সাথে পৃথক পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। এই চুক্তিগুলি একত্রে তিয়েন্তসিনের চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুযায়ী -

চীন যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে যথাক্রমে ৪ মিলিয়ন ও ২ মিলিয়ন টেইল দিতে সম্মত হয়।

নানকিং, নিউচ্যাং, তেংচাও, হংকাও, কিউকিয়াং, চিনকিয়াং, তাইওয়ানকু, তামসুই, সোয়াটো এবং কিয়াংচাও এর আরও দশটি বন্দর বিদেশীদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

বিদেশীরা চীনের সর্বত্র ভ্রমণ করার অধিকার লাভ করে। তবে ভ্রমণকারীদের সঙ্গে নিজেদের কনসালের দেওয়া এবং চীনা কনর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর করা অনুমতি পত্র রাখতে হবে। উন্মুক্ত কোন বন্দর থেকে ১০০ লি বা ৩৩ মাইল ভ্রমণের জন্য কোন অনুমতি পত্র লাগবে না।

ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারীরা চীনের সর্বত্র অবাধ বিচরণের অধিকার অর্জন করে।

চীনা কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত বিদেশী পণ্যের উপর আভ্যন্তরীণ শুল্ক পণ্যমূল্যের ২.৫ শতাংশের বেশি ধার্য করতে পারবে না।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে রুশ জেনারেলরা মাঞ্চু জেনারেল Yishanকে বাধ্য কচরে আইগুন এর সন্ধি (Traty of Aigun) স্বাক্ষর করতে। এই চুক্তিতে পূর্ব সাইবেরিবাতে

রুশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছিল। যদিও মাঞ্চু সম্রাট জিয়াং কেং এই চুক্তি অনুমোদন করেন নি। কিন্তু দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের সময় ইঙ্গ ফরাসী যৌথবাহিনীর পিকিং অবরোধের সুযোগ রাশিয়া নিজেকে চীনের শুভাকাঙ্খী মিত্র হিসাবে জাহির করে এবং এরপর যুদ্ধ শেষে রাশিয়ার পরামর্শে ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ বাহিনী পিকিং ত্যাগ করলে রাশিয়া তার পুরস্কার স্বরূপ চীনের সাথে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে বেজিং এর সন্ধি চুক্তি (Treaty of Beijing) স্বাক্ষর করে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল। এই চুক্তি মারফৎ উসুরি নদী ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী ভূখন্ডে রুশ চীন যৌথ কর্তৃত্বের পরিবর্তে রাশিয়ার একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ২৪ অক্টোবর ব্রিটেন ও ফ্রান্স এর সাথে চীন পৃথকভাবে অপমানজনক পিকিং কনভেনশন স্বাক্ষর করেছিল। এই কনভেনশনে নানকিং চুক্তির অনুমোদনের পাশাপাশি স্থির হয় যে -

ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয় দেশই ৮ মিলিয়ন করে ক্ষতিপূরণ পাবে।

অবাধ বিদেশী বাণিজ্য এবং বিদেশীদের বসবাসের কন্য তিয়েন্তসিন উন্মুক্ত করা হয়।

ব্রিটেন হংকং এর বিপরীত দিকে অবস্থিত কৌলুন উপদ্বীপ (Kowloon Peninsula) লাভ করে।

চীনের অভ্যন্তরে ক্যাথলিক মিশনারীদের ভূসম্পত্তির অধিকারী হওয়ার শর্ত ফ্রান্স আদায় করে।

বলাবাহুল্য, এইসব চুক্তিগুলির শর্তাবলী পর্যবেক্ষন করলে বোঝা যায় যে সমস্ত চুক্তিই ছিল একপেশে। এই চুক্তিগুলি মারফৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ চীন থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করেছে মাত্র বিনিময়ে দেয় নি কিছুই । সেই জন্য এই চুক্তিগুলিকে অসম বলা হয় । প্রত্যেক বিদেশি রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা অনুগৃহিত দেশের মর্যাদা থাকায় সকলেই চীন থেকে সমান সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে এই আফিম যুদ্ধ এবং তার ফলশ্রিতিতে অসম চুক্তি স্বাক্ষরের পরিপ্রেক্ষিতে চীন একটা সমৃদ্ধশালী আঞ্চলিক শক্তি থেকে আধা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছিল । অতিরাষ্ট্রীয় অধিকার প্রদান চীনের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বকে বিনষ্ট করেছিল এবং নির্দিষ্ট আমদানি শুল্ক ও অনান্য অর্থনৈতিক সুবিধা চীনের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল । ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের পর চীন ক্রমশ অর্থনৈতিকে সাম্রাজ্যবাদের শিকার হয়েছিল।

অগ্রগতির পরিমাপ কর :

১৪. অষ্টাদশ শতকে কোন চীনা সম্রাট চীনে আফিম বিক্রি ও সেবন নিষিদ্ধ করেছিলেন।

টিপ্পনী

১৫. কত খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে আফিম উৎপাদনে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল ?

১৬. প্রথম আফিম যুদ্ধে সামরিক অভিযানের তিনটি পর্যায় কি ছিল ?

১৭. চীন প্রথম কোন অসম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল ? এই চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

টিপ্পনী

২.৭. ঊনবিংশ শতকে জাপানের অগ্রগতি :

১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগীজ বণিকেরা জাপানে এসেছিল এবং এর মধ্য দিয়েই জাপান প্রথম পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে আসে। যাইহোক এরপর স্পেনীয় ও ওলন্দাজ বণিকেরা বাণিজ্যের জন্য নিয়মিত জাপানে আসতে শুরু করেছিল। টোকুগাওয়া শোগুণতন্ত্রের যুগে জাপান এই বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে বেশ লাভবান হয়েছিল।

২.৭.১. জাপানের উন্মুক্ত করণ, কমোডর পেরি ও শোগুনতন্ত্রের উপর প্রভাব :

১৫৪৯ খ্রিষ্টাব্দে জাপানে জেসুইট মিশনারীদলের আগমন ঘটেছিল এবং তারা ষোড়শ শতক শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রায় তিন লক্ষ জাপানীকে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিল। কিন্তু মিশনারী এই কার্যকলাপ জাপান রাষ্ট্রের প্রতিভু শোগুনের পচ্ছন্দ হয় নি। ফলতঃ তিনি পাশ্চাত্যের বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। এর প্রেক্ষিতে শোগুনের নির্দেশে নেটিভ খ্রিষ্টান ও বিদেশী মিশনারীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল, বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং বহির্জগতের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে একগুচ্ছ আদেশনামা ও নীতি জারি করে শোগুন বিচ্ছিন্নতার নীতি কার্যকর করেছিলেন।

পরবর্তী অনেক শতক ধরেই পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ জাপানকে উন্মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু সফল হয় নি। এ প্রসঙ্গে পর্তুগীজরা ১৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম জাপানকে উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে বলপূর্বক নাগাসাকিতে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। ঊনবিংশ শতকের সূচনায় অন্যাণ্য দেশের বিশেষত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার অসংখ্য পাশ্চাত্য বণিক চীনের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এশিয়াতে তাদের কোন ঘাঁটি ছিল না। চীনে যাওয়ার পথে তাদের জাহাজ জাপানে আসত। তাদের আশা ছিল যে এই দ্বীপে বাণিজ্য ঘাঁটি কিংবা কমপক্ষে কোন মেরামতি কেন্দ্র তারা পাবে। এছাড়া বাণিজ্য করার আশাও তাদের

ছিল । যাইহোক, পাশ্চাত্য দেশগুলির আভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাপানের উন্মুক্ত করণকে জরুরী করে তুলেছিল। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আগস্টে রাশিয়া জাপানকে উন্মুক্ত করার শেষ অসফল প্রচেষ্টা চালিয়েছিল । অবশেষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগের পদস্থ কর্মচারী কমোডর ম্যাথু পেরি (Commodore Mathew Perry) র তৎপরতায় পশ্চিমের পক্ষে জাপানকে উন্মুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল। বলাবাহুল্য, পেরি ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে সামরিক শক্তির জোরে জাপানকে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন।

টিপ্পনী

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ১৮৫৩ খ্রিঃএ ৮ জুলাই কমোডর পেরির জাপানে আগমন এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল। বলাবাহুল্য পেরি চারটি যুদ্ধ জাহাজ সম্বলিত একটি নৌবহর নিয়ে জাপানে এসেছিলেন । তিনি প্রথমে জাপানকে পাশ্চাত্যের সাথে বাণিজ্যিক স্পর্ক স্থাপন করার দাবি জানিয়েছিলেন এবং একই সাথে মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিলার্ভ ফিলমোর (Millard Fillmore) এর একটি চিঠি জাপানী কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়েছিলেন। এই চিঠি দেওয়ার পর পেরি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি পরের বছর আরও শক্তিশালী নৌবহর নিয়ে এই চিঠির উত্তর নিতে আসবেন। বলা বাহুল্য ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ ফ্রেবুয়ারী পেরি সাতটি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে জাপানে ফিরে আসেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ৩১ মার্চ কানাগাওয়াতে শোগুনের প্রতিনিধি অ্যাবি মাসাহিরো (Abe Masahiro) ও কমোডর পেরি কানাগাওয়ার সন্ধিচুক্তি (Treaty of Kanagawa) স্বাক্ষর করেন।

২.৭.২. অসম চুক্তি সমূহ :

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জাপানের কানগাওয়ার চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে শান্তির পরিবেশ বজায় থাকে এবং জাপান দুটি বন্দর - হাকোদাতে (Hakodate) ও শিমোডা (Shimoda) কে বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। মার্কিন জাআজ এই বন্দরগুলি থেকে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করার এবং মার্কিন নাবিকেরা সেখানে জাহাজ মেরামতের অধিকার পায়। এছাড়া আমেরিকানরা সেখানে জাপানের বিধি অনুসারে সীমিত বাণিজ্য করার অধিকারও লাভ করে। এমনকি কোন মার্কিন জাহাজ বিপদে পড়লে জাপান তাকে সব ধরণের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

কানগাওয়া চুক্তির গুরুত্ব তার মধ্যে লিখিত শর্তগুলির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে জাপানের দুশো বছরের বিচ্ছিন্নতার পর্বের অবসান ঘটেছিল। এবং বহির্জগতের কাছে জাপান উন্মুক্ত হতে শুরু করেছিল। এইদিকে বিচার করলে বলা যায় যে, এই চুক্তি সম্পাদন ছিল পশ্চিমীদের কাছে অসাধারণ সাফল্য। অণ্যদিকে এই চুক্তি জাপানে শোগুনতন্ত্রের বিপদ ডেকে এনেছিল। কারণ এই চুক্তির মধ্য দিয়ে জাপানের দুর্বলতা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল এবং অনান্য বিদেশী শক্তিও একই

টিপ্পনী

ধরনের চুক্তি সম্পাদন করতে প্রলুব্ধ হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে জাপান বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সাথে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়েছিল।

কানগাওয়া চুক্তি সম্পাদনের দুই বছচরের মধ্যেই জাপান অনুরূপ তিনটি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। এরমধ্যে প্রথমটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ব্রিটেনের সাথে ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে নাগাসাকিতে; দ্বিতীয়টি স্বাক্ষরিত হয়েছিল রাশিয়ার সাথে ১৮৫৫ খ্রিসষ্টাব্দে শিমোদাতে এবং তৃতীয়টি ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হল্যান্ডের সাথে স্বাক্ষরিত হয়েছিল নাগাসাকিতে। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে আমেরিকাসহ বাকি তিনটি দেশ এই চুক্তিগুলি মারফৎ জাপানের কাছ থেকে যেসব অধিকার লাভ করেছিল তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল -

- শিমোদা, হাফোদাতে ও নাগাসাকি তে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করার অনুমতি লাভ।
- এই তিনটি বন্দরে জাপানী কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধ অনুসারে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ।
- হাকোদাতে ও শিমোদাতে কনসাল নিয়োগ করার অনুমতি লাভ।
- নাগাসাকিতে বিদেশী পুরুষদের বসবাসের অধিকার লাভ।
- সীমিত অতিরাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ।

১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে কানগাওয়া শর্তানুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম কনসাল হিসাবে টাউনসেন্ত হ্যারিস (Townszend Harris) কে জাপানে পাঠায়। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আগস্ট মাসে হ্যারিস শিমোডা তে হাজির হন। হ্যারিসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জাপানের সাথে একটা পূর্ণ বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করা। বলাবাহুল্য দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধে ইঙ্গ ফরাসী যৌথ বাইনীর কাছে চীনের পরাজয়ের ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে হ্যারিস জাপানকে একটা নতুন চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ জুলাই হ্যারিস জাপানের সাথে একটি পূর্ণাঙ্গ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি 'হ্যারিস চুক্তি' (Harris Treaty) নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের বৈদেশিক সম্পর্ক এই হ্যারিস চুক্তির উপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হয়েছিল। এই চুক্তিকে দৃষ্টান্ত করে ইউরোপের অনান্য রাষ্ট্রগুলি কিছুদিনের মধ্যে জাপানের সাথে একগুচ্ছ সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করে। জাপান ১৮৫৮ খ্রিঃ আগস্ট থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে হল্যান্ড, রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাথে নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করে। হ্যারিস চুক্তি সহ এই চারটি চুক্তি একত্রে 'আনসেই পঞ্চশক্তি চুক্তি' (Ansei Five Power Treaties) নামে পরিচিত। কারণ, এই চুক্তি গুলি জাপান আনসেই যুগে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। যাইহোক, এই চুক্তিগুলির শর্তাবলীতে মুখ্যত যা উল্লেখ করা হয়েছিল তা হল -

- বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ১৮৫৪ খ্রিঃ জাপানের যে বন্দর গুলি উন্মুক্ত করা হয়েছিল তার সাথে আরও পাঁচটি বন্দর (ত্রদো, কোরো, নাগাসাকি, নিগাতা ও ইয়োকোহামা) উন্মুক্ত করা হবে।
- আন্তর্জাতিক নিয়মে আমদানি -রপ্তানি শুল্ক নির্ধারণ করা হবে।
- উন্মুক্ত বন্দরগুলিতে বিদেশী নাগরিকরা বসবাস ও স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার (আফিম ব্যবসা ছাড়া)
- অধিকার পাবে।অতিরাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করবে।
- ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে।
- কূটনৈতিক আদান প্রদান চলবে।

এই অসম চুক্তিগুলিতে স্বাক্ষর করে শোগুন জাপানের দুশো বছরের পুরনো বিচ্ছিন্নতার নীতিকে পরিত্যাগ করেছিলেন এই অসম চুক্তিগুলি চীনের মত জাপানের সার্বভৌমত্বকেও ক্ষুন্ন করেছিল । এরফলে জাপানে শোগুনতন্ত্র বিরোধী কণ্ঠস্বর জোরালো হয়ে উঠেছিল । এমনকি শোগুনের পরিবার এবং আত্মীয় ডাইমো রাও শোগুনের এই নির্লিপ্ত বিদেশনীতির বিরোধীতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। জাপানের জনগণ সম্রাটকে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৯ নভেম্বর শোগুন টোকুগাওয়া যোশিনোবু (Tokugawa Yoshinobu) পদত্যাগ করলে জাপানে সম্রাটের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনাই জাপানের ইতিহাসে মেইজি রেস্টোরেশন বা মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা নামে পরিচিত।

মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা জাপানের ইতিহাসে একটা অতিগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । তবে এই মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা কিভাবে ঘটেছিল এবং এর প্রকৃতি কিরূপ ছিল তা অনুধাবনের জন্য পূর্ববর্তী বছরগুলির পর্যালোচনা জরুরী । বলাবাহুল্য ঊনবিংশ শতক থেকেই বিশেষত ১৮৫৩ থেকে ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়পর্বে জাপানের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতি ঘটেছিল। এই সময় জাপানের মানুষজনের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল। কারণ এই সময় জাপানের সাথে বিদেশীদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারসাথে জাপানের দীর্ঘদিনের 'সোকোকু' (আবদ্ধ) বিদেশ নীতিরও অবসান ঘটেছিল।

বলপ্রয়োগের মাধ্যমে জাপানের উন্মুক্তকরণ দেশের দ্বৈত শাসনব্যবস্থার দুর্বলতাকে প্রকাশ করেছিল। জাপানে শোগুন স্বয়ং বিদেশনীতির নির্ধারণ করতেন কিন্তু ১৮৫০ এর দশকে তিনি বিদেশীদের কাছে জাপানকে উন্মুক্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতস্ততঃ করেছিলেন । কমোডের পেরি এবং অনান্য বিদেশী প্রতিনিধিদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের সময় শোগুন জাহির করেছিলেন যে চুক্তির শর্তসমূহ চূড়ান্তভাবে স্থির করার আগে তাঁকে সম্রাটের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরে সম্রাট কে এ বিষয়ে জানানোর পরিবর্তে শোগুন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সম্রাটের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তা অনভব করেছিলেন। শোগুন ভেবেছিলেন সম্রাটের সাথে পরামর্শ করার মধ্য দিয়ে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় হবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র ছিল এর বিপরীত ; সুদীর্ঘ বছর পর এই প্রথম কোন বিষয় নিয়ে শোগুন সম্রাটের পরামর্শ চেয়েছিলেন। এই ঘটনা শোগুনতন্ত্রের দুর্বলতার বিষয়টিকে ও সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিল। এছাড়া এই ঘটনা জনগণের কাছে এই বার্তাও প্রেরণ করেছিল যে, বাস্তবে শোগুন এতদিন ধরে সেই ক্ষমতাই ভোগ করেছিলেন যার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন সম্রাট স্বয়ং।

১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কমোডর পেরি যখন জাপানে এসেছিলেন তখন জাপানীরা ১৮৩৯ - ৪২ খ্রিষ্টাব্দের আফিম যুদ্ধে পশ্চিমী শক্তিবর্গের কাছে চীনের পরাজয়ের ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। এছাড়া কমোডর পেরি চারটি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে জাপানে তাঁর প্রথম আগমনেই পশ্চিমের সামরিক শক্তির বহর প্রদর্শন করে ছিলেন। শোগুনের পরিষদীয় আধিকারিকরা উপলব্ধি করে ছিলেন যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া জাপান এর পক্ষে মঙ্গল জনক হবে না। অপরদিকে, শোগুনের এব্যাপারেও অবহিত ছিলেন যে, বিদেশিদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করার অর্থ শত্রুর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া। বলাবাহুল্য, এই সময়ে জাপানের কিয়োটো (Kyoto) রাজদরবারে সাৎসুমা (Satsuma) ও চোসু (Choshu) গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রধান ছিল। এই গোষ্ঠীদ্বয় জাপানে টোকুগাওয়া গোষ্ঠীর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। তাই তারা সম্রাটের উপর প্রভাব খাটিয়ে শোগুন হতবুদ্ধি করার জন্য সম্রাটকে জাপানের 'বিচ্ছিন্নতা নীতি' কে ধরে রাখার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু বিদেশী শক্তিবর্গের চাপে শোগুনের রাজাজ্ঞা অমান্য করা ছাড়া বিকল্প ছিল না।

এই সময় জাপানে বিদেশীদের সাথে জড়িত একাধিক ঘটনা ঘটে যার প্রভাব জাপানের আভ্যন্তরীণ নীতি ও বৈদেশিক সম্পর্কের উপর পড়ে। প্রসঙ্গত বিদেশীদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর শোগুনের উপর বিদেশিদের জাপান থেকে বিতাড়ন করার চাপ পড়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে শোগুন চুক্তির শর্তগুলি কার্যকর করতে যথাসম্ভব বিলম্ব করছিলেন। একদিকে শোগুন রাজদরবারে আশ্বাস দিয়ে ছিলেন যে, খুব শীঘ্র প্রস্তিতি সম্পূর্ণ হলেই বিদেশীদের জাপান থেকে বিতাড়ন করা হবে। অন্যদিকে বিদেশীদের তিনি আশ্বস্ত করেছিলেন যে পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ হলেই শীঘ্র চুক্তিগুলিকে কার্যকর করা হবে। যাইহোক ১৮৬৩ -৬৪ খ্রিষ্টাব্দে অল্প সময়ের মধ্যেই সাৎসুমা ও চোসু গোষ্ঠীর সাথে জড়িত দুটি ঘটনার প্রেক্ষিতেই জাপান সম্রাট জাপানের 'সোকোকু' (Sakoku) বিদেশনীতি অব্যহত রাখার দাবিতে অক্ষুন্ন থাকতে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে জাপানীদের বিদেশি বিরোধীতা যখন চরমে ওঠে তখন ঐ

বছরই সাৎসুমা গোষ্ঠীর সামুরাইরা চার্লস লেনক্স রিচার্ডসন (Charles Lenox Richardson) নামে জনৈক ব্রিটিশ নাগরিককে হত্যা করে। ব্রিটিশ সরকার এই হত্যাকান্ডের জন্য তৎক্ষনাৎ ক্ষতিপূরণ দাবি করে। কিন্তু সেই সময় শোগুন অর্থসংকটে থাকায় তাঁর পক্ষে এই দাবি পূরণ করা সম্ভব হয় নি। ইতিমধ্যয়ে ব্রিটিশ বাহিনী রিচার্ডসন হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার লক্ষ্যে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সাৎসুমা গোষ্ঠীর প্রধান কার্যালয় কাগোশিমার উপর গোলাবর্ষন করে।

টিপ্পনী

জাপ সম্রাট কোমেই (Komei 1846 - 1867) ১৮৬৩ খ্রিঃ এর শুরুর দিকে একটা রাজকীয় আদেশনামা জারি করে শোগুনকে সমস্ত বিদেশীকে দেশ থেকে বিতাড়ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর চাপে শোগুন শেষ পর্যন্ত বিদেশীদের বিতাড়নের জন্য এক গোপন আদেশনামা জারি করেছিলেন। কিন্তু এই আদেশনামা কার্যকর হওয়ার আগেই চোসুগোষ্ঠীর প্রধান তার সেনাবাহিনীকে শিমেনোসেকি প্রণালী বিদেশীদের কাছে রুদ্ধ করে দেওয়ার এবং যদি কোন বিদেশী জাহাজ এর মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে তার উপর গোলাবর্ষন করার নির্দেশ দেন। এরপ্রেক্ষিতে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে জাপানীরা যখন এক বিদেশী বাণিজ্য জাহাজের উপর বোমাবর্ষন করে তখন আমেরিকা তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জাপানীদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও মার্কিন বাহিনী যৌথভাবে আক্রমণ চালিয়ে শিমোনো সেকি শহরের উপর বোমাবর্ষণ করে।

এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমত, বিদেশিদের অস্ত্রশক্তির উৎকর্ষতা এবং জাপানের নিকৃষ্টতা প্রকট হয়েছিল। এছাড়া জাপানী গোষ্ঠীগুলির বিদেশী বিরোধী মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল। দ্বিতীয়ত, টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের সামরিক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল এবং এরপর শোগুনের পক্ষে তাঁর সামন্ত অনুগতদের উপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা কিংবা বিদেশীদের আগ্রাসন থেকে নিজেকে রক্ষা সম্ভবপর ছিল না। তৃতীয়ত ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশরা প্রস্তাব দেয় যে, যদি জাপ সম্রাট সন্ধি চুক্তিগুলিকে অণুমোদন করেন তাহলে যৌথশক্তি শিমোনোসকি প্রনালির যুদ্ধের পর জাপানের কাছে যে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল তা কিছুটা হ্রাস করবে। বলাবাহুল্য, জাপ সম্রাট ব্রিটিশদের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে জাপানীরা কঠোর বিদেশী বিরোধী মানসিকতা বর্জন করে বিদেশীদের সাথে সহযোগীতার মনোভাব গড়ে তুলেছিল।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
113

ইতিমধ্যে জাপানের আভ্যন্তরীন পরিস্থিতিরও ক্রমশ পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে চোসু ও সাৎসুমা গোষ্ঠী পারস্পরিক মিত্রতা ত্যাগ করে এবং বিদেশী শক্তিবর্গেদর সাথে নিজেদের সম্পর্কের নউন্নতির চেষ্টা করতে থাকে। তাদেদর লক্ষ্য ছিল বিদেশীদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে নিজেদের সামরিক বাহিনীকে আধুনিক ও শক্তিশালী করা। এছাড়া এই গোষ্ঠীগুলির নেতৃস্থানীয়

টিপ্পনী

আধিকারিকরা অন্যাণ্য কিছু রাজকর্মচারী এবং রাজদরবারের এক অভিজাত গোষ্ঠীর সাথে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে জাপানের রাজনৈতিক দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে যা জাপানের রাজনৈতিক বিক্ষোভ কে পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছিল। প্রথমত, এই সময় জাপ সম্রাট কোমেই এর মৃত্যু হয় এবং তাঁর চোদ্দ বছরের পুত্র যুবরাজ মুৎসুহিতো (Prince Mutsuhito) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দ্বিতীয়ত, টোকুগাওয়া যোশিনোবু পঞ্চদশতম শোগুন হিসাবে অভিষিক্ত হন।

নতুন শোগুন ফরাসীদের সহায়তায় জাপানের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের একটা শেষ প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। অন্যদিকে নতুন সম্রাটের সিংহাসন আরোহন সাৎসুমা ও চোসুর মত গোষ্ঠীগুলির কাছে শোগুনতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার একটা সুযোগ তৈরি করেছিল। তবে তোসা (Tosa) গোষ্ঠীর মত ভাইমোরা যারা একইসাথে শোগুনতন্ত্র ও নিজেদের ক্ষমতাকে সুরক্ষিত রাখতে চেয়েছিল, তারা এই সময় রাজদরবারের ঘনিষ্ট সহযোগীতায় একটা রক্ষণশীল দল গঠন করার প্রচেষ্ঠা করেছিল। বলাবাহুল্য, তোসা গোষ্ঠীর ডাইমো শোগুনকে ডাইমো পরিষদের কথা বিবেচনা করে সম্রাটের অধীনে একত্রে কাজ করার জন্য পদত্যাগের কথা বলেছিলেন এবং তার সাথে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, টোকুলাওয়া প্রধান এর সম্পত্তি ও ক্ষমতা বজায় থাকবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে সাৎসুমা, চোসু, তোসা ও হিজন গোষ্ঠীর ডাইমোরা যৌথভাবে একটা স্মারকলিপি শোগুনকে পেশ করে। এই স্মারকপত্রে তারা শোগুনকে পদত্যাগ করে সব প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্রাটকে ফিরিয়ে দিতে বলেছিল। বাইরের বিদেশীদের কাছ থেকে জাপানের প্রভূত বিপদের আশঙ্কা করে টোকুগাওয়া গোষ্ঠীর শক্তিশালী শাখাগোষ্ঠীগুলিও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিল। এরই প্রেক্ষিতে শোগুন টিওকুগাওয়া যোশিনোবু পদত্যাগ করেছিলেন। এইভাবে টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটেছিল ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে।

সম্রাটের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর আশা করা হয়েছিল যে সকল গোষ্ঠী সমতার ভিত্তিতে রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভের অধিকারী হবে। টোকুগাওয়া যোশিবাবু নিশ্চিত ছিলেন যে সম্রাট তাঁকেই মুখ্য পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করবেন। কিন্তু সাৎসুমা ও চোসু গোষ্ঠীর কাছে এটা অভিপ্রেত ছিল না। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল সম্রাটকে এহেন সিদ্ধান্ত গ্রহনে বিরত রাখতে। কারণ প্রথমত তারা টোকুগাওয়া গোষ্ঠীকে পচ্ছন্দ করত না, দ্বিতীয়ত, তাদের নিজেদেরই ক্ষমতা লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তৃতীয়ত, তারা সম্রাটের সমর্থক হলেও তাদের বিদেশী বিরোধী মনোভাব তখনও বলবৎ ছিল। ফলতঃ এই গোষ্ঠীদ্বয় টোকুগাওয়া গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সম্পত্তি গ্রাস করতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল।

১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ৩ জানুয়ারী উগ্রপন্থী সাৎসুমা ও চোসু নেতারা কিয়োটো তে অবস্থিত শোগুনের প্রাসাদ আক্রমণ করে এবং সম্রাটের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রাক্তন শোগুণ এই গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্ত নেন। শোগুনতন্ত্রের সমর্থকরা শোগুনকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এর ফলে জাপানে এক গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। এই গৃহযুদ্ধ 'বেসিন যুদ্ধ' (Bashine War) নামে পরিচিত। এই গৃহযুদ্ধে শোগুন সমর্থকদের পরাজয় ঘটে এবং টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের পতন সম্পূর্ণ হয়। শেষ টোকুগাওয়া শোগুন এদো (Edo) তে আত্মসমর্পন করেন এবং পরে তিনি এজো (Ezo) তে নির্বাসিত হন। এইভাবে জাপানে মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা সামরিকভাবে সম্পূর্ণ হয়েছিল।

টিপ্পনী

অগ্রগতির পরিমাপ কর :

১৮. জাপান কবে প্রথম প্রাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে এসেছিল ?

১৯. ম্যাথেই পেরি কে ছিলেন ? তিনি জাপানকে কি করতে বাধ্য করেছিলেন ?

২০. হ্যারিস চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ?

২১. আনসেই পঞ্চ-শক্তি চুক্তি সমুহের তিনটি শর্ত উল্লেখ কর।

২.৮. সংক্ষিপ্তসার :

- ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল। এই শিল্পবিপ্লবের পিছনে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভৌগলিক অবস্থানগত সুবিধা, আভ্যন্তরীন শান্তি ও সহনশীল পরিবেশ, প্রোটেস্ট্যান্ট তত্ত্ব, ব্যবসায়ী চেতনা, অনুকূল অর্থনৈতিক অবস্থা, মূলধনের প্রাচুর্য, প্রাকৃতিক সম্পদের সহজলভ্যতা, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও আবিস্কার, কৃষি বিপ্লব এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
- ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব প্রথম অনুভূত হয়েছিল বস্ত্রশিল্পে। সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডে কৃষিজাত শিল্পের পরেই বস্ত্রশিল্প ছিল সবচেয়ে বড় শিল্প।
- শিল্প বিপ্লবের সময় বস্ত্রবয়ন ও সুতো কাটার জন্য নানা ধরনের নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই যন্ত্রগুলির মধ্যে ছিল উড়ন্ত মাকু, স্পিনিং জেনী, ওয়াটার ফ্রেম এবং স্পিনিং মিউল।
- সুতো কাটার পর কারাখানাতে বস্ত্রবয়ন শুরু হয় ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এডমন্ড কার্টরাইট এর 'পাওয়ার লুম' বা জলশক্তি চালিত তাঁত আবিস্কারের পর। বলাবাহুল্য, কার্টরাইট ছিলেন একাধারে কবি ও পন্ডিত। কিভাবে কাপড় বোনা হয় তা না দেখেই তিনি তাঁর যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ২০ টি তাঁত যন্ত্র নিয়ে একটি কারখানা স্থাপন করেছিলেন। প্রথমে এই তাঁতগুলি চালনায় যন্ত্রশক্তির ব্যবহার করা হত। কিন্তু ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এক্ষেত্রে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ব্যবহার

টিপ্পনী

করেন।

- কার্টরাইট এর যন্ত্রকে উন্নত করেছিলেন র‍্যাডক্লিক, যিনি ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে ড্রেসিং মেশিন উদ্ভাবন করেছিলেন। এছাড়া হরোকস্ এর ব্যাপারে অবদান ছিল। কারণ তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি পাওয়ার লুমের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করেছিলেন। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনে ২৪০০ পাওয়ার লুম ছিল। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ১০০০০০ এবং ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ২৫০০০০। ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে এলি হুইটনি 'কটন জিন' আবিষ্কার করেছিলেন। এই যন্ত্র দ্রুত তাঁত থেকে তুলোর গোছা পরিস্কার করে দিতে পারত। এরফলে বস্ত্রবয়নের ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল।
- ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনে লোহার বাৎসরিক উৎপাদন ছিল প্রায় ২০০০ টন। কিন্তু ব্রিটেনে লোহার চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং লোহার উৎপাদন চাহিদার ক্রমশ হ্রাস পাচ্চিল তবে ব্রিটেনে আকরিক লোহার প্রাকৃতিক ভান্ডার ছিল প্রচুর। কিন্তু সেগুলি উৎখনন করা হয় নি। বলাবাহুল্য, ব্রিটেনে আকরিক লোহা উৎখনিত না হওয়ার পিছনে মূল কারণ ছিল লোহা গলানোর জন্য প্রয়োজণীয় জ্বালানীর অভাব। ব্রিটেনে লোহা গলানোর জন্য মূলত : জ্বালানী হিসাবে কাঠকয়লার ব্যবহার করা হত। আচর এই কাঠকয়লার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠদ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল।
- সপ্তদশ শতকে লোহা উৎপাদনের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হত তাতে প্রথমে কাঠকয়লা চালিত ব্লাষ্ট ফার্নেস বা চুল্লিতে আকরিক লোহা ঢালা হত এবং তারপর জলশক্তি চালিত বড় হাপর দিয়ে প্রবলবেগে বাতাস করে চুল্লির তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে লোহা গলানো হত। এই পদ্ধতিতে লোহা গলাতে ১৪ দিন সময় লাগত এবং শেষে গলিত লোহা হয় ছাঁচে ফেলা হত নয় বালির খালে জমা করা হত।
- লোহা গলানোর জন্য কাঠকয়লার পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানী অনুসন্ধানে প্রথম সফল হয়েছিলেন আব্রাহাম ডার্বি নামে স্রপশায়ারের এক ব্যাক্তি। তিনি ১৭০৯ খ্রিষ্টাব্দে চুল্লিতে পিগ আয়রন বা গলিত লোহা উৎপাদনের জন্য কাঠকয়লার বদলে কোক (coke) ব্যবহার করের পদ্ধতি আবিষ্কার করছিলেন। তবে ১৭৫০ এর দশকের আগে এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় নি।
- অষ্টাদশ শতকে কয়লা শিল্পের বিকাশে নানাবিধ সমস্যা ছিল। লোহা গলানোর জন্য কোক ও কয়লার ব্যবহার কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি করেছিল। এছাড়া গৃহস্থালী ও অনান্য শিল্পেও কয়লা ব্যবহৃত হত। কিন্তু খনির ভেতর বায়ু চলাচলের সমস্যা ভুগর্ভে জল জমে যাওয়া এবং ভূগর্ভস্থ গ্যাসের বিষ্ফোরণের সমস্যার জন্য খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের কাজ ছিল অত্যন্ত বিপদজনক।
- ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে জল জমে যাওয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য একধরনের বাষ্পচালিত

পাম্প আবিষ্কার করেছিলেন। যদিওন এই যন্ত্রটির যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল না। তবে টমাস নিউকোমেন এর 'Atmospheric' স্টিম পাম্প অনেক বেশী কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু এই যন্ত্রটি চালনায় অনেক জ্বালানী প্রয়োজন হওয়ায় একটা অসুবিধা তৈরি হয়েছিল।

- জেমস ওয়াট ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে নিউকোমেনের যন্ত্রের জ্বালানী অপচয়ের সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করেছিলেন এবং এরই প্রেক্ষিতে ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাষ্পশক্তির সাহায্যে যন্ত্র চালনার এক উন্নত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন।
- কয়লা খনিতে বায়ুচলাচলের ত্রুটি ও গ্যাস বিস্ফোরণের সমস্যা সমাধানের জন্য 'Exhant Fan' আবিষ্কার করা হয়েছিল। জন বাডেল নামে এক ব্যাক্তি এটি আবিষ্কার করে ছিলেন।
- শিল্প বিপ্লবের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ব্যবসা ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা। শিল্প বিপ্লবের ফলেই ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা - বাণিজ্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এর প্রেক্ষিতেই ব্রিটেনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিশ্ববাজারকে দখল করার জন্য ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ। সর্বপরি শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনের অগ্রগতি পরিমাপ করলে দেখা যায় যে এর প্রেক্ষিতে ব্রিটেনে কেবলমাত্র জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় নি, তার সাথে সামাজিক মর্যাদার অগ্রগতি ঘটেছিল।
- শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষিতে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক বৃদ্ধি পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকে জরুরী করে তুলেছিল। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতি টমাস টেলফোর্ড রাস্তা ও সেতু নির্মাণে বিশিষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি ১২০০ সেতু এবং ১০০০ মাইল রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন।
- স্কটিশ ইঞ্জিনিয়ার জন ম্যাকাডেম ও পরিবহন বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য ১৮১১ তে জন ম্যাকাডেম পীচ দিয়ে রাস্তা নির্মানের কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, যা 'Macadamisation' নামে পরিচিত।
- শিল্প বিপ্লব চিরাচরিত সমাজে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এর ফলে যে পরিবর্তনগুলি এসেছিল, তা হল - ১. ব্যাপক ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি, ২. শিল্প শ্রমিক শ্রেনীর উত্থান ও বিকাশ, ৩. নতুন আবিষ্কার, ৪. জনসাধারণের অভিপ্রায়ন প্রভৃতি।
- আমেরিকা বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে লেক্সিংটনের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এবং পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসের চুক্তি দিয়ে।
- জনলক (১৬৩২ - ১৭০৪)এর উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গভীরভাবে আমেরিকার বিপ্লবকে অণুপ্রানিত করেছিল। বলাবাহুল্য ১৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত প্রকাশিত গ্রন্থমালায় লক যে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছিলেন তা তাঁর উত্তরসূরী জ্যাক রুশো (১৭১২ - ১৭৭৮) কে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

- আমেরিকাবাসীরা মনে করত অভিজাততন্ত্র ও ঔপনিবেশিকদের সঙ্গেই দুর্নীতি জড়িয়ে থাকে। আর এই দুর্নীতিই তাদের কাছে স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। সেই সময় যেসব বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ প্রজাতান্ত্রিক আদর্শকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁরা হলেন স্যামুয়েল অ্যাডামাস্, জর্জ ওয়াশিংটন, টমাস পেইন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এবং টমাস জেকারসন।
- আমেরিকার স্বাধীনতা ওযুদ্ধের জন্য যেসব বিষয় দায়ী ছিল তা হল - ১. ফরাসী ও ভারতীয় যুদ্ধ, ২. পোনটিয়াক এর বিদ্রোহ, ৩. ব্রিটেনের সক্রিয় নীতি, ৪. প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই কর আরোপ, ৫. বোষ্টন টি পার্টি প্রভৃতি।
- আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৭৮৩ খ্রিঃ এ সেপ্টেম্বর মাসে। এই সময় প্যারিসের শান্তি বৈঠকে ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাস্ট্র, ফ্রান্স ও স্পেন আলাপ আলোচনার জন্য সমবেত হয়েছিল। এখানেই প্যারিসের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল। এই চুক্তিতে পশ্চিমী শক্তির অধিকৃত সকল এলাকা আমেরিকাবাসীদের হাত তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রকে এক সাম্প্রতিক, নতুন এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ সেনার শেষ দলটি নিউইয়র্ক ত্যাগ করে এবং সেই মাসেই আমেরিকার সরকার নতুন রাষ্ট্রের সকল নিয়ন্ত্রণ হাতে পায়।
- আমেরিকার বিপ্লবের সাফল্যে আমেরিকার ১৩ টি উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এই রাজ্যগুলি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করলে নতুন সংবিধান রচনা করা হয় এবং সনদও গ্রহণ করা হয়।
- ষোড়শ শতাব্দী থেকে আমেরিকায় দাসপ্রথার প্রচলন হয়। দাস ব্যবসার প্রথম সূচনা করে জণৈক ওলন্দাজ বণিক। ষোড়শ শতাব্দীতে এই বণিকটি মাত্র কুড়িজন নিগ্রোকে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে ধরে নিয়ে এসে আমেরিকার জেমস টাউনে বিক্রি করে। তবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিপ্লবের সময় কিছু আমেরিকান রাষ্ট্র দাস প্রথার বিরোধীতা করেছিল।
- অষ্টাদশ শতকে গ্রেট ব্রিটেন দাস ব্যবসার মাধ্যমে আর্থিক দিক দিয়ে বেশ লাভ করেছিল। ট্রাস -আটল্যান্টিক দাস ব্যবসা, যা ত্রিকৌনিক দাস ব্যবসা হিসাবে পরিচিত ছিল; তিনভাবে পরিচালিত হত : আফ্রিকার ক্রীতদাসদের বিনময় হত ইউরোপীয় পণ্যের সাথে, আমেরিকান কৃষকরা আফ্রিকার দাস ক্রয় করত এবং উৎপাদিত ফসল ইউরোপের ভোগের জন্য রপ্তানি করা হত।
- সপ্তদশ -অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে দাসপ্রথার বহুল প্রচলন ছিল এবং খুব কম সংখ্যক মানুষই এর বিরোধীতা করত। ব্রিটেনে দাস ব্যবসার ভালো কদর ছিল,

কারণ এর ফলে দেশের আয় বাড়ছিল।

- ইংল্যান্ডের টমাস ক্লার্কসন (১৭৬০ - ১৮৪৬) ছিলেন দাস প্রথার চরম বিরোধী। তিনি এবং দাসপ্রথা উচ্ছেদের আর এক সমর্থক গ্রেনভিল শর্প ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে যৌথ প্রচেষ্টায় গঠন করেছিলেন "Association for the Elemination of the slave Trade) নামে একটি সংগঠন। এঁরা দুই জনেই সহস্রাধিক নাবিকের সাথে সাক্ষাৎকার করে দাসদের দুরাবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এমনকি তাঁরা পার্লামেন্টে দাস প্রথার অবসানের ব্যাপারে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পার্লামেন্টের সদস্য উইলিয়াম উইলবার কোর্স এর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন।

- 'Society for the Abolition of Slave Trade' সংগঠন প্রতিষ্ঠার কুড়ি বছর পর দাসপ্রথার অবসানে সমর্থন কারীদের নিরলস প্রচেষ্টা কিছুটা ফলপ্রসূ হয়েছিল। কারণ, ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে দাসব্যবসা বন্ধের জন্য আইন ('Slave Trade Act') পাশ করা হয়েছিল। এই আইনে ট্রান্স আটল্যান্টিক দাস ব্যবসায় ব্রিটেনের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হয়েছিল। প্রসঙ্গত, দাসব্যবসা আইন শুধুমাত্র দাসব্যবসা নিষিদ্ধ করেছিল কিন্তু দাসপ্রথার অবসান ঘটায় নি। তবে এই আইনে দাসপ্রথাকে বৈধ বলেও উল্লেখ করা হয় নি। যাইহোক, এরপর দাসপ্রথা বিলোপপন্থীদেদর দীর্ঘ সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে এলিজানবেথ হেরিক (১৭৫৯ - ১৮৩১) 'Immediate not Gradual Abolition' শীর্ষক প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে দ্রুত দাস প্রথার অবসানের দাবি জানিয়েছিলেন।

- গ্রেট ব্রিটেনে দাস প্রথার অবসানের পর আমেরিকাতেও দাসপ্রথা অবসান আন্দোলনে গতি এসেছিল। এতদিন যে আন্দোলনে মন্থরভাব ছিল তার মধ্যে হঠাৎ তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। দাস প্রথার সাথে ধর্মীয় আবেগ যুক্ত করে তাকে একধরণের অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া আরও বলা হয় যে, আমেরিকায় দাস প্রথা বজায় রেখে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' কে অবমাননা করা হয়েছে। এইসব বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিয়েই আরও অধিকতর উৎসাহী দাসপ্রথা উচ্ছেদে সমর্থনকারী কর্মীদল চিরাচরিত ভাবে দাসপ্রথার ক্রম অবসানের পরিবর্তে দ্রুত অবসানের পন্থা অবলম্বন করে।

- ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে ডেভিড ওয়াকার এর 'A Request to the Coloured Natives of the World' শীর্ষক 'আপীল' বা আবেদনপত্রে দাসপ্রথা বিলোপের এক নতুন উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত, ডেভিড ওয়াকার ছিলেন একজন মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ, তাঁর জন্ম হয়েছিল উত্তর ক্যারোলিনায়, পরবর্তী কালে তিনি বোষ্টনের এক পুরনো জামা কাপড়ের দোকানের মালিক হয়েছিলেন। যাইহোক, তিনি তাঁর 'আপীল' বা আবেদনপত্রে সমস্তরকম কম বৈষম্য ও জাতপাতগত কুসংস্কারের নিন্দা করে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ছিলেন এবং দাসপ্রথার অবসানের জন্য সকল কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকাবাসীদের সংগঠিত হতে ও প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের কথাও বলেছিলেন।

- ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হবার পর দৃঢ়ভাবে দাসপ্রথার বিরোধীতা করেছিলেন।
- সপ্তম শতকে চীনে আফিমগাছ আমদানি করেছিল তুর্কি ও আরব বণিকেরা। প্রথমদিকে চীনারা মুখ্যত ওষুধ হিসাবে আফিমের ব্যবহার করত। কিন্তু এর কয়েক শতাব্দী পরেই চীনের ধনী পরিবারের মানুষেরা আফিমকে নেশার সামগ্রি হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। তবে এই আফিমের নেশা ধীরে ধীরে চীনের স্বচ্ছল পরিবারের মানুষের গ্রাস করতে শুরু করলে তা চীনা সরকারের উদ্বিগ্নের কারণ হয়ে ওঠে। মানুষের শরীর ও মনের উপর আফিমের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা জানতে পেরে চীনা সম্রাট Young Zheng (১৭২২ - ১৭৩৫) ১৭২৯ ক্রিষ্টাব্দে এক রাজকীয় আদেশনামা জারি আফিম বিক্রি ও সেবনের উপর নিষেধাজ্ঞাআরোপ করে ছিলেন।
- ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইঙ্গ-চীন বাণিজ্যিক সম্পর্ক চীনের অনুকূলেই ছিল। ব্রিটিশ বণিকরা মূলত চীনা সিল্ক ও চা কিনত। বস্তুত অষ্টাদশ শতকে ব্রিটেনে চা এর কদর অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল, ফলত : চীন থেকে চা আমদানির উপর ব্রিটেন বহুলাংশে নির্ভরশীল হবে পড়েছিল। অন্যদিকে চীনে বিদেশী পণ্যের বিশেষ চাহিদা ছিল না। এরই প্রেক্ষিতে ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল যে, এই একপেশে বাণিজ্যে দেশের রৌপভান্ডারের ক্রম নিষ্কাশন ঘটছে এবং এতে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাই ব্রিটিশরা চীনের সাধে বাণিজ্যক ভারসাম্য গড়ে তুলতে এবং এই বাণিজ্যক নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য ভয়ঙ্কর নেশাজাত দ্রব্য আফিমকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার পন্থা গ্রহণ করেছিল।
- ১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগীজ বণিকেরা জাপানে এসেছিল এবং এর মধ্য দিয়েই জাপান প্রথম পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে আসে। এরপর স্পেনীয় ও ওলন্দাজ বণিকেরা বাণিজ্যের জন্য নিয়মিত জাপানে আসতে শুরু করেছিল। টোকুসাওয়া শোগুন তন্ত্রের যুগ জাপান এই বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে বেশ লাভবান হয়েছিল।
- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগের পদস্থ কর্মচারী কমোডর ম্যাথু পেরির তৎপরতায় পশ্চিমের পক্ষে জাপানকে উন্মুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল। বলাবাহুল্য, পেরি ১৮৫৪ খ্রিঃ এ সামরিক শক্তির জোরে জাপানকে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করে বৈদেশিক বাণিজ্যয়ের জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন।

২.৯. শব্দপরিচিতি :

শিল্প বিপ্লব : অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার এবং

উৎপাদনক্ষেত্রে তা প্রয়োগের ফলে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মানের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়, তা শিল্প বিপ্লব নামে খ্যাত। অষ্টাদশ শতকে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয় ইংল্যান্ডে এবং সেখান থেকেই বিশ্বে অনান্য জায়গায় শিল্প বিপ্লবের প্রসার ঘটেছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ : এই যুদ্ধ ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল এবং এই যুদ্ধে আমেরিকার ঔপনিবেশিকরা জয়ী হয়ে ব্রিটিশদের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছিল।

প্যারিসের চুক্তি : আমেরিকার বিপ্লবের পরিসমাপ্তিতে ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে এই উক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

দাসপ্রথার অবসান (Abolitionism) : পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় দাস প্রথা অবসানের জন্য আন্দোলন চলেছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমে অমানবিক দাস ব্যবসা ও দাস প্রথা বিলোপের দাবি উত্থাপিত হয়েছিল।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ : ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকান ইউনিয়ন ও দক্ষিণের রাষ্ট্রসংঘ এর মধ্যে যে যুদ্ধ চলেছিল, তাই আমেরিকার গৃহযুদ্ধ নামে পরিচিত।

আফিম : আফিম একধরণের লালচে - বাদামী বর্ণের উগ্র গন্ধযুক্ত নেশাজাত মাদকদ্রব্য, যা মুখ্যত ব্যাথা উপশমকারি ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে। চীনে এই আফিম নেশার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং এর জন্য ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ঊনবিংশ শতকে।

আফিম যুদ্ধ : বাণিজ্যক অধিকারকে কেন্দ্র করে ব্রিটেন ও চীনের মধ্যে সংঘটিত দুটি যুদ্ধ।

২.১০. উত্তরের সাহায্যে অগ্রগতির পরিমাপ :

১. ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হওয়ার পেছনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল -

(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধি : ইংল্যান্ডে বসবাসের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং তার সাথে সপ্তদশ অসষ্টাদশ শতকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নতি ইংল্যান্ডের মৃত্যুহার কমিয়ে দিয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে ইংল্যান্ডে অতিরিক্ত খাদ্য, পণ্যসামগ্রী, আবাস্থল এবং জ্বালানীর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য ইংল্যান্ডে উৎপাদন বৃদ্ধিও জরুরি হয়ে পড়েছিল। এইভাবে ইংল্যান্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ইংল্যান্ডে শ্রমিকের জোগানও সহজলভ্য হয়েছিল।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

(খ) ভৌগলিক অবস্থানগত সুবিধা : ইংল্যান্ডের কোন অঞ্চলই সমুদ্র থেকে ৭০ মাইলের বেশি দূরে ছিল না। উপকূল এলাকায় জাহাজ চলাচলের অনুকূল পরিবেশ ছিল। এছাড়া প্রাক্ শিল্প বিপ্লব যুগে ইংল্যান্ডে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকলেও আলোচ্য সময়ে তার উন্নতি ঘটেছিল। ফলে পূর্বে ইংল্যান্ডে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পন্য চলাচলে যেটুকু অসুবিধা ছিল তা শীঘ্রই দূরীভূত হয়েছিল।

২. জন কে ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে উড়ন্ত মাকু আবিষ্কার করেছিলেন।

৩. শিল্প বিপ্লবের ফলে যে পরিবর্তনগুকলি এএসেছিল, তার মধ্যে চারটি হল -

(ক) ব্যাপকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি।

(খ) জনসংখ্যার স্থানান্তর।

(৩) শিল্প শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান ও বিকাশ।

(৪) শিল্পী ও কারিগরের পুনর্মিলন।

৪. ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে লেক্সিংটনের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরিকার বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল।

৫. যে তিনজন ব্যাক্তি প্রজাতান্ত্রিক আদর্শকে সমর্থন করেছিলেন তারা হলেন -

(ক) জর্জ ওয়াশিংটন

(খ) বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

(গ) টমাস জেকারসন।

৬. পোনটিয়াক ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী ওট্টাওয়া (Ottwa) সর্দার। তিনি আগ্রাসী শ্বেতাঙ্গদের উপজাতি অঞ্চল দখলের বিরোধী ছিলেন। বলাবাহুল্য, তিনি উত্তপ্ত ওহিও উপত্যাকার বিভিন্ন উপজাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ্য করে ব্রিটিশ দূর্গ ও আমেরিকান বসতগুলির উপর পর্যায়ক্রমে আক্রমণ চালিয়েছিলেন।

৭. ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসের চুক্তিতে আনুষ্ঠনিকভাবে 'স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র' এর স্বীকৃতি দানের মধ্যে দিয়ে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল।

৮. ট্রাস আটল্যান্টিক দাসব্যবসা ত্রিকৌনিক দাস ব্যবসা হিসাবে পরিচিতি ছিল। এই ব্যবসা তিনভাবে পরিচালিত হত আফ্রিকার ক্রীতদাসদের বিনিময় হত ইউরোপীয় পণ্যের সাথে, আমেরিকান কৃষকরা আফ্রিকার দাস ক্রয় করত এবং উৎপাদিত ফসল ইউরোপে ভোগেদর জন্য রপ্তানি করা হত।

৯. ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ভার্মন্ট প্রথম রাষ্ট্র হিসবে দাসপ্রথার অবলুপ্তি ঘটিয়েছিল।

১০. ডেভিড ওয়াকার ছিলেন একজন মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ। তাঁর জন্ম হয়েছিল উত্তর ক্যারোলিনা তে। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে ডেভিড ওয়াকারেদর 'A Rquest to the coloured Natives of the World' শীর্ষক আবেদনপত্রে দাসপত হয়েছিল।

ডেভিড তাঁর এই 'আপীল' বা আবেদনপত্রে সমস্তরকম বৈষম্য ও জাতপাতগত কুসংস্কারের নিন্দা করেছিলেন এবং দাসপ্রথার অবসানের জন্য সকল কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকাবাসীদের সংগঠিত হতে ও প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের কথাও বলেছিলেন।

১১. দাসপ্রথা বিলোপ পন্থীরা আমেরিকায় দাসপ্রথা অবসানের জন্য নানাবিধ কৌশল ও পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁরা দাসপ্রথা বিরোধী মানসিকতা সম্পন্ন মানুষদের নিয়ে দল তৈরি করে একজোট দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। American Anti -Slavery Society-র মত দলগুলি প্রাথমিক কৌশল হিসাবে বক্তৃতা ও মানুষের মধ্যে দাসপ্রথা বিরোধী প্রত্যয় উৎপাদনকে বেছে নিয়েছিল।

১২. ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ১২ এপ্রিল সামটার দূর্গ আক্রমনের মধ্য দিয়ে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল এবং যা চলে ছিল পরবর্তী চারবছর অর্থাৎ ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

১৩. জেকারসন ডেভিস রাষ্ট্রসংঘের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন । কিন্তু ডেভিসের মধ্যে লিঙ্কনের মত রাজনৈতিক নমনীয়তা ও সাধারণ বোধের অভাব ছিল। এই অক্ষমতার ফলেই তিনি রাষ্ট্রসংঘের সঠিক নেতৃত্বদানে ব্যর্থ হয়েছিলেন । বলাবাহুল্য, ডেভিস সাধারণ মানুষের কাছে যুদ্ধের যৌক্তিকতা সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেন নি।

১৪. ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে চীনা সম্রাট Yong Zheng (১৭২২ - ১৭৩৫) এক রাজকীব আদেশনামা জারি করে আফিম বিক্রি ও সেবনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন । শুধুমাত্র ওষুধ তৈরির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ আফিম ব্যবহার মঞ্জুর করা হয়েছিল।

১৫. ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানী ভারতবর্ষে আফিম উৎপাদনে একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল। কোম্পানী নিজশর্তাবলীতে ভারতীয় কৃষকদের আফিম চাষে বাধ্য করত।

১৬. প্রথম আফিম যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের স্থায়িত্ব ছিল ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে জুনে ব্রিটিশ নৌবহরের আগমণ থেকে ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারীতে চুয়েনপি কনভেনশন স্বাক্ষর পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে যুদ্ধ ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রেবরুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল চার্লস এলিয়টের প্রত্যাবর্তন এবং ১৮৪১ খ্রিঃ এ আগস্ট মাসে হেনরি পটিংগারের আগমের মধ্য দিয়ে।

১৭. প্রথম আফিম যুদ্ধেদর পচর ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ আগস্ট চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত নানকিং চুক্তি ছিল প্রথম অসম চুক্তি।

১৮. ১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগীজ বণিকেরা জাপানে এসেছিল এবং এর মধ্য দিয়েই জাপান প্রথম পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে এসেছিল।

১৯. ম্যাথু পেরি ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর কমোডর । তিনি ১৮৫৪

টিপ্পনী

খ্রিষ্Taব্দে সামরিক শক্তির জোরে জাপানকে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করে বৈদেশিক বানিজভের জন্য উন্মুক্ত করেছিল।

২০. হ্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল ১৮৫৮ খ্রিঃ এ ২৯ জুলাই।

২১. আনমেই পঞ্চশক্তি চুক্তি'র তিনটি মুখ্য শর্ত ছিল -

টিপ্পনী

বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে জাপানের যে বন্দরগুলি উন্মুক্ত করা হয়েছিল তার সাথে আরও পাঁচটি বন্দর (এদো, কোবে, নাগাসাকি, নিগাতা, ও ইয়োকোহামা) উন্মুক্ত করা হবে।

আন্তর্জাতিক নিবমে আমদানি রপ্তানি শুল্ক নির্ধারণ করা হবে।

উন্মুক্ত বন্দরগুলিতে বিদেশী নাগরিকরা বসবাস ও স্বাধীনভাবে বণাণিজ্য করার (আফিম ব্যবসা ছাড়া) অধিকার পাবে।

২.১১. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১. শিল্প বিপ্লব প্রথম ইংল্যান্ডে শুরু হবার কারণগুলি লেখ।

২. লৌহ ও কয়লা শিল্প কি ওশিল্প বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ? শিল্প বিপ্লবের ফলে কি পরিবর্তন এসেছিল, তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩. প্যারিসের চুক্তি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪. আমেরিকা যুদ্ধের তাৎপর্য কি ছিল ?

৫. দাসপ্রথা বলতে কি বোঝ ? দাসপ্রথা অবসান আন্দোলনের উৎস আলোচনা কর।

৬. দাসপ্রথার উচ্ছেদে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা কি ছিল ?

৭. ইঙ্গ - চীন বাণিজ্যক সম্পর্ক আলোচনা কর।

রচনাভিত্তিক প্রশ্নোত্তর :

১. শিল্প ওবিপ্লব বস্ত্রবয়ন শিল্পে বিপ্লব ঘটিয়েছিল - উদাহরণের সাহায্যে ইহা আলোচনা কর।

২. শিল্প বিপ্লবের ফলাফল বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

৩. আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ কবে এবং কেন শুরু হয়েছিল ?

৪. আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ আলোচনা কর।

৫. আমেরিকার গৃহযুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘ কেন ব্যার্থ হয়েছিল ? আলোচনা কর।

৬. প্রথম আফিম যুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ কি ছিল ? বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

৭. চীন এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সাথে অসম চুক্তি সমূহ কেন স্বাক্ষরিত হয়েছিল ? এই চুক্তিগুলির বিষয়বস্তু কি ছিল ?

৮. ঊনবিংশ শতকে জাপানের অগ্রগতি আলোচনা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তৃতীয় একক

ঊনবিংশ শতকে ফ্রান্স ও রাশিয়ার অগ্রগতি

টিপ্পনী

৩.০. ভূমিকা

৩.১. একক উদ্দেশ্য

৩.২. ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব : কারণ ও ফলাফল

৩.২.১. বিপ্লবের উদ্দেশ্য

৩.২.২. ইউরোপে বিপ্লবের প্রভাব

৩.৩. ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ফ্রেবরুয়ারী বিপ্লব : কারণ ও ফলাফল

৩.৩.১. বিপ্লবের ফলাফল

৩.৪. ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সে রাজনৈতিক অগ্রগতি

৩.৪.১. প্যারিস কমিউন

৩.৪.২ রাশিয়া : দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে আধুনিকীকরণ

৩.৫. সংক্ষিপ্তসার

৩.৬. শব্দপরিচিত

৩.৭. উত্তরের সাহায্যে অগ্রগতির পরিমাপ

৩.৮. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

৩.০. ভূমিকা

১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল ফরাসী রাজ দশম চার্লস এর নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। একইভাবে ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রেবরুয়ারী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল লুই ফিলিপের রাজতান্ত্রিক সরকারের উচ্ছেদ কল্পে। বলাবাহুল্য ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশই এই দুটি বিপ্লবে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। যদিও ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব বিরাট সাফল্য ছিল না, তৎসত্ত্বেও গ্রেট ব্রিটেনের সহায়তায় বিপ্লবীরা বেলজিয়াম সংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিল। ওগ্রেট ব্রিটেন ছাড়াও ফ্রান্স সহ অন্যান্য কিছু রাষ্ট্র বেলজিয়ামের নব্যগঠিত সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। একইভাবে প্রাশিয়া ও সার্ভিনিয়াতেও বিপ্লবীরা সফল হয়েছিল এবং সেখানে উদারনৈতিক সংবিধান হয়েছিল ও সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

টিপ্পনী

উল্লেখ করা জরুরী যে, ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গ ফ্রান্সের যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। অণ্যদিকে ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রেবরুয়ারী বিপ্লব সংগঠনের পিছনে মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক অসন্তোষ।

এই এককে ১৮৩০ এবং ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের কারণ ও গতিপ্রকৃতি আলোচনা করা হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের প্রেক্ষিতে ফ্রান্সে সামাজিক সাম্যের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে ১৮৪৮ খ্রিঃ এর ফ্রেবরুয়ারি বিপ্লব ফ্রান্সে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এছাড়া এই এককে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের প্যারিস কমিউন নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই প্যারিস কমিউন ছিল শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের আদি দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে অন্যতম। যার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকালে রাশিয়ার আধুনিকীকরনের বিষয়েও আলোচনা করা হবে। বলাবাহুল্য, দ্বিতীয় আলোকজান্ডার রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের জন্য খ্যাত হয়ে আছেন।

৩.১. একক উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠের পর যে বিষয়গুলি বোধগম্য হবে, তা হল -

- ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল।
- ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রেবরুয়ারী বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল।
- প্যারিস কমিউন
- রাশিয়ার আধুনিকিকরণে দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের ভূমিকা।

৩.২. ১৮৩০ খ্রিঃ এর জুলাই বিপ্লব : কারণ ও ফলাফল :-

১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব বা দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের সর্বজনবিদিত তাৎপর্য হল যে, এই বিপ্লব মানুষের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর কে মাত্রা দিয়েছিল। বলাবাহুল্য, জুলাই বিপ্লবের সময়কালে নানা গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল এবং সেগুলি ক্লাবে পরিণত হয়েছিল , যেখানে সরকারের ত্রুটিপূর্ণ শাসননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। অতঃপর ফ্রান্সে পলিগণ্যাক (Polignac) এর প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্তি এবং তাঁর স্বৈরাচারী ঘোষণা দেশে এক সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, যা কিছু দিনের মধ্যেই বিপ্লবের আকারে বিস্ফরিত হয়।

পলিগণ্যাকের মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকেই চেম্বার অব ডেটিস (নিম্নকক্ষ) এর সাথে নতুন মন্ত্রিসভার বিরোধ শুরু হয়েছিল। চেম্বার অব ডেপুটিস পলিগণ্যাক মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু ফরাসীরাজ এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং জানিয়ে দিবেছিলেন যে, তাঁর সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়। এছাড়া তিনি

এই চেম্বারকেই ভেঙে দিয়েছিলেন এবং নতুনভাবে ভেটের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটা চেম্বার গঠন করতে যা তাঁর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হবে। কিন্তু ভোটদাতাদের চিন্তাভাবনা ছিল আলাদা। তাই ভোটের ফল রাজা ও তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে গিয়েছিল এবং তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু ফরাসীরাজ দশম চার্লস বশ্যতা স্বীকারে রাজি ছিলেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল যে তাঁর ভ্রাতা ষোড়শ লুই সমর্পন করেছিলেন বলেই তাঁর এক মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছিল।

দশম চার্লস নিজ ক্ষমতা জারি করার জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বণ করেছিলেন, কিন্তু তা সব ব্যার্থ হয়েছিল। তাই শেষপর্যন্ত তিনি দমননীতির আশ্রয় নিতে বদ্ধপরিকর হন। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ জুলাই চার্লস চারটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এরদ্বারা (১) নবনির্বাচিত চেম্বার ভেঙে দেওয়া হয়, (২) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করা হব (৩) নির্বাচন বিধি সংশোধন করে নির্বাচকেদর সংখ্যা ১ লক্ষ থেকে হ্রাস করে ২৫ হাজার করা হয় এবং (৪) নতুন ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নির্বচনের আদেশ দেওয়া হয়। এককথায় এই অর্ডিন্যান্সগুলি জারি করার মধ্য দিবে ফরাসীরাজ সংবিধানকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। বলাবাহুল্য, এই অর্ডিন্যান্স গুলি মান্য করলে ফরাসী জনগণ তাদের স্বাধীনতা হারাত এবং ফ্রান্সে এক স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের শাসন বলবৎ হত।

৩.২.১. বিপ্লবের উদ্দেশ্য :

দশম চার্লসের জারি করা অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা না করলে ফরাসী সরকার নিঃশব্দে চতুর্দশ লুই এর স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক সরকার এর রূপ পরিগ্রহ করত। তাই এই অর্ডিন্যান্সের তাৎপর্য সফলের কাছে স্পষ্ট হলে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছিল জনগণ রাস্তাঘয় সমবেত হয় প্রতিধ্বনি তুলেছিল 'মন্ত্রিসভার নিপাত চাই', (অষ্টাদশ লুই স্বাক্ষরিত) 'সনদ অক্ষয় হউক' প্রভৃতি। এইভাবে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ২৮ জুলাই ফ্রান্সে এক গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। মুখ্যত প্রাক্তন সৈনিক প্রজাতন্ত্রীরা এবং শ্রমিকরা সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল এবং তারা বুরবোঁ রাজপরিবারের সাদা পতাকার পরিবর্তে ফ্রান্সের প্রকৃত জাতীয় পতাকা বিপ্লবের ত্রিরঙ্গা পতাকা তুলে ধরেছিল।

এই গৃহযুদ্ধ তিনদিন স্থায়ী হয়েছিল। এটাই ছিল জুলাই বিপ্লবের গৌরবময় তিনদিন। এই বিপ্লব প্যারিসের রাস্তাতেই সংঘটিত হয়েছিল। বিদ্রোহীদের সংখ্যা সম্ভবত ১০ হাজারের বেশি ছিল না। এমনকি প্যারিসে সরকারের ১৪ হাজারের বেশি সৈণ্য ছিল না। বিদ্রোহ সংগঠনে বেশি সমস্যা হয় নি। প্যারিসের রাস্তাগুলি ছিল সংকীর্ণ ও বাঁকা। এরূপো রাস্তায় সরকারের পক্ষে কামানের ব্যবহার অসম্ভব ছিল। বিদ্রোহীরা প্যারিসের রাস্তায় বড় বড় পাথর খুলে সেগুলি দিয়েই ব্যারিকেড রচনা করেছিল।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

২৭ - ২৮ জুলাই এর রাত্রীতে প্যারিসের রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে অবরোধ করা হয়েছিল। ব্যারিকেড পেরিয়ে সৈন্যদের অগ্রগতি খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। জুলাই এর তপ্ত গরমে যুদ্ধ চলেছিল। যাইহোক, শেষপর্যন্ত সব কিছু হারানোর মুখে উপনীত হয়ে চার্লস ৩১ জুলাই তাঁর পৌত্রের অণুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং সপরিবারে ইংল্যান্ডে চলে যান। পরবর্তি দুই বছর চার্লস ইংল্যান্ডেই ছিলেন। পরে তিনি অস্ট্রিয়া চলে যান এবং সেখানে ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

জুলাইবিপ্লবে অংশগ্রহনকারি মানুষেরা প্রায় সকলেই ছিলেন প্রজাতন্ত্রের সমর্থক। তাই ফরাসীরাজ চার্লস সিংহাসন থেকে অপসৃত হলে ফ্রান্সের উদার পন্থী রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক এবং প্যারিসের জনগণের একটা বড় অংশ অর্লিয়েন্স বংশীয় প্রতিনিধি লুই ফিলিপ (Louis Philippe) কে ফরাসী সিংহাসনে বসানোর পক্ষপাতী ছিলেন। আসলে লুই ফিলিপ উদারনৈতিক মতাদর্শদের সমর্থক ছিলেন। তাই মনে করা হয়েছিল যে, এরুপ মুক্তমনের মানুষকে নেতৃত্বে স্থাপন করা হলে ফ্রান্সে অভিজাততন্ত্র ও যাজকতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হবে না। উদারনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর কেওদমন করা যাবে না। যদিও প্রজাতন্ত্রীদের প্রকৃত নেতা লাকায়েৎ কেই রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যে কোন একটিকে ফ্রান্সের জন্য চয়ন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। বলাবাহুল্য, তিনি শেষপযর্ত লুই ফিলিপকেই সমর্থন করেছিলেন।

৭ আগষ্ট ফ্রান্সের চেম্বার ডেপুটিস লুই ফিলিপকে ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দের সনদকে কিছুটা পরিবর্তন করা হয় এবং সংসদিয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। বুরবোঁদের সাদা পতাকার বদলে ফ্রান্সে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং সর্বপরি লুই ফিলিপের রাজত্বকালে সূচনা হয়।

৩.২.২. ইউরোপে বিপ্লবের প্রভাব :

১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব পোল্যান্ড, জার্মানী, ইতালী, সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসহ ইউরোপের সর্বত্র অনুভূত হয়েছিল। এই বিপ্লব ইউরোপের অণ্যত্র যেসব আন্দোলনগুলি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের ভিয়েনা বন্দোবস্তের পোক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল সেগুলিকে উৎসাহিত করেছিল। বস্তুত এই বিপ্লব ইউরোপের শাসকবর্গের কাছে তাৎক্ষণিক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। তারা ভাবতে শুরু করেছিল যে, ইতালি ও স্পেনের মত তারা যদি ফ্রান্সের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করনে তাহলে কি ফ্রান্সে আবার বিপ্লব ঘটবে। যাইহোক, প্রথমে তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সচেষ্ট হয়েছিল। মেটারনিখ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ লুই ফিলিপের বিরুদ্ধে একটা বিরোধী জোট গঠন করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

তবে নানাবিধ কারণে মেটারনিখের উদ্যেগ বাস্তবসম্মত ছিল না। তাই সকল শক্তিবর্গই অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত লুই ফিলিপকে স্বীকার করে নিয়েছিল। এর ফলে ফ্রান্সে ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের বন্দোবস্ত ভেঙে পড়েছিল । সর্বপরি ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে মিত্রশক্তিবর্গ ফ্রান্সের সিংহাসনে যে বুরবোঁ রাজবংশকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল ১৮৩০ ক্রিষ্টাব্দের বিপ্লব তা উৎখাত করেছিল।

টিপ্পনী

১. নেদারল্যান্ড রাজ্য :

জুলাই বিপ্লবের প্রতিঘাতে নেদারল্যান্ডে (হল্যান্ড) ১৮১৫ খ্রিঃ এর কূটনৈতিক বন্দোবস্ত ভেঙে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত, ভিয়েনা কংগ্রস ফ্রান্সের উত্তরে বেলজিয়ামকে নেদারল্যান্ডের সাথে যুক্ত করে একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র তৈরি করা হয়েছিল। এর পিছনে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলা । বস্তুত নেদারল্যান্ডকে শক্তিশালী করে তোলার জন্যই বেলজিয়ানকে তার সাথে যুক্ত করা হয়ছিল, যাতে মিত্রশক্তিবর্গের সাহায্যে পাওয়ার পূর্বেই নেদারল্যান্ড ফ্রান্সের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে।

বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ড একজন শাসকের অধিনে সংযুক্ত হলেও এর ফলে কিন্তু প্রকৃত অর্থে এককম রাষ্ট্র গঠিত হয়নি। মানচিত্রগত দিক দিয়ে ইউরোপের দুটি রাজ্য পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থান করলেও এবং এই দুই অঞ্চলের মানষদের একইরকম মনে হলেও এই দুই অঞ্চলের আর্থসামাজিক স্বার্থ ছিল স্বতন্ত্র ও পরস্পোর বিরোধী। ভাষা, ধর্ম, বা জীবিকা কোন ক্ষেত্রেই এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সদৃশ ছিল না। ধর্মগত দিক দিয়ে বেলজিয়ানরা ছিল ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী এবং ডাচরা ছিল প্রোটেস্ট্যান্টপন্থী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের স্বার্থ ছিল পরস্পর বিরোধী। কৃষি ও বাণিজ্য ছিল ডাচদের প্রধান জীবিকা তাই তারা অবাধ বানিজ্য নীতির সমর্থক ছিল। অণ্যদিকে বেলজিয়াম ছিল শিল্প নির্ভর। তাই বেলজিয়নরা শিল্পন সংরক্ষণ নীতির সমর্থক ছিল।

বেলজিয়নরা ডাচদের সাথে সংযুক্তিতে প্রথম থেকেই খুশি ছিল না। তারা লক্ষ্য করেছিল সংযুক্ত রাষ্ট্রে বেলজিয়নরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রে সর্বত্র ছিল ডাচদের প্রাধান্য। বলাবাহুল্য ফরাসী বিপল্ব বেলজিয়ানদের মধ্যেও জাতীয়তা বোধের সঞ্চার করেছিল । তাদের মধ্যেও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করার আশা অঙ্কুরিত হয়েছিল।

এই দুই অঞ্চলের মধ্যে সংঘাত সাধারণ ঘটনা ছিল। রাষ্ট্রের সমস্ত সরকারী পদ ও সেনাবাহিনীতে ডাচদের প্রাধান্য বেলজিয়ানদের ক্ষুব্ধ করেছিল। হল্যান্ডরাজ ডাচ ভাষাকে বেলজিয়ানদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে তারা এর প্রতিবাদ করেছিল । সর্বপরি সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ, অর্থনীতি ও

রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি বেলজিয়ানদের ক্রমশ মোহমুক্তি ঘটতে শুরু করেছিল।

২. বেলজিয়াম রাজ্য :

জুলাই বিপ্লব বেলজিয়নদের মধ্যে এক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। প্যারিসের মত ব্রাসেলস এর রাস্তায় বেলজিয়ানরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। এছাড়া সঙ্গে সঙ্গে অনান্য শহরেও গণ অভুত্থান ঘটেছিল। বিক্ষোপভের প্রবলতা দেখে রাজকী বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল এবং এর প্রেক্ষিতে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ৪ অক্টোবর বেলজিয়াম স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এরপর ভবিষ্যৎ সরকার গঠন করার জন্য একটা সম্মেলন আহ্বন করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে রাজতান্ত্রিক সরকার গঠন এবং উদারনৈতিক সংবিধান রচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বলাবাহুল্য, বেলজিয়ামের প্রথম নির্বাচিত রাজা ছিলেন প্রথম লিওপোল্ড। তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছিল ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাসে।

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা কিন্তু সহজে স্বীকৃত হয়নি। অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া বেলজিয়ামের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেনি। কিন্তু এই সময় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বেলজিয়ামের অনুকূলে থাকায় শেষপর্যন্ত বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। ইংল্যান্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স লন্ডনের সম্মেলনে চিরকাল নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হয়েছিল।

যাইহোক, বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ঘোষণা কার্যতভাবে ভিয়েনা ব্যবস্থাকে অস্বীকার করেছিল। সর্বপরি বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে ইউরোপে একটা নতুন রাষ্ট্রের উত্থান ঘটেছিল।

৩. পোল্যান্ড রাজ্য :

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে স্বাধীন পোল্যান্ড রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটেছিল। পোল্যান্ডবাসীরা প্রথমে ফরাসী বিপ্লবের প্রেক্ষিতে এবং পরে নেপোলিয়নের কাছ থেকে আশা করেছিল যে, তাদের রাষ্ট্রের পুনরুত্থান ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ায় তারা অত্যন্ত হতাশ হয়েছিল। এমনকি ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ভিয়েনা কংগ্রেসে পোলরা আশাতীত সাআয্য লাভের প্রতিশ্রুতি পেলেও শেষে তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, ভিবেনা কংগ্রেসে রাশীয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার উদার চিত্তে পুরনো পোল্যান্ড রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল পোল্যান্ড রাশিয়ার সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পৃথক রাষ্ট্র হবে এবং জার একই সাথে রাশিয়ার সম্রাট ও পোল্যান্ডের রাজা হিসাবে পরিগণিত হবেন। সর্বপরি দুই রাজ্যের সংযুক্তি হবে পুরোপুরি ব্যাক্তিগতভাবে।

আলেকজান্ডার অষ্টাদশ শতকে পোল্যান্ড যতটা অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল তার পুরোটই পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব ছিল যদি প্রাশিয়া

টিপ্পনী

ও অস্ট্রিয়া পোল্যান্ডের অধিকৃত অঞ্চল ফিরিয়ে দিতে সম্মত হত। কিন্তু ভিয়েনা কংগ্রেসে এই কার্য সম্পাদিত হয়নি। যদিও প্রাশিয়া ও অস্ট্রীয়া কিছু পোলিশ অঞ্চল ছেড়ে দিয়েছিল, তা সত্ত্বেও তাদের অধিকারে পোল্যান্ডের অনেকাংশই ছিল। এমনকি ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে যে পোল্যান্ড রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল তার মধ্যে রাশিয়া অধিকৃত অনেক পোলিশ অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

যাইহোক, ভিয়েনা সম্মেলনে নবগঠিত পোল্যান্ড রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন প্রথম আলেকজান্ডার। তিনি পোলদের জন্য স্বতন্ত্র সংবিধান ও নির্বাচিত প্রতিনিধি সভা গঠনের ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম রাষ্ট্রিয় ধর্মের স্বীকৃতি পেয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রে অনান্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সহনশীলতার নীতিও গ্রহণ করা হয়েছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও পোলিশ ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। সরকারী সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে পোলদের নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছিল। পোল্যান্ড বিবিধ উদারনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য এর আগে পোলরা কখনও এরূপ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভোগ করে নি। এছাড়া আলেকজান্ডারের ব্যবস্থানুযায়ী পোলজনতা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার পেয়েছিল।

তবে পোল্যান্ডের এই ধরনের শাসনতন্ত্র গোড়া থেকই নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল। রুশরা পোল্যান্ডের পুনঃস্থাপন বিশেষত সংবিধানিক পোল্যান্ডের বিরোধীতা করেছিল। কারণ, তাদের নিজেদেরই কোন সংবিধান ছিল না। তাদের বক্তব্য ছিল, যে, তারা জারের প্রকৃত সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও জার কেন রুশদের পরিবর্তে তাদের পুরনো শত্রু পোলদের নানাবিধ সুবিধা প্রদান করেছেন। বলাবাহুল্য রুশ ও পোলদের মধ্যে ঘৃণার সম্পর্ক ছিল শতাব্দী পুরনো। এছাড়া পোলদের অধিকাংশের কাছে উদারনৈতিক সরকারের চেয়ে অনেক বেশি কাঙ্খিত ছিল স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতা আলেকজান্ডার রুশদের কখনও প্রদান করেন নি। ফলতঃ আলেকজান্ডারের উদ্দেশ্য এবং পোলদের আকাঙ্খা ছিল পরস্পর বিরোধী। এছাড়া পরবর্তী জার নিকোলাস আলেকজান্ডারের মত উদারপন্থী ছিলেন না। তাঁর আমলে পোলদের স্বাধীনতা অনেকটাই সংকুচিত হয়েছিল। তাই কিছুদিন পরেই শাসক ও শাসিতের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়েছিল। পোলরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে দৃঢ়বদ্ধ ছিল এবং তারা কেবলমাত্র সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে পোলদের কাছে সেই সুযোগ আসে। ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের সংবাদে উৎসাহিত হয়ে পোলরা ১৮৩০ খ্রিঃ এর শেষ দিকে জার প্রথম নিকোলাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। বলাবাহুল্য, পোল্যান্ডে রোমানক অংশের শাসনের অবসান ঘটাতে পোলরা জীবন মৃত্য সংগ্রামে প্রস্তুত হয়েছিল।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পোল বিদ্রোহ :

রাশিয়ার সামরিক শক্তি পোল্যান্ডের চেয়ে বেশি ছিল। তাই পোল্যান্ডের পক্ষে একাকী জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। পোল্যান্ড বৈদেশিক সাহায্যের আশা করেছিল, কিন্তু কোন সাহায্য তারা পায় নি। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও জার্মানীর মানুষজন পোলদের বিদ্রোহকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু কোন দেশেরই সরকার প্রজাদের মতকে গুরুত্ব দেয়নি এবং এব্যাপারে সক্রিয়তা দেখায় নি। ফলতঃ পোল্যান্ডকে এককভাবেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং এর ফল পূর্বনির্ধারিত ছিল। পোলরা সাহসের সাথে যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু তাদের উপযুক্ত নেতৃত্ব, সংগঠন এবং সামরিক শৃঙ্খলা ছিল না।

পোল্যান্ডের সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চলেছিল। সেপ্টম্বরে রাশিয়া ওয়ারশ দখল করে নেয়। অসংগঠিত পোল বিদ্রোহের ফল ছিল মারাত্মক। এরপ্রেক্ষিতে পৃথক রাজ্য হিসাবে পোল্যান্ডেদর অস্তিত্ব মুছে গিয়েছিল এবং তা রাশিয়ার একটা প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। পোল্যান্ডের সংবিধানের বিলোপ ঘটেছিল এবং সেখানে জারের কঠোর শাসন বলবৎ হয়েছিল। বিদ্রোহীদের চরম শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। অনেককে মৃত্যু দন্ড দেওয়া হয়েছিল কিংবা সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, সহস্রাধিক পোল কর্মচারী ও সৈনিক পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পালিয়ে গিয়েছিল। এছাড়া রাশিয়ার দমন নীতিতে পোল ভাষাও স্বীকৃতি হারিয়েছিল।

অগ্রগতি পরিমাপ কর :

১. ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের তাৎপর্য কি ছিল ?

২. ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই বিপ্লবে কোন, কোন, রাষ্ট্র প্রভাবিত হয়েছিল ?

৩.৩. ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ফ্রেবরুয়ারী বিপ্লব : কারণ ও ফলাফল :

জুলামই বিপ্লবের পর ফ্রান্সের সিংহাসনে লুই ফিলিপ অধিষ্ঠিত হয়ে ফ্রান্সকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষনা করেছিলেন। এর ফলে ফরাসী ক্যাথলিকরা ও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এছাড়া ফিলিপ অভিজাত, সমাজতন্ত্রি এবং বোনাপার্টিস্টদের বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে ব্যার্থ হয়েছিলেন। সর্বপরি তাঁর পররাষ্ট্র নীতির দুর্বলতা ও অসাফল্য এবং দূর্নিতি পরায়ণ ভোটব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে জনগণের অসন্তোষ ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রেবরুয়ারী বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

ফরাসী রাজ লুই ফিলিপ ফ্রান্সের জনগণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আশা - আকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থ হলে প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দল শাসন সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করার পরিকল্পনা করে। এই উদ্দেশ্যে তারা এক ভোজ সভার মিলিত

হওয়ার চেষ্টা করলে প্রধানমন্ত্রী গিজো এই ভোজ সভার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ফলে ১৮৪৮ খ্রিঃ-এ ২২ ফ্রেবরুয়ারী বিরোধী দল গুলি প্যারিসে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করে। জাতীয় রক্ষাবাহিনী জনতার উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। অবস্থা আয়ত্তে আনতে ফিলিপ গিজো কে পদচ্যুত করে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দন। তথাপি জনতা গিজোর বাসভবনে আক্রমণ করলে রক্ষীদের গুলিতে ২৩ জন নিহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনতার চাপে ফিলিপ ২৪ ফ্রেবরুয়ারী তাঁর পৌত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে ইংল্যান্ডে পালিয়ে গেলে জুলাই রাজতন্ত্রের পতন ঘটে এবং প্রজাতন্ত্রি ও সমাজতন্ত্রি দল যৌথভাবে ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষনা করে। এইভাবে ২২ থেকে ২৪ ফ্রেবরুয়ারী মাত্র এই তিনদিনের মধ্যেই এই বিপ্লব ফ্রান্সের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন ঘটায়। রাজতন্ত্রের পতন ঘটে এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র। বলাকবাহুল্য, ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রেবরুয়ারী বিপ্লবের প্রেক্ষিতে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের শাসনভার প্রথমে অর্পিত হয়েছিল লা মার্টিন এর হাতে। তারপর এই শাসনভার বর্তায় লুই নেপোলিয়নের হাতে।

টিপ্পনী

৩.৩.১. বিপ্লবের ফলাফল :

১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ ফ্রেবরুয়ারী প্রজাতন্ত্রী সমাজতন্ত্রি দলের যৌথ উদ্যোগে ফ্রান্সে একটা অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়েছিল। এই প্রজাতান্ত্রের দুটি মূল লক্ষ্য ছিল - (১) সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং (২) বেকারত্ব দূরীকরণ। বলাবাহুল্য ২ মার্চ সার্বজনীন ভোটাধিকার কার্যকর হয়েছিল এবং এরফলে ফ্রান্সে ভোটদাতার সংখ্যা ৯ মিলিয়ন বৃদ্ধিও পেয়েছিল।

ফ্রান্সে জাতীয় কর্মশালা গড়ে উঠেছিল এবং এখানে নাগরিকদের কাজের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। এরফলে বেকাররা কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিল। বলাবাহুল্য, এই কর্মশালা গুলিতে ১ লক্ষ কর্মী নিযুক্ত হয়েছিল এবং প্রতিদিন ৭০ হাজার লিরে পারিশ্রমিক বাবদ প্রদান করা হত। এছাড়া ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ৪৭৯ টি নতুন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তবে ফ্রান্সের বিত্তশালী সম্প্রদায়ের একটা বড অংশ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় প্যারিসে ব্যবসা ৫৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে বিলাস সামগ্রীর ব্যবসায় আশ্চর্যভাবে মন্দা দেখা দিয়েছিল এবং ঋণ পাওয়া যাচ্ছিল না।

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে রক্ষণশীলতার উদ্ভব :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খলিত। নতুন সরকার গঠনের এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই রক্ষণশীলরা এর বিরোধীতা করতে শুরু করেছিল। এপ্রিলের ভোটে বোঝা গিয়েছিল যে, এই অস্থায়ী সরকারের উদারনৈতিক ভিত্তিতে সংখভাগরিষ্ঠতা মানুষের আস্থা নেই। এই নির্বাচনে ভোটদাতারা মুখ্যত মডারেট বা মধ্যপন্থীদের নির্বাচন করেছিল এবং এরফলে গঠিত হয়েছিল রক্ষণশীল সংবিধান সভা।

টিপ্পনী

এই সংবিধানসভা ফ্রান্সে শাসন পরিচালনার জন্য পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠন করেছিল। এই সমিতি ফ্রান্সে এক শক্তিশালী অর্থনীতির সংগঠন এবং সামাজিক পরিষেবা প্রদানে দায়বদ্ধ ছিল।

ভূসম্পত্তিশালী বড় কৃষক ও ছোট চাষীদের নতুন করের আয়তায় আনা হয়েছিল, যাতে এর দ্বারা শহরে বেকারত্ব সমস্যা দূর করা যায়। কিন্তু এই পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নতুন সরকার ফ্রান্সে গ্রামাঞ্চলের সমর্থন হারিয়েছিল। বলাবাহুল্য, গ্রামাঞ্চলের পরিশ্রমী চাষিরা শহরে বেকারদের জন্য কর প্রদানে অস্বীকার করেছিল। তাছাড়া সেই সময় ফ্রান্সে কর্মসন্ধানী লোকের সংখ্যা যত ছিল , সেই তুলনায় কাজ পর্যাপ্ত ছিল না। ফলতঃ কাজের অধিকার নীতি খুব একটা সফল হয় নি। এছাড়া সরকারের তরফ থেকে রাস্তা নির্মান এবং বৃক্ষরোপনের মত নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছিল, কিন্তু এর দ্বারা সকলের কাজের চাহিদা পূরণ করা যায় নি।

ফরাসী বিপ্লবের সমাপ্তি :

১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বিপ্লবে মূলতঃ অংশ নিয়েছিল পেটিবুর্জোয়ারা, যাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিক, বণিক এবং দোকানদারেরা। তাই বিপ্লবের পর ফ্রান্সে যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে মুখ্যত উদারপন্থী বুর্জোয়াদের স্বার্থই প্রতিফলিত হয়েছিল। এই সরকারে শ্রমিক শ্রেনীর স্থান ছিল না বললেই চলে। তাই এই সরকার সেভাবে সসকল হতে পারে নি। এছাড়া ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে যেখানে সংখ্যাধিক্য চাষীর বাস ছিল তারা সেই সময় খাদ্য সংকট, ফসলের উৎপাদন ভালো না হওয়া ও অনান্য সমস্যায় এতটাই জর্জরিত ছিল যে তাদের কাছে বুর্জোয়াদের সমস্যা গুরুত্ব পায় নি। বলাবাহুল্য, পরবর্তি সময়ে থার্মোভরিয় প্রতিক্রিয়া এবং ফরাসী সিংহাসনে তৃতীয় নোপোলিয়নের আরোহন প্রমাণ করেছিল যে ফরাসীরা দুর্বল বিপ্লবী সরকারের চেয়ে এক দক্ষ ও যোগ্য শাসককে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক ছিল।

ফ্রান্সে বিপ্লবের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল লুই নেপোলিয়নের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই। লুই নেপোলিয়ন প্রথমে নির্বাচনে জয়লাভ করে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে তিনি প্রজাতন্ত্রীদের ক্ষমতা থেকে অপসৃত কোরে ফ্রান্সে পুরাতন ব্যবস্থা ফিরিয়ে এনেছিলেন। বলাবাহুল্য, তাঁর কোন সাংবিধানিক অধিকার না থাকা সত্ত্বেও তিনি আইনসভা ভেঙে দিয়েছিলেন এবং ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে ২ ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি ফ্রান্সের অপ্রতিরোধ্য শাসকে পরিণত হয়েছিলেন। এটা ছিল লুই নেপোলিয়নের এক বড় সাফল্য। যদিও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলে তা দমন করা হয়েছিল এবং কার্যত ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল। প্রসঙ্গত লুই নেপোলিয়নের সার্বজনীন ভোটাধিকার ফিরিয়ে এনেছিলেন। প্রজাতন্ত্রীরা এতে ভীত হবে উঠেছিল, কারণ তারা

জানত যে গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা প্রজাতন্ত্রীদের বিরুদ্ধেই ভোট দেবে। যাইওক, লুই নেপোলিয়ন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের উপাধি ধারণ করেছিলেন এবং এর প্রেক্ষিতেই ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সূচনা হয়েছিল।

টিপ্পনী

সামাজতন্ত্রবাদের সূচনা :

১৮৪৮ খরিষ্টাব্দে ফ্রেবরুয়ারী বিপ্লবের আগে থেকে বছরের পর বছর ধরে ফ্রান্সে যেসব ভ্রান্ত আর্থ-সামাজিক নীতি অনুসরণ করা হয়ে আসছিল তার বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছিল। বিপ্লবের প্রাক্কালে উদারপন্থীরা কেবল ফরাসী প্রধান মন্ত্রী গিজোর রক্ষণশীল নীতির বিরোধিতা করেনি, তার সাথে ফ্রান্সে প্রচলিত অর্থনৈতিক বভবস্থাকেও আক্রমণ করেছিল। ফরাসী জনগণের দূরবস্থার সমালোচনা শুরু হয়েছিল এবং অনেক লেখক শিল্পের সংগঠন এবং মূলধন ও শ্রমের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে অনেক নতুন মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেছিলেন। এই মতবাদগুলি কালক্রমে সমাজতন্ত্রের চেহারা নিয়েছিল।

সাঁ সিমোঁ (Saint Simon) সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর মানুষের স্বার্থে সমাজ বিপ্লবের জন্য প্রথম সমাজতান্ত্রিক প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, ধন বন্টনে বৈষম্যের জন্যই সমাজ ধনী ও দরিদ্র শ্রেনীতে বিভক্ত হয়েছে। তাই রাষ্ট্রের উচিত উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করা। এছাড়া তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 'সামর্থ্য অণুযায়ি শ্রম ও পরিষেবা অণুযায়ী পুরস্কার' ('Labour according to capacity and poward according to service) - এই নীতির উপর ভিত্তি করে শিল্প সংগঠন করা উচিত। বলাবাহুল্য, সাঁ সিমোঁর মতাদর্শের প্রসার ঘটিয়েছিলেন লুই ব্লা (Louis Blane)। লুই ব্লা ছিলেন একজন সফল রাজনীতিবিদ, যিনি ফ্রান্সে জুলাই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

লুই ব্লাঁ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে শ্রমিকদের সমকালীন ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থার অশুভ দিকগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বিদ্রুপাত্মক ভাষায় ফ্রান্সের বুর্জেয়া সরকারকে ধনীদের সরকার বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি এই সরকারের পতন এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনে পক্ষপাতী ছিলেন।

লুই ব্লাঁ ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রত্যেক মানুষের কর্মের অধিকার আছে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য তা প্রদান করা। তাঁর মতানুযায়ী রাষ্ট্র যদি শিল্পের সংগঠন করতে পারে তাহলে রাষ্ট্র মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে। তিনি রাষ্ট্রের মূলধনে জাতীয় কর্মশালা গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছিলেন। তাই শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে তা গ্রাহ্য হয়েছিল। একটা সমাজতন্ত্রী দলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই দল প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী

ছিল, যদিও এই বিশ্বাস অনান্য প্রজাতন্ত্রীদের বিশ্বাস থেকে আলাদা ছিল। সাধারণ প্রজাতন্ত্রীদের কাছে শুধুমাত্র সরকারের ধরণ পরিবর্তন কাঙ্খিত ছিল সেখানে সমাজতন্ত্রী দল সমগ্র সমাজ পরিবর্তন ইচ্ছা পোষণ করত।

অগ্রগতি পরিমাপ কর :

টিপ্পনী

৩. ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের পর ইতালিতে উদারনৈতিক রাষ্ট্র হিসাবে কোন রাজ্য আত্মপ্রকাশ করেছিল ?

৪. কে প্রথম সমাজতান্ত্রিক প্রকল্প ঘোষণা করেছিল ?

৩.৪. ১৮৪৮ খ্রিঃ থেকে ১৮৭১ খ্রিঃ পর্যন্ত ফ্রান্সে রাজনৈতিক অগ্রগতি :

এই বিভাগে তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালে ফ্রান্সের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাগুলি আলোচনা করা হবে।

১. ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বর অভ্যুত্থান :

১৮৫১ খ্রিঃ এ ২ ডিসেম্বর ফ্রান্সের দ্বিতীয় প্রজাতান্ত্রিক সরকারের রাষ্ট্রপতি লুই নেপোলিয়ন গণতন্ত্রের নামে এক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। ঐদিন তাঁর নির্দেশে পুলিশ বাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে রাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রীদের গ্রেপ্তার ও বন্দী করে। সামরিক বাহিনীকে আইনসভা দখল করতে প্রেরণ করা হয়। প্যারিসের দেওয়ালে পোষ্টার লাগিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, কনসুলেট শাসনের সময় নেপোলিয়ণ বোনাপার্ট যে ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তার আদলেই রাষ্ট্রপতি সংবিধান পুনর্গঠন করবেন। জনগণ এই প্রস্তাবে সম্মত কিনা তার জন্য তিনি গণভোটেরও আয়োজন করেন।

২. উদ্যানপথ হত্যাকান্ড (Massacre of Boulevards) :

নেপোলিয়ন তাঁর উদ্দেশ্য গঠন এবং যেকোন রকমের প্রতিরোধের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। পুলিশ বাহিনীকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল এবং যেকোন অশান্তকর পরিস্থিতির দমনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সমাজতন্ত্রী ও দক্ষীনপন্থীরা ব্যারিকেড রচনা করে নেপোলিয়নকে বাধা দেওয়ার শেষ প্রচেষ্টা করেছিল। যদিও নেপোলিয়ন চরম দমননীতির দ্বারা এই অভ্যুত্থান স্তব্ধ করে দেন। এর প্রেক্ষিতে ১৫০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয় এবং প্রচুর মানুষ আহত হয়। এছাড়া অনেক মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করে দেওয়া হয়। এই দমননীতি 'উদ্যান পথ হত্যাকান্ড' নামে খ্যাত। লুই নেপলিয়ান যাদের বিপজ্জনক মনে করতেন তাদের নির্বাসিত কিংবা কারারুদ্ধ করতেন। এই বলিষ্ঠ নিতি

গৃহীত হয়েছিল মুখ্যাত প্রজাতন্ত্রিদের বিরুদ্ধে। এইভাবে সমস্ত বিরোধী নেতাদের অপসারিত করে নেপোলিয়ন ফরাসী জনগণের কাছে তাঁর সংবিধান পুনগর্ঠন করার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মতামত দানের আবেদন জানিয়েছিলেন। ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে ২০ ডিসেম্বর যে গণভোট হয় তাতে লুই নেপোলিয়নের পক্ষে প্রায় ৭৫ লক্ষ ভোট ও বিপক্ষে মাত্র ৭ লক্ষের মত ভোট পড়েছিল। এইভাবে গণভোটের প্রহসন দ্বারা নেপোলিয়ন তুন সংবিধান পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন।

টিপ্পনী

৩. দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা :

ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র এরপর আরও একবছর টিকে থাকলেও বস্তুত তা ছিল মৃত। লুই নেপোলিয়ন নাম মাত্র রাষ্ট্রপতি ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ফরাসী রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ শাসক। যাইহোক, ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সাম্রাজ্যিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য আবার গণভোটের আয়োজন করেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে সম্রাট পদপার্থী হিসাবে ২১ নভেম্বরের গণভোটে নেপোলিয়ন যথারীতি গণসমর্থন পেয়েছিলেন। এরপর লুই নেপোলিয়ন 'তৃতীয় নেপোলিয়ন' নাম নিয়ে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের অকালবোধন ঘটে এবং শুরু হয় 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের' অস্থির পদযাত্রা।

নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীন নীতি :

ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করেছিলেন এবং একই সাথে পরবর্তি ১৮ বছর ইউরোপীয় রাজনীতির অন্যতম ব্যাক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পর নেপোলিয়নের ধারণা হয়ে ছিল যে, অন্ততঃ একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য ফ্রান্সে একটা একনায়কতন্ত্রী শাসনের প্রয়োজন আছে। তিনি মনে করেছিলেন ফ্রান্সে সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তাহল শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার সঙ্গে তিনি স্বাধীনতার সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। তবে তা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার পর। তাই তিনি তাঁর খুল্লতাকে অনুসরণ করে স্বাধীনতার অধিকার খর্ব করেছিলেন এবং সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি জনগণকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। অবশ্য এ প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছিলেন যে, আস্তে আস্তে জনগণকে তাদের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

নেপোলিয়নের নেতৃত্বাধীন ফ্রান্সে সম্রাজ্যের সময়কালকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় যথা ১৮৫২ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অবাধ স্বৈরশাসনের পর্ব এবং ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উদারনৈতিক শাসন পর্ব। বলাবাহুল্য, এই দ্বিতীয় পর্বেরই নেপোলিয়ন যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তা ব্যার্থ হয়েছিল এবং তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল। যাইহোক তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীন শাসননীতিতে

কনসুলেট আমলের বোনাপার্টিয় শাসন ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত, তৃতীয় নেপোলিয়ন রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি করেছিলেন এবং প্রশাসনকে এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যাতে ফরাসীবাসীরা ভাবতে পারে তারা স্বশাসন ভোগ করেছে।

টিপ্পনী

তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্সে সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতি বলবৎ ছিল কিন্তু তা স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে হানিকর ছিল না। ফ্রান্সে আইনসভা ও সেনেট থাকলেও তাদের কার্যত কোন ক্ষমতা ছিল না। ফ্রান্সে কোন স্বাধীনতা ছিল না। নতুন শাসক প্রজাতন্ত্রীদের দমন করতে নৃশংশ নীতি গ্রহণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। বস্তুত নেপোলিয়ন সংবিধান আড়ালে ফ্রান্সে এক রাজনৈতিক স্বৈরশাসন কায়েম করেছিলেন।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের দমনমূলক ও প্রগতিমূলক চরিত্র :

স্বৈরাচারী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতার কোন স্থান থাকে না। কিন্তু একজন স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে নেপোলিয়ন কিছুটা ভিন্ন ছিলেন এবং অনেকক্ষেত্রে প্রগতিশীল ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সর্বত্রভাবে প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং এরই প্রেক্ষিতে তাঁর রাজত্বকালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল। উল্লেখ্য, তাঁর আমলে শিল্পোৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা সবক্ষেত্রে উন্নয়নের জোয়ার এসেছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর রাজত্বকালে প্যারিস নগরের নবীকরণ হয়েছিল। পুনর্গঠিত প্যারিস নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তা ইউরোপের সবচেয়ে আকর্ষনীয় ও মনোরম রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল।

ফ্রান্সের সমৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে নেপোলিয়ন জনকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণেও উৎসাহিত হয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রে রেলপথ নির্মাণ, ঋনপ্রদানকারী সংস্থার প্রতিষ্ঠা এবং কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গরহণে উৎসাহ দিয়েছিলেন। এছাড়া এদের উন্নতিকল্পে তাদের জন্য ন্যায্য মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসস্থান এবং সালিসি সভা গঠনের ব্যবস্থান করেছিলেন।

১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন অভিজাত বংশীয় ও অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী এক স্পেনীয় যুবতি ইউজিনি ডি মন্টেগো (Eugenic de Montego) কে বিবাহ করেছিলেন। এরপরই টুইলারিস উনবিংশ শতকে সবচেয়ে আকর্ষনীয় বিলাস বহুল রাজসভায় পরিণত হয়েছিল।

উদারনৈতিক শাসনের প্রবর্তন :

নেপোলিয়নের অগণতান্ত্রিক ও ক্ষমতালিপ্সু শাসনের জন্য তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে তৃতীয় নেপোলিয়ন ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে কিছু

সংস্কারকার্য দ্বারা উদারপন্থীদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। এই সংস্কারকার্যে আইনসভার ক্ষমতাবৃদ্ধি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছিল। এই ভাবে দেখা যায় সম্রাট ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে আভ্যন্তরীন শাসনব্যবস্থায় তাঁর সম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এরপর ফ্রান্সে অনেক নতুন পত্র-প্রত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং এই পত্র পত্রিকাগুলিতে সম্রাট তিক্তভাষায় আক্রমণ করা হয়েছিল। এইভাবে নেপোলিয়নের রাজত্বের শেষ দুই বছর ফ্রান্সে বাক্ স্বাধীনতা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে ফ্রান্সে বিরোধীপক্ষ অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছিল। এই নির্বাচনে বিরোধীপক্ষ পেয়েছিল ৯৩ টি আসন যা সরকার পক্ষের আসনের প্রায় কাছাকাছি ছিল। এমতাবস্থায় তৃতীয় নেপোলিয়ন আপোষের নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং পূর্বতন প্রজাতন্ত্রী ও উদারপন্থী বুর্জোয়া দলের প্রতিনিধি এমিলি অলিভিয়ার (Emile Ollivier) কে প্রধানমন্ত্রী করে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। তারপর নেপোলিয়ন সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ৮ মে পুনরায় গণভোট করেছিলেন। এতে সম্রাটের পক্ষে বিপুল ভোট পড়েছিল এবং জনগণ ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে নেপোলিয়ন যেসব উদারনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন তা স্বীকার করে নিয়েছিল। এইভাবে নেপোলিয়ন আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

বৈদেশিক নীতি :

তৃতীয় নেপোলিয়নের বিদেশনীতির মূল লক্ষ্যই ছিল ফরাসী রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি করে আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের গৌরব বৃদ্ধি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নেপোলিয়নের কাছে এই সুযোগ এনে দিয়েছিল।এই যুদ্ধে তিনি রাশিয়ার অগ্রগতি রোধ করার জন্য ব্রিটেনের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মধ্যে ইতালির জন্য কিছু করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে তিনি ইতালি থেকে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করতে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পিডমন্ট সার্ভিনিয়াকে সাহায্য করেছিলেন। ল্যাজেন্টা ও সলফেরিনোক (Solferino) র যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু এইসময় প্রাশিয়া অস্ট্রিয়া সমর্থনে রাইন অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করলে নেপোলিয়ন আকস্মিকভাবে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। বলাবাহুল্য ইতালিতে নেপোলিয়নের কার্যকলাপ ব্রিটেন সন্দিগ্ধ করে তুলেছিলে। তবে নেপোলিয় জানতেন যে নিজের সম্রাটপদ রক্ষার জন্য তাকে যুদ্ধনীতি ধরে রাখতে হবে। কিন্তু তাঁর সামরিক অভিযানগুলি সফল হয়নি। ইউরোপ ছাড়া আমেরিকা মহাদেশে মেক্সিকো তে তিনি ফরাসী অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। যদিও তিনি একাজে ব্যার্থ হয়েছিলেন। তবে নেপোলিয়ন সামরিক দিক দিয়ে ব্যার্থ হলেও তাঁর আমলে ফ্রান্সের গৌরব অণ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ছিল। তাঁর পররাষ্ট্রনীতির সম্ভবত শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল সুয়েজ

টিপ্পনী

খাল খনন। নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও মিশরের কাছ থেকে সুয়েজ খাল খননের অনুমতি আদায় করেছিলেন । সম্রাটের নির্দেশে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপস্ (Ferdinand de Lesseps) সুয়েজ খাল খনন করে বিশ্বের দরবারে ফ্রান্সের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। সুয়েজ খাল খননের ফলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল, রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সর্বপরি এর থেকে ফ্রান্সের আয় হয়েছিল । ব্রিটেন ফ্রান্সের এই কাজে শেষপর্যন্ত তুষ্ট হয়েছিল এবং দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

টিপ্পনী

১. প্যারিসের সম্মেলন (১৮৫৬):

১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয় তাঁর ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করেছিলেন। আলোচ্য সময়ে তাঁর সাম্রাজ্য ইউরোপের সকল দেশের কাছে স্বীকৃত হয়েছিল । নেপোলিয়ন ইংল্যান্ড ও পিডমন্টের সাথে মিত্রজোট তৈরি করেছিলেন এবং ক্রিমিয়াতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হয়েছিলেন। তাঁর কাছেই হয়ত সেই সময় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বাহিনী ছিল এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শেষে তাঁর সম্মানার্থেই প্যারিসকে যুদ্ধপরবর্তী সম্মেলন ও সন্ধিন স্থাপনের উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছিল। যাইহোক, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ফ্রান্সের পক্ষে মঙ্গলকর হয়েছিল । এরফলে তৃতীয় নেপোলিয়নের মর্যাদা দেশে ও ইউরোপে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

২. নেপোলিয়নের মেক্সিকো অভিযান :

তৃতীয় নেপোলিয়নের অস্থির কল্পনা বিলাসী, অদূরদর্শি ও আত্মঘাতী বিদেশনীতির নিদর্শন ছিল মেক্সিকো ঘটনা।

মেক্সিকোতে প্রজাতন্ত্র বলবৎ ছিল কিন্তু মেক্সিকানদের একটি দল এই প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ঐ দলের উপর ফরাসী প্রভাব বৃদ্ধি করেছিলেন বলাবাহুল্য, এইদল ফ্রান্সের নির্দেশে একটা সভা আহ্বান করেছিল এবং মেক্সিকো কে 'সাম্রাজ্য' হিসাবে ঘোষণা করে অস্ট্রিয়ার রাজপরিবারের আর্কডিউক ম্যাক্সিমিলিয়ন (Archdduke Maximilian) কে মেক্সিকোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু এই সভার সদস্য সংখ্যা মেক্সিকোর মোট জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম ছীল। তাই এই দলের ঘোষনা মেক্সিকোর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন পায়নি। যাইহোক, ফরাসী সেনাবাহিনীর সাহায্যে শেষপর্যন্ত ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়নের আশীর্বাদ ধন্য ম্যাক্সিমিলিয়ন মেক্সিকোর শাসকপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

৩. মেক্সিকো এ্যাডভেঞ্চার এর সর্বনাশা পরিণতি :

মেক্সিকোতে আর্কডিউক মেক্সিমিলিয়ন নেতৃত্বে একটি নতুন 'ল্যাটিন

সাম্রাজ্য' প্রতিষ্ঠা ছিল তৃতীয় নেপোলিয়ের এক অবাস্তব পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার সাথে যুক্ত সকলেই একে কার্যকর করতে গিয়ে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন। মেক্সিকো তে নবপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্য প্রথম থেকেই নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। নতুন সম্রাটের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিরোধ দিন দিন জোরদার হচ্ছিল। বলাবাহুল্য, নতুন সরকারের বিরুদ্ধে জুরেজ (Juarez) এক সকল গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। এরফলে ফরাসী সেনা রকবষণাত্মক নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল । এর উপর ফরাসী জেনারেল লি (General Lee) আম্পোম্যাটক্স (Appomattox) এর কাছে আত্মসমর্পন করলে নতুন সাম্রাজ্য আরও বড় বিপদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল । প্রথমদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নেপোলিয়নের মেক্সিকো পরিকল্পনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি । কিন্তু গৃহযুদ্ধের অবসানের পর আমেরিকা মেক্সিকোর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিল। বলাবাহুল্য 'মনরো নীতি' অণুসারে যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো থেকে ফরাসী বাহিনী প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দিয়েছিল।

নেপোলিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কোন প্রকার সংঘাত চান নি। তাই চাপে পড়ে তিনি মেক্সিকো থেকে ফরাসী সেনা প্রত্যাহার করে নেন । ফরাসী সমর্থন ব্যাতীত ম্যাক্সিমিলিয়নের সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে । ১৮৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৯ জুন ক্ষব্ধ মেক্সিকানদের হাতে হতভাগ্য ম্যাক্সিমিলিয়ন নিহত হন । এই ঘটনার প্রেক্ষিতে নেপোলিয়ন ইউরোপে নিন্দার পাত্র হলেন এবং অষ্ট্রিয়া যুদ্ধ হল।

৪.ইউরোপে নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ :

তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের বহু অর্থ অপচয় করে এবং বহু মানুষের প্রানহানির বিনিময়ে মেক্সিকো থেকে কেবল অপমান ও কালিমা নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। দেশে ও ইউরোপে তাঁর সম্মান ভুলুণ্ঠিত হয়েছিল। শুধু তাই নয় এর প্রেক্ষিতে তিনি ১৮৬৪ - ৬৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপে সংঘটিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ যথা - ডেনমার্কের যুদ্ধ ও অষ্ট্রে-প্রুশিয়া যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি। অথচ এই যুদ্ধের ফলাফল ফ্রান্সের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর ছিল। কারণ এই যুদ্ধ জয়লাভ এর মধ্য দিয়েই প্রাশিয়া এক আগ্রাসী ও সমারিক শক্তিতে বলীয়ান রাষ্ট্ররূপে ইউরোপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

যুদ্ধের বিপদ :

মেক্সিকো অভিযানের ব্যর্থতার পর তৃতীয় নেপোলিয়নকে ঘরে বাইরে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দেশের বাইরে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে আবর্ভুত হয়েছিল প্রাশিয়া । আসলে অস্ট্রিয়াকে জার্মানী থেকে উৎখাত করে প্রাশিয়া এক শক্তিশালী সামরিক রাষ্ট্র হিসাবে উদ্ভুত হলে ইউরোপের শক্তিসাম্য বিঘ্নিত হয় । স্যাডোয়ারা যুদ্ধের পর প্রাশিয়ার অধীনে উত্তর জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হবে গেলে ফ্রান্সের

টিপ্পনী

নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হওয়ার পরিস্থিতি নতৈরি হয়। এরই প্রেক্ষিতে ফ্রান্সের জনগণ ভাবতে থাকে প্রাশিয়া যদি সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করে তাহলে ফ্রান্সও একইভাবে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটাতে পারবে।

১৮৬৬ থেকে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়পর্বে মানুষ নিশ্চিত ছিল যে যেকোন মুহূর্তে প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হতে পারে। দুই দেশের সরকার এটা ক্রমশ বুঝতে পারছিল। ফরাসীদের কাছেও 'স্যাডোয়ার প্রতিশোধ' গ্রহনের ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অণ্যদিকে বিসমার্ক ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ চেয়েছিলেন জার্মানীর ঐক্য নিশ্চিত করতে। তিনি জানতেন বিনা যুদ্ধে ফ্রান্স দক্ষিণ জার্মানীতে তার অধিকৃত অঞ্চলগুলি প্রাশিয়াকে ছেড়ে দেবে না।

টিপ্পনী

হোহেনজোলার্ণ মনোনয়ন :

ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল আকস্মিকভাবে। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ১ জুলাই পর্যন্ত যে যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা ছিল না তা হঠাৎ করেই ১৫ জুলাই শুরু হয়েগিয়েছিল। বলাবাহুল্য, এই ফ্রান্স -প্রাশিয়া যুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ তৈরি হয়েছিল স্পেনীয় উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে। স্পেনের রাণী ইসাবেলার অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে স্পেনে বিদ্রোহ দেখা দিলে রাণী সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে যান। এই সময় স্পেনের সিংহাসন শূণ্য হয়ে পড়ে। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ২ জুলাই ফ্রান্সের কাছে সংবাদ পৌঁছায় যে প্রশীয়ার হোহেনজোলার্ণ রাজবংশের একজন সদস্য প্রিন্স লিওপোল্ড স্পেনের সিংহাসনের জন্য মনোনীত হয়েছেন। এই মনোনয়নের পিছনে বিসমার্কের হাত ছিল এবং এই মনোনয়ন যে ফ্রান্সের স্বার্থের পরিপন্থী তা জেনেও তিনি তা সমর্থন করেছিলেন। যাইহোক তা জেনেও তিনি তা সমর্থন করেছিলেন। যাইহোক, ফ্রান্স যথারীতি এর বিরোধীতা করে এবং ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ৬ জুলাই ঘোষণা করে যে, যদি অবিলম্বে লিওপোল্ডের মনোনয়ন প্রত্যাহার না করা হয়, তাহলে ফ্রান্স যুনদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হবে। এরফলে এক সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ঘটনাক্রমে ১২ জুলাই ফ্রান্সের দাবি মেনে নেওয়া হয় এবং প্রিন্স লিওপোল্ড স্পেনের সিংহাসনে তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন।

প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণা :

প্রিন্স লিওপোল্ড এর মনোনয়ন প্রত্যাহারের ফলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং যুদ্ধ সংকট আপাতত কেটে যায়। কিন্তু দুই জন ব্যাক্তি এই ঘটনায় প্রসন্ন হন নি। এদের মধ্যে একজন ছিলেন বিসমার্ক এবং অপরজন ফরাসী বিদেশ মন্ত্রী গ্রামন্ট (Gramont) বিসমার্ক এই ঘটনায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলেন এবং এমনকি পদত্যাগ করার কথাও চিন্তা করেছিলেন। অন্যদিকে গ্রামন্ট ফ্রান্সের এই কূটনৈতিক জয়ে খুশি হতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন প্রাশিয়াকে পুরোপুরি

কোণঠাসা করে আর একটা জয় অর্জণ করতে। এরই প্রেক্ষিতে তিনি প্রাশিয়ার রাজার কাছে এই প্রতিশ্রুতি দাবি করেন যে, ভবিষ্যতে স্পেনের সিংহাসনে কোন হোহেনজোলার্ন রাজপুরুষের মনোনয়ন যেন দাবি না করা হয়। যাইহোক, প্রাশিয়ার রাজা এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং বিসমার্ককে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করতে নির্দেশ দেন। বলাবাহুল্য, বিসমার্ক এরূপ সুযোগের সন্ধানেই ছিলেন। তিনি এই রোপোর্টির সাহায্যে ফরাসী জনমানসে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যাতে ফ্রান্স বাধ্য হয় যুদ্ধ ঘোষণা করতে।

টিপ্পনী

বিসমার্কের রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া তৎক্ষনাৎ অনুভূত হয়েছিল। দুই রাষ্ট্রেরই যুদ্ধলিপ্সা তখন তুঙ্গে উঠেছিল। প্রাশিয়ার মানুষজন ফ্রান্সের প্রস্তাবকে রাজার অপমান বলে মনে হয়েছিল অণ্যদিকে ফরাসী বাসীরা মনে করে ছিল তাদের রাষ্ট্রদূত প্রাশিয়াতে অপমানিত হয়েছেন। এরসাথে দুইদেশের সংবাদপত্রগুলিতে মিথ্যা রিপোর্ট প্রকাশ করে একে অপরকে যুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল। যাইহোক, এই সমস্ত কিছুর প্রেক্ষিতেই ১৫ জুলাই ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ফ্রান্স প্রাশিয়া যুদ্ধ ছিল ফ্রান্সের ইতিহাসে এক বিধ্বংসী ও সর্বনাশা যুদ্ধ। যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন ফ্রান্স যে শুধু ইউরোপে একঘরে হয়ে গিয়েছিল তা নয়, দক্ষিণ জার্মাণীর রাষ্ট্রগুলিও যেমন, ব্যাভিরিয়া, বেডেন ও উরটেমবার্গ প্রশিয়ার পক্ষে যোগ দিয়েছিল। আসলে যেভাবে ফ্রান্স স্পেনের সিংহাসনে হোহেজোলার্ণ বংশের রাজপুত্রের দাবিকে কেন্দ্র করে প্রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল তা দক্ষিণ জার্মাণীর কাছে অত্যন্ত অপমানজনক বলে মনে হয়েছিল। এছাড়া ফরাসী সামরিক বাহিনী তাদের প্রতিপক্ষ শক্তির কোন অনুমাণই করতে পারে নি। তারা ছিল অদক্ষ ও সংগঠিত। প্রাশিয়ার বাহিনী থেকে তাদের সংখ্যাও ছিল কম এবং তাদের সেনানায়কেরা প্রাশিয়ার সেনানায়কদের মত দক্ষ ও নিপুণ ছিলেন না। ফলে আলসেস ও লোরনে ফ্রান্সের একের পর এক বিপর্যয় ঘটতে থাকে। অবশেষে সেজনের যুদ্ধে ফ্রান্স চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন বন্দী হন। এই যুদ্ধে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার ফরাসী সেনা আহত, নিহত কিংবা বন্দী হয়েছিল। ফরাসী বাহিনীর এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ে সারা বিশ্ব আলোড়িত হয়ে ওঠে।

ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন সেডানের যুদ্ধে প্রাশিয়ার কাছে পরাজিত ও বন্দী হলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ৪ সেপ্টেম্বর রবিবার ফরাসী আইনসভার অধিবেশন আহুত হয়। আইনসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই ফ্রান্সের জনগণ 'সাম্রাজ্য নিপাত যাক', 'প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক' প্রভৃতি শ্লোগান দিতে থাকে। গাম্বেত্তা জুলস ফাভর (Jules Favre) ও জুলস্ ফেরি (Jules Ferry) জণতাকে সাথে নিয়ে 'হোটেল দ্যা ভিল' (Hotel de ville) থেকে ফ্রান্সকে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলে ঘোষণা করে। ফরাসী সাম্রাজ্ঞী দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন।

প্রজাতন্ত্রী দল দেশের শাসন পরিচালনা ও প্রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য 'জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার' (Government of National Defence) নামে একটি অন্তর্বর্তি কালীন সরকার গঠন করে। এই সরকারের প্রধান নিযুক্ত হন জেনারেল লুই জুলেস ট্রচু (General Trochu)।

টিপ্পনী

ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে ১ আগষ্ট থেকে ১৮৭১ খ্রীষ্টব্দে ১ ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রায় ৬ মাস যুদ্ধ চলেছিল। এই যেদ্ধের দুটি পর্ব ছিল -যথা, সামাজিক ও প্রজাতান্ত্রিক। সমাজিক পর্বে ফরাসীবাহিনী বিধস্ত ও বন্দী হয়েছিল। এরপর ফ্রান্সে সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে এবং সম্রাট জার্মানীতে বন্দী হন। দ্বিতীয় পর্বের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র পাঁচ মাস। আলোচ্য পর্বে ফ্রান্সের জাতিয় প্রতিরক্ষা সরকার সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি অগ্রাহ্য করে প্রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল এবং ফ্রান্সকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল।

৫. প্যারিস অবরোধ :

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ১৯ সেপ্টেম্বর প্রাশিয়ার সেনাদল প্যারিস অবরোধ করে। জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার যে কোন মূল্যে প্রাশিয়ার অবরোধ ব্যার্থ করতে প্রস্তুত হয়। প্যারিসে বিপুল রসদ জোগাড় করা হয় এবং নাগরিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গাম্বেত্তা দেশবাসীকে সসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে বেলুনে চড়ে অবরুদ্ধ প্যারিস থেকে বেরিয়ে তুর-এ পৌছান। সেখানে তিনি প্রায় ব্যাক্তিগত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রদেশ সমূহের যুদ্ধোদ্যমকে নতুনভাবে অণুপ্রানিত করেন। বলাবাহুল্য, গাম্বেত্তা একটা নতুন সেনাদলও গঠন করেছিলেন। এই সেনাবাহিনীর প্রতিরোধ ক্ষমতা লক্ষ্য করে জার্মাণরা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত প্রস্তুতি ও যুদ্ধ সরঞ্জাম না থাকায় এই সেনাদল প্যারিসকে অবরোধ মুক্ত করতে ব্যার্থ হয়।

প্যারিসবাসী অশেষ দুঃখকষ্ঠ সহ্য করে দীর্ঘ চারমাস প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। নতুন ফরাসী বাহিনী প্যারিসকে অবরোধ মুক্ত করতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ফলপ্রদ হয় নি, কারণ, ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ২৭ অক্টোবর মেজ (Metz) এ ফরাসীরা আত্মসমর্পণ করে। কাদ্যেদর অভাবেই ছয় হাজার অফিসার ও ১৭৩০০০ মানুষ সহস্রাধিক কামান যুদ্ধ রসদ সহ আত্মসমর্পণ করেছিল। একমাস পর স্ট্রাসবর্গ (Strasbourg) আত্মসমর্পন করে এবং ১৯০০ সৈনিক যুদ্ধবন্দী হয়। যাইহোক, মেজ এর আত্মসমর্পণের পরই প্যারিস অবরোধ জার্মাণ সেনার সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং জার্মানী গাম্বেত্তার অবশিষ্ট বাহিনী ধ্বংস করতে উদ্যত হয়।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
146

প্যারিসের আত্মসমর্পন :

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারীর শুরু থেকেই জার্মানরা প্যারিস নগরীর উপর বোমাবর্ষণ শুরু কচরে। এর ফলে নগরের কিছু অংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংস হয়।

ইতিমধ্যে প্যারিসবাসী তীব্র খাদ্যসংকটের মুখে পড়েছিল। গতবছরে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ভেড়ার মাংসের যোগান ফুরিয়ে গিয়েছিল। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর মূল্যে স্বল্প পরিমাণ ঘোড়ার মাংসের যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে নিম্নমানের রুটির পর্যাপ্ত যোগান দেওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে। মানুষ অখাদ্য সুখাদ্য গ্রহণ করতে থাকে। জানুয়ারীর শেষে প্যারিসে সব ধরনের খাদ্যই নিঃশেষ হয়ে যায়। এদর মধ্যে প্যারিসে তীব্র শীত পড়লে মানুষের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে। এইভাবে প্যারিসের তীব্র শীত, অবরুদ্ধ নগরে খাদ্য সংকট এবং প্রুশীয় বাহিনীর প্রবল বোমাবর্ষণের চাপে পড়ে শেষপর্যন্ত ফরাসীরা ২৮ জানুয়ারী আত্মসমর্পণ করে।

টিপ্পনী

ফ্রাঙ্ককোর্টের চুক্তি (Treaty of Frankturt)

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ১০ই মে ফ্রান্সের জাতীয় সরকার জার্মানীর সাথে ফ্রাঙ্ককোর্টের চুক্তি স্বাক্ষর করে যুদ্ধের অবসান ঘটায়। এই চুক্তির শর্তানুযায়ি ফ্রান্স জার্মাণীকে আলসাস ও মেজদূর্গ সহ লোরেনের একটা বড় অংশ প্রদান করতে বাধ্য হয়। এছাড়া ফ্রান্স যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ জার্মানীকে ৫০ কোটি ফ্রাঁ দিতে রাজী হয়। স্থির হয় যে, ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান না করা পর্যন্ত উত্তর ফ্রান্সে যে জার্মান বাহিনী মোতায়েন থাকবে তার ব্যায় ফ্রান্স বহন করবে।

ইতালির সম্পূর্ণ ঐক্যসাধন :

ফ্রান্স প্রাশিয়া যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের প্রেক্ষিতে ইতালি রোম দখল করে নিয়ে তার ঐক্যকরণ সম্পূর্ণ করেছিল। রোমে পোপের শাসন অবসান ঘটানো হয়েছিল। বলাবাহুল্য, সেজনের যুদ্ধের পর ফরাসীবাহিনী পোপের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে ভিক্টর ইমানুয়েল এর সেনাদল পোপের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে সহজেই পরাজিত করেছিল। ১৮৭০ খ্রিঃ এ ২০ শে সেপ্টেম্বর রোম ইতালির দখলে চলে গিয়েছিল। এইভাবে ইতালির ঐক্য সম্পূর্ণ হয় এবং রোম রাজধানী হিসাবে আক্রমণ আত্মপ্রকাশ করে।

জার্মানীর ঐক্যসাধন :

ফ্রাঙ্কো প্রুশীয় যুদ্ধের সবচেয়ে বড় পরিণতি ছিল জার্মানীর ঐক্যসাধন এবং জার্মাণ সাম্রাজ্যের গঠন। বলাবাহুল্য বিসমার্ক জর্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করতে ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। যুদ্ধের সময় বিসমার্ক দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলিকে কিছু বিশেষ সুবিধা প্রদনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করে নিয়েছিলেন। যুদ্ধশেষে সমস্ত জার্মান রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হয় এবং কাইজার প্রথম উইলিয়াম ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ জানুয়ারী জার্মান সাম্রাজ্যের সম্রাট ঘোষিত হন। বার্লিন ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর রাজধানী হয়।

টিপ্পনী

৩.৪.১. প্যারিস কমিউন (paris Commune)

প্যারিস কমিউন কে মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম মেহেনতী জনতার শাসন বলে অভিহিত করা যায়। বলাবাহুল্য, প্যারিসের জনগণ প্রাশিয়ার কাছে জাতিয় সরকারের আত্মসমর্পন মেনে নিতে পারেনি। তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাওবার পক্ষে ছিল। এরুপ পরিস্থিতিতে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে মার্চ মাসে জাতীয় সরকার যখন প্যারিসের জণতা জার্মাণদের কাছ থেকে যে ২২০ টি কামান লুকিয়ে রেখেছিল তা সমর্পনের দাবি করে, তাতে প্যারিস অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। প্যারিস জণতা এই কামানগুলি সরকারের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে এবং রক্ষী বাহিনীও দেশের নাগরিকদের হত্যা করতে অসম্মত হয়। পরিবর্তে বাহিনী সরকারী অফিসারদের হত্যার হুমকি দেয়। এর ফলশ্রুতিতে প্যারিস জাতিয় রক্ষাবাহিনী (Paris National Guard) একটা নির্বাচন করে একটি সভা গঠন করে। এই সভাতে প্রজাতন্ত্রী ও জ্যাকোবিন দলের সদস্যদের প্রাধান্য ছিল। এছাড়া ছিল কিছু সমাজতন্ত্রী ও নৈরাজ্যবাদী। এভাবেই প্যারিস কমিউন গঠিত হয়। এটা ছিল বস্তুত প্যারিসের শ্রমজীবী জণতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটা সমান্তরাল সরকার। যাইহোক, প্যারিস জনতা রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য সংগঠিত হয়েছিল এবং অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছিল। প্যারিস কমিউন নতুন সমাজ গঠনের উপর জোর দিয়েছিল। এছাড়া কমিউন কয়েকটি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এই কর্মসূচীর মধ্যে ছিল কর্মশালাগুলিকে কো-অপরাটিভ (সমবায়)এ পরিণত করা। মে মাসের শেষে প্রায় ৪৩ টি কর্মশালাকে কো-অপরাটিভে রূপান্তর করা হয়েছিল। কলুভর মিউজিয়ামকে অস্ত্র তৈরির ফ্যাক্টরীতে পরিণত করা হয়েছিল, যা পরিচালনার ভার ওঅর্পিত হয়েছিল শ্রমজীবিদেদর উপর।

প্যারিস কমিউন কয়েকটি শ্রমিক কল্যাণমূলক কর্মসূচীও নিয়েছিল। এরপ্রেক্ষিতে ঠিকা মজুরদের রাত্রিকালীন কাজ নিষিদ্ধ করা হব। এছাড়া ক্ষতিপূরণ, জরিমানা ইত্যাদির নামে বেতন কাটার পদ্ধতিও বাতিল করা হয়। এমনকি বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বলাবাহুল্য, কমিউন প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের ধারণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই গঠিত হয়েছিল। কিন্তু কমিউনের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ধীরে ধীরে একনায়কতান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল। কমিউন গঠনের মূল লক্ষ্যই ছিল যারা কমিউনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে তাদের স্বার্থ রক্ষা ও মঙ্গল সাধন করা। কিন্তু ক্রমশ দেখা যায় এই আদর্শ তার গুরুত্ব হারাচ্ছে। ত্রাসে দ্বারা বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য কমিউন একটা 'জননিরাপত্তা সমিতি' গঠন করেছিল

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ২১ মে সরকার বাহিনী প্যারিসে প্রবেশ করে এবং কমিউনের সদস্যদের সাথে তাদের টানা সাতদিন যুদ্ধ চলে। কমিউনের সদস্যরা মন্টমার্ত্রের

কবরখানায় (Cemetry of Montmartre) নিজেদের রক্ষা করার শেষ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। কমিউন সদস্যরা পরাজিত হওয়ার সাথে সাথেই সেনাবাহিনী ও পুঁজিপতিরা প্যারিস নগর দখল করে নেয়। যুদ্ধশেষে দেখা যায় প্রায় ৩০ হাজার কমিউনের মানুষ নিহত হয়েছে।

৩.৪.২. রাশিয়া : দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে আধুনিকীকরণ

টিপ্পনী

রাশিয়ার সম্রাট জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকালে (১৮৫৫ - ১৮৮১) রাশিয়ার আধুনিকীকরণ :

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ১৮৫৫ থেকে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ার সম্রাট পদে অধিষ্ঠীত ছিলেন। রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের জন্য তিনি ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছেন। এছাড়া তিনিই ছিলেন একমাত্র জার যাকে হত্যা করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সংস্কার :

রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস (Nicholas I) এর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের জন্ম হয়েছিল ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ এপ্রিল মস্কোতে। দ্বিতীয় আলেকজান্ডার যাতে রাশিয়ার পরবর্তী সম্রাট হিসাবে সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারেন তার জন্য তাঁর পিতা শৈশবস্থা থেকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই দেখা যায় শৈশবস্থায় তাঁকে অশ্বারোহী সেনাদলের প্রধান পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। গোড়ার দিকে তাঁর প্রশিক্ষণ সামরিক নিয়মেই হয়েছিল এবং বয়সবৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর পদোন্নতি হয়েছিল। বলাবাহুল্য, দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে ছয়বছর বয়সে তাঁর পিতা মস্কো সামরিক বিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাপ্টেন কে. কে. মারডার (Captain K.k. Merder) এদর অধিনে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। ক্যাপ্টেন মারডার এর আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী আলেকজান্ডারকে প্রভাবিত করেছীল। দ্বিতীয় আলেকজান্ডার খ্যাতনামা কবি ভ্যামিলি ঝুকোভস্কি (Varily Zhukovsky) এর সংস্পর্শে ত্রসে বুদ্ধিবিভাসিত হয়েছিলেন। এছাড়া তরুণজার সমগ্র রাশিয়া ও ইউরোপ পরিভ্রমণ করেছিলেন। বলাবাহুল্য, ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম রুশ সম্রাট হিসাবে তিনিও সাইবেরিয়া ভ্রমণ করেছিলেন। এই সাইবেরিয়াতে তিনি ডিকেম্ব্রিষ্টদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য পিতাকে সাহায্য করার আবেদন জানিয়েছিলেন।

নিকোলাস তাঁর পুত্রের মধ্যে একজন শাসকের সকল গুণাবলীর প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। দ্বিতীয় আলেকজান্ডার আন্তরিকভাবে সকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ

টিপ্পনী

করেছিলেন। তিনি পরবর্তী সময়ে রাজসভার সদস্যপদ লাভ করেছিলেন এবং সামরিক বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবোধনের দায়িত্বও পেয়েছিলেন । এমনকি রাষ্ট্র পরিষদ (State Council) এর সমাবেশে তাঁর পিতার অনুপস্থিতিতে তিনিই সভা তত্ত্বাবোধনের দায়িত্ব নিতেন। তাঁর পিতা ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে 'Secret Committee on Peasant Affairs' নামে একটি সমিতির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। বলাবাহুল্য দ্বিতীয় আলেকজান্ডার প্রচলিত সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। আসলে তিনি এক স্বৈরতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার মধ্যেই তাঁর সকল প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। তাই রাশিয়ার প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে কোন সমস্যা প্রত্যক্ষ করেন নি। এইজন্য স্বাভাবিকভাবেই কেউ কখনো কল্পনা করেনি যে তিনি প্রচলিত ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবেন।

১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন প্রথম নিকোলাস এর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নতুন সম্রাট হিসাবে রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহন করেন। বলাবাহুল্য, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় এবং পিতার মৃত্যু আলেকজান্ডারকে বাধ্য করেছিল যুগপোযোগী ভাবাদর্শ গ্রহণ করতে । এরই প্রেক্ষিতে রাশিয়ার সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এক পরিবর্তন এসেছিল।

দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৯ ফ্রেবুয়ারী সম্রাট পদলাভ করেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয় ১৮৫৬ খ্রিঃ ২৬ আগষ্ট। এই সময়ের ব্যবধানে তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরিস্থিতি সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ অবণতি হচ্ছিল । ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ৯ সেপ্টেম্বর ক্রিমিয়ার শহর সেভাস্টেপল (Sevastopol) আত্মমর্পন করে। এরপরই আলেকজান্ডার শান্তির জন্য আপোষ মীমাংসার পন্থা অবলম্বণ করেন এবং ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ৩০ মার্চ প্যারিসের চুক্তি (treaty of paris) স্বাক্ষর করেন। এই যুদ্ধের পরিণতিতে রুশ সেনাবাহিনী একটা বড় অংশ বিনষ্ট হয় এবং রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের উপর তার অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলেকজান্ডার রাশিয়ার প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কার করতে বাধ্য হন।

১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই রুশ অভিজাতরা জারকে ভূমিদাসদের মুক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিন বলেছিলেন, 'আপনারা জানেন যে, দাসমালিকানার বর্তমান প্রথা বজায় রাখা চলে না ; "নিচের তলা থেকে ভূমিদাসত্ব বিলোপের জন্য অপেক্ষা করার থেকে ওপর তলা থেকে বিলোপ করাই ভালো ।" ("You Know that present system of sedrts ownership can not remain as it is ; it is better that we should abolish it from above that wait unitl it begins to abolish from below.")। আলেকজান্ডারের এই উক্তি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এই উক্তি প্রমাণ করে যে, আলেকজান্ডার সংস্কারের গুরুত্ব

উপলব্ধি করেছিলেন। যাইহোক, আলেকজান্ডার ভেবেছিলেন স্বৈরতন্ত্রের রূপান্তর আভ্যন্তরীণভাবেই করা ন্যায় সঙ্গত হবে।

যদিও আলেকজান্ডার রাশিয়া থেকে ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের সিদ্ধান্তে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ নিতে দ্বিধা করেননি। ভূমিদাসদের মুক্তি ছিল একটা জটিল বিষয়। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভূমিদাসদের মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি সিক্রেট কমিটি গঠন করেছিলেন দাসদের মুক্তির ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের জন্য। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ৯ মার্চ (পুরনো ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৯ ফ্রেবুয়ারী) 'মুক্তির ঘোষণাপত্র' (Edict of Emianicipation) জারি করে ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটান। বলাবাহুল্য, ভূমিদাসদের মুক্ত করার কাজ সহজ ছিল না। তিনি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনেকের কাছে বাধা পেয়েছিলেন। 'মুক্তির ঘোষণাপত্র' ২০ মিলিয়ন ভূমিদাস এবং প্রায় ত্রিশ মিলিয়ন রুশ কৃষককে (যে রাশিয়ার জনসংখভার ৮ শতাংশ ছিল) মুক্ত করেছিল। ভূমিদাসদের মুক্ত করার জন্য দ্বিতিয় আলেকজান্ডার 'মুক্তিদাতা জার' (Tsacr Liberator) অধিকার ভূষিত হয়েছেন।

ভূমিদাস প্রথার অবসানের পর দ্বিতীয় আলেকজান্ডার অনান্য সংস্কারকার্যে মনোনিবেশ করেছিলেন। ঐতিহাসিকেরা এই সংস্কার কার্যকে 'মহৎ সংস্কার' (Great Reforms) বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ১৮৬১র পরবর্তিকালে সংস্কারগুলিকে আলেকজান্ডার সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। তিনি কয়েকজন ব্যাক্তির উপর সংস্কারের খসড়া তৈরির দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। যদিও সংস্কারগুলির অণুমোদন তিনিই দিয়েছিলেন।

১৮৬৪ থেকে ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ এর মধ্যে আলেকজান্ডার বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক সংস্কার করেছিলেন; যেমন জেমস্টর্ভো (Zemstro) গঠন, যা ছিল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত সংস্কার। এছাড়া তিনি সেন্সর আইন, সামরিক আইন, শিক্ষা এবং বিচারবিভাগেও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেছিলেন। বলাবাহুল্য, আলেকজান্ডার তাঁর সংস্কারগুলিকে কার্যকর করতে সেইসব আমলাদের উপর আস্থা রেখেছিলেন যাঁরা তাঁর পিতার সময় থেকে শাসন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন। তাই এই সংস্কারগুলি Petrvaluev, Nicholas Milyutin এর নামের সাথে জড়িত ছিল। যাইহোক এই সংস্কারগুলি স্বৈরতন্ত্রের সামনে নতুন ধরণের চ্যালেঞ্জ এনেছিল। সংস্কার কার্য চলাকালীন আলেকজান্ডারকে অনেক বিপ্লবীও বিদ্রোহীদের সাথে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। বলাবাহুল্য, জারের উদারনৈতিক সংস্কারে প্রেক্ষিতেই এই উগ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল এবং এর মধ্যে কিছু প্রতিক্রিয়া জার আশা করেন নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পোল্যান্ডের বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা যায়। সেই সময় পোল্যান্ড রাশিয়ার একটা অংশ ছিল। জারের উদারনৈতিক সংস্কারের প্রেক্ষিতে পোল জাতিয়তাবাদীদের মধ্যে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

স্বাধীনতের আকাঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারা আরও স্বাধীনতার দাবিতে ওয়ারশতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল । এই বিদ্রোহের ফলে আলেকজান্ডার অনেকবেশি রক্ষণাত্মক হয়ে উঠেছিলেন এবং চেষ্টা করেছিলেন এই বিদ্রোহ দমন করতে। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেন নি। শেষপর্যন্ত তিনি পোল বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। এছাড়া রাশিয়ার অভ্যন্তরেও জারের সংস্কারগুলি মানুষের মধ্যে আরও পরিবর্তনের ইচ্ছাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। ১৮৫০ ও ১৮৬০ এর দশকে রাশিয়ার শিক্ষিত মানুষেরা খোলাখুলি জারের 'মহৎ সংস্কার' গুলির ভালো মন্দ দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করত এবং তাদের মধ্যে বেশিরভাগই নানাবিধ পরিবর্তনের কথা বলত। এছাড়া একটা বড় অংশের মানুষ ক্ষুদ্ধ ও হয়েছিল এবং যার পরিণতি ছিল রাজনৈতিক বৈপ্লবিক আন্দোলন, যা স্বৈরতন্ত্রের অবমান ঘটাতে চেয়েছিল।

অগ্রগতি পরিমাপ কর :

৫. বিখ্যাত 'উদ্যান পথ হত্যাকান্ড' কখন সংঘটিত হয়েছিল ?

৬. প্যারিস কমিউন কি ?

৭. রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্ডার কে 'মুক্তিদাতা জার' কেন বলা হয় ?

৩.৫. সংক্ষিপ্তসার

- ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব বা দ্বিতিয় ফরাসী বিপ্লবের সর্বজন বিদিত তাৎপর্য হল যে, এই বিপ্লব মানুষের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরকে মাত্রা দিয়েছিল।
- ফ্রান্সে পলিগণ্যক এর প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্তি এবং তাঁর স্বৈরাচারী ঘোষণা দেশে এক সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, যা কিছু দিনের মধ্যেই বিপ্লবের আকারে বিস্ফোরিত হয়েছিল।
- চেম্বার অফ ডেপুটিস পলিগণ্যাক মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু ফরাসীরাজ এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'তাঁর সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়'। এছাড়া তিনি এই চেম্বারকেই ভেঙে দিয়েছিলেন এবং নতুনভাবে ভোটের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক চেম্বার গঠন করতে যা তাঁর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হবে। কিন্তু ভোটদাতাদের চিন্তাভাবনা ছিল আলাদা। তাই ভোটের ফল রাজা ও মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে গিয়েছিল এবং তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছিল।
- দশম চার্লস তাঁর দমননীতিকে কার্যকর করতে গিয়ে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ শে জুলাই চারটি অর্ডিন্যান্স জারি করেছিলেন। এর দ্বারা (১) নবর্নির্মিত চেম্বার ভেঙে দেওয়া হয়। (২) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করা হয় (৩) নির্বাচন বিধি সংশোধন করে নির্বাচকেদর সংখ্যা ১ লক্ষ থেকে হ্রাস করে ২৫ হাজার করা হয়

এবং (৪) নতুন ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হয়।

- জুলাই অর্ডিন্যান্সের তাৎপর্য সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হলে তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছিল । জনগণ রাস্তায় সমবেত হয়ে প্রতিধ্বনি তুলেছিল 'মন্ত্রিসভার নিপাত চাইও' (অষ্টাদশ লুই স্বাক্ষরিত) 'সনদ অক্ষয় হউক' প্রভৃতি। এইভাবে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ২৮ জুলাই ফ্রান্সে এক গৃহযুদ্ধের সুচনা হয়েছিল। মূখ্যত প্রাক্তণ সৈনিক, প্রজাতন্ত্রীরা এবং শ্রমিকেরা সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল এবং বুরবোঁ রাজপরিবারের সাদা পতাকার পরিবর্তে ফ্রান্সের জাতিয় পতাকা হিসাবে বিপ্লবের ত্রিরঙ্গা পতাকা তুলে ধরেছিল।
- ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ তিনদিন স্থায়ী হয়েছিলন। এটাই ছিল জুলাই বিপ্লবের গৌরবময় তিনদিন। এই বিপ্লব প্যারিসের রাস্তাতেই সংঘটিত হয়েছিল। বিদ্রোহীদের সংখ্যা সম্ভবত ১০ হাজারের বেশি ছিল না। এমনকি প্যারিসে সরকারেরও ১৪ হাজারের বেশি সৈণ্য ছিল না।
- ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের প্রভাব পোল্যান্ড, জার্মানী, ইতালী, সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ড সহ ইউরোপের সবত্র অনুভূত হয়েছিল। এই বিপ্লব ইউরোপের অন্যত্র যেসব আন্দোলনগুলি স্বল্পসময়ের জন্য হলেও ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের ভিয়েনা বন্দোবস্তর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল সেগুলিকে উৎসাহিত করেছিল।
- জুলাই বিপ্লবের পর ফ্রান্সের সিংহাসনে লুই ফিলিপ অধিষ্ঠিত হলেও তিনি ফ্রান্সের জনগণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেদর আশা আকাঙ্খা পূরণে ব্যার্থ হয়েছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৪৮ খ্রিঃ ফ্রান্সে ফ্রেবুয়ারি বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।
- ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ ফ্রেবুয়ারী প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রি দলের যৌথ উদ্যোগে ফ্রান্সে একটা অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়েছিল। এই প্রজাতন্ত্রের দুটি মূল লক্ষ্য ছিল (১) সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং (২) বেকারত্ব দূরীকরণ । বলাবাহুল্য ২ মার্চ সার্বজনীন ভোটাধিকার কার্যকর হয়েছিল এবং এরফলে ফ্রান্সে ভোটদাতার সংখ্যা ৯ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছিল।
- ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দের ফ্রান্সে কুখ্যাত 'উদ্যানপথ হত্যাকান্ড' সংঘটিত হয় । এরপ্রেক্ষিতে ১৫০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয় এবং প্রচুর মানুষ আহত হয়। এছাড়া অনেক মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করে দেওয়া হয়।
- ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দের উদ্যানপথ হত্যাকান্ড এর পর ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র আরও একবছর টিকে থাকলেও বস্তুত তা ছিল মৃত লুই নেপোলিয়ন নামে মাত্র রাষ্ট্রপতি ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ফরাসী রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ শাসক। যাইহোক, ১৮৫২

টিপ্পনী

খ্রিঃ এ ২১ নভেম্বরের গণভোটে নেপোলিয়ন বিপুল জনসমর্থন পেয়েছিলেন। এরপর তিনি 'তৃতীয় নেপোলিয়ন' নাম নিয়ে ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

- স্বৈরাচারী রাজনীতিতে স্বাধীনতার কোন স্থান থাকে না। কিন্তু একজন স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে নেপোলিয়ন কিছুটা ভিন্ন ছিলেন এবং অনেক প্রগতিশীল ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিকর উন্নয়নে সর্বতভাবে প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং এরই প্রেক্ষিতে তাঁর রাজত্বকালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল। তাঁর আমলে শিল্পোঃপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সবক্ষেত্রে উন্নয়নের জোয়ার এসেছিল। শূধু তাই নয়, তাঁর রাজত্বকালে প্যারিস নগরের নবীকরণ হয়েছিল। পুণগর্ঠিত প্যারিস নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তা ইউরোপের সবচেয়ে আকর্ষনীয় ও মনোরম রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল।
- ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করেছিলেন। আলোচ্য সময়ে তাঁর সাম্রাজ্য ইউরোপের সকল দেশেদর কাছে স্বীকৃত হয়েছিল। এছাড়া তিনি ইংল্যান্ড ও পিডমন্টের সাথে মিত্রজোট তৈরি করেছিলেন এবং ক্রিমিয়াতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হয়েছিলেন।
- তৃতীয় নেপোলিয়নের অস্থির, কল্পনাবিলাসী, অদূরদর্শী ও আত্মঘাতী বিদেশনীতির নিদর্শন ছিল মেক্সিকো অভিযান। এই অভিযানে ফরাসী রাষ্ট্রের প্রচুর অর্থ ব্যায় হয়েছিল এবং ফরাসী রাজকোশ শূন্য হয়ে গিয়েছিল।
- প্যারিস কমিউনকে শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থানের আদি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। রাশিয়ার ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের জন্য তিনি ইতিহাসের পাতায় স্মরনীয় হয়ে আছেন।
- দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের জন্ম হয়েছিল ১৮১৮ খ্রিঃ এ ১৭ এপ্রিল মস্কোতে। তিনি ছিলেন রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাম এর জ্যেষ্ঠ্যপুত্র।
- ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ক্রিশিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন প্রথম নিকোলাসের মৃত্যু হয় এরপর দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নতুন সম্রাট হিসাবে রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহন করেন। বলাবাহুল্য, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় এবং পিতার মৃত্যু আলেকজান্ডারকে বাধ্য করেছিল যুগোপযোগী ভাবাদর্শ গ্রহণ করতে। এরই প্রেক্ষিতে রাশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এক পরিবর্তন এসেছিল।
- ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভূমিদাসদের মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু করেন। অবশেষে ১৮৬১ খ্রিঃএ ১৯ ফ্রেব্রুয়ারী ঘোষণাপত্র' জারি করে ভূমিদাসপ্রথার অবসান ঘটান। ভূমিদাসদের মুক্ত করার জন্য দ্বিতীয় আলেকজান্ডার 'মুক্তিদাতা জার' অধিষ্ঠায় ভূষিত হয়েছেন।

টিপ্পনী

- দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে একাধিক সংস্কার কার্য করেছিলেন, যেমন 'জেমস্টভো গঠন, যা ছিল স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সংক্রান্ত সংস্কার। এছাড়া তিনি সেন্সর আইন, সামরিক আইন, শিক্ষা এবং বিভাগেও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেছিলেন ল
- আলেকজান্ডারের সংস্কারগুলি স্বৈরতন্ত্রের সামনে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ এনেছিল। সংস্কারকার্য চলাকালীন আলেকজান্ডারকে অনেক বিপ্লবীও বিদ্রোহীদের সাথে মোকাবিলা করতে হয়েছিল।
- জারের উদারনৈতিক সংস্কারে প্রেক্ষিতে পোল্যান্ডে জাতীয়তা বাদীদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্খা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারা আরও স্বাধীনতার দাবিতে ওয়ারশতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। যদিও শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।
- রাশিয়ার অভ্যন্তরেও জারের সংস্কারগুলি মানুষের মধ্যে আরও পরিবর্তনের ইচ্ছাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। ১৮৫০ ও ১৮৬০ এর দশকে রাশীয়ার শিক্ষিত মানুষেরা খোলাখুলি জারের 'মহৎ সংস্কার' গুলির ভালো মন্দ দিক নিয়ে আলোচনা করত এবং তাদের মধ্যে বেশিরভাগই নানাবিধ পরিবর্তনের কথা বলত। এছাড় আ একটা বড় অংশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং যার পরিণতি ছিল রাজনৈতিক বৈপ্লবিক আন্দোলন, যা স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটাতে চেয়েছিল।

টিপ্পনী

৩.৬. শব্দপরিচিতি

১৮৩০ এর জুলাই বিপ্লব : ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব জুলাই বিপ্লব নামে পরিচিত। এই বিপ্লর ছিল ফরাসী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে উদারপন্থী ও বিপ্লবীদের ফলশ্রুতি।

১৮৪৮ এর ফ্রেবুয়ারী বিপ্লব : ফ্রান্সে ফ্রেবুয়ারী বিপ্লব লুই ফিলিপের জুলাই রাজতন্ত্রের পতন ঘটায় এবং দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে।

প্যারিস কমিউন : প্যারিসের শ্রমজীবী জণতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটা সমান্তরাল সরকার ছিল প্যারিস কমিউন। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিস কমিউন গঠিত হয়েছিল। যদিও ফ্রান্সের জাতীয় সরকার অল্পদিনের মধ্যে পতন ঘটিয়েছিল।

ভূমিদাস প্রথা : মধ্যযুগে ইউরোপে ভাড়াটে কৃষকরা ভূস্বামীর জমিতে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বংশানুক্রমে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য থাকত। এটাকেই বলা হয় ভূমিদাস প্রথা।

জার : ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে রাশিয়ার সম্রাটকে জার বলা হত।

৩.৭. উত্তরের সাহায্যে অগ্রগতির পরিমাপ :

১. ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব বা দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের সর্বজনবিদিত তাৎপর্য হল

যে, এই বিপ্লব মানুষের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরকে মাত্রা দিয়েছিল। বলাবাহুল্য, জুলাই বিপ্লবের সময়কালে নানা গুপ্তসমিতি গড়ে উঠেছিল ত্রুটিপূর্ণ শাসননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনীত হয়েছিল।

২. ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব পোল্যান্ড, জার্মানী, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসহ ইউরোপের সর্বত্র অনুভূত হয়েছিল।

টিপ্পনী

৩. ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বিপ্লবের পোর সার্ভিনিয়া পিডমন্টরাজ্য ইতালির একমাত্র আধুনিক উদারনৈতিক রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

৪. সাঁ সিমোঁ প্রথম সমাজতান্ত্রিক প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন।

৫. ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে কুখ্যাত 'উদ্যান পথ হত্যাকান্ড' সংঘটিত হয়েছিল।

৬. প্যারিস কমিউনকে শ্রমিক শ্রেণির অভ্যুত্থানের আদিদৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

৭. রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ করে বহু ভূমিদাস ও কৃষককে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন। তাই তাকে 'মুক্তিদাতা জার' বলা হয়।

৩.৮. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১. ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব কিভাবে ইউরোপের অনান্য দেশে প্রভাব ফেলেছিল ?

২. পোল বিদ্রোহ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩. ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ফ্রেবুয়ারী বিপ্লবের ফলাফল কি ছিল ?

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর :

১. ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের উদ্দেশ্য কি ছিল ?

২. ১৮৪৮ থেকে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অগ্রগতি আলোচনা কর।

৩. রাশিয়ার আধুনিকীকরণে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এর ভূমিকা আলোচনা কর। তাঁর কোন সংস্কারগুলি প্রচলিত ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনেছিল।

৪. বিশ্বের ইতিহাসে প্যারিস কমিউন একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচিত - এর স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

চতুর্থ একক

ইতালী ও জার্মাণীর ঐক্যসাধন এবং চীন ও জাপানের অগ্রগতি

টিপ্পনী

৪.০. ভূমিকা

৪.১. একক উদ্দেশ্য

৪.২. ইতালির ঐক্যসাধন

- ৪.২.১. যোসেফ ম্যাৎসিনি
- ৪.২.২. মাভুরের উত্থান
- ৪.২.৩. দক্ষিণ ইতালির আন্দোলন ও গ্যারিবল্ডীর ভূমিকা

৪.৩. জার্মানীর ঐক্যসাধন

- ৪.৩.১. বিসমার্কের ভূমিকা

৪.৪. উপনিবেশিকতাবাদের প্রতি চীনাদের প্রতিক্রিয়া : তাইপিং বিদ্রোহ

- ৪.৪.১.ক তাইপিং বিদ্রোহ
- ৪.৪.২. তুং চি পুনপ্রতিষ্ঠা

৪.৫. জাপান : মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা

- ৪.৫.১. মেইজি সংবিধান
- ৪.৫.২. মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রভাব

৪.৬. সংক্ষিপ্তসার

৪.৭. শব্দপরিচিতি

৪.৮. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

৪.০. ভূমিকা :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
157

এই এককে ইতালি ও জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন আলেচনা করা হবে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইতালি রাষ্ট্র খন্ড বিখন্ড হয়ে গিয়েছিল। ইতালিতে কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। প্রত্যেক নগর ছিল স্বশাসিত। কিন্তু ইতালীয় জাতীয়তাবাদীরা ইতালির ঐক্যসাধনের প্রচেষ্ঠার লিপ্ত হয়েছিল। তারা ধীরে ধীরে ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে অগ্রসর হয়েছিল। বলাবাহুল্য, ইতালির ঐক্য

টিপ্পনী

আন্দোলনের মুখ্য কান্ডারী ছিলেন যোসেফ ম্যাৎসিনি, কাউন্ট কাভুর ও গ্যারিবল্ডী। একইভাবে জার্মানিতেও নানাবিধ কারণে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। জার্মানীর ঐক্যে পথে অণ্যতম বাধা ছিল পবিত্র রোমাণ সাম্রাজ্য এবং নেপোলিয়নের শাসন। তবে শেষপর্যন্ত নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে জার্মানীর ঐক্য সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং অটোকন বিসমার্ক নামে এক রক্ষণশীল প্রুশীয় রাজনীতিবিদ্ জার্মাণীর ঐক্য সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

এছাড়া এই এককে আফিম যুদ্ধের পর চীন এবং মেইজি রেস্টোরেশন বা পুনঃ প্রতিষ্ঠার পর জাপানের কিরূপ অগ্রগতি হয়েছিল তা আলোচনা করা হবে। আফিম যুদ্ধে চীন পরাজিত হয়েছিল এবং তারপরেই চীনে সংঘটিত হয়েছিল তাইপিং বিদ্রোহ ও তুংচি রেস্টোরেশন বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তুংচি রেস্টোরেশনের পরই চীনের পুনরুত্থান ঘটেছিল। অণ্যদিকে মেইজি রেস্টোরেশনের পর জাপানে নতুন ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল যা দেশে নানাবিধ পরিবর্তন সাধন করেছিল।

৪.১. একক উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠের পর যা বোধগম্য হবে, তা হল -

- ইতালির ঐক্যসাধন ও একাজে যোসেফ ম্যাৎসিনি, কাউন্ট কাভুর ও গ্যারিবল্ডীর ভূমিকা।
- জার্মানীর ঐক্যসাধন এবং একাজে অটোফন বিসমার্কের ভূমিকা।
- ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরুপ চীনে তাইপিং বিদ্রোহ ও তুং চি পুনঃপ্রতিষ্ঠা।
- জাপানে মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

৪.২. ইতালির ঐক্যসাধন :

রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ইতালি এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইতালিন খন্ড বিখন্ড হয়ে যায় এবং আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপূর্ণ এক ভৌগলিক সত্তায় পরিণত হয়। মধ্য যুগে ইতালিতে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহরগুলির মধ্যে ছিল মিলান, ভেনিস, জেনোয়া ও ফ্লোরেন্স। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এই নগরগুলি প্রাচীনকালের গ্রীকনগরগুলির ন্যায় স্বশাসনের অধিকার আদায় করে নিয়েছিল। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সাথে ইতালির একটা ক্ষীণ যোগসূত্র ছিল। বলাবাহুল্য, কিছু ইতালীয় দেশপ্রেমীদের অদম্য আকাঙ্খা এবং সাধারণ ভাষা সাহিত্যের বিকাশ ঘটা সত্ত্বেও একটা রাজতন্ত্রের অধীনে ইতালির রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি।

ইতালিতে রাজনৈতিক ঐক্যের অভাবের পিছনে যে বিষয়গুলি দায়ী ছিল, তা

হল -

(১) মধ্যনযুগিয় জার্মান সম্রাট ইতালির উপোর প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হয় নি। যদিও এর প্রেক্ষিতে ইতালিতে দুটি পরস্পর বিরোধী সংঘাতকারী দলের সৃষ্টি হয়েছিল। এদের মধ্যে 'গিবলিন' (Ghibellines) দল জার্মানীর ঐতিহ্যের সমর্থক ছিল। অণ্যদিকে 'গুয়েলক' (Guelkh) দল ছিল এর বিরোধী।

(২) রোম ও তার প্রতিবেশী রাজ্যগুলির পোপ একইসাথে ধর্মীয় ও পার্থিব জগতের সমস্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোগ করতেন।

(৩) ইতালির নগরগুলির বাণিজ্যিক বিকাশ নগরগুলির মধ্যে বানীজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি করেছিল। পরিবারগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল ফ্লোরেন্সের মেদিচিরা। এরা শিল্পকলা ও শিক্ষায় পৃষ্টপোষকতা করতে এবং ভৌগলিক অভিযানে অর্থ সাহায্য দিত। ফলতঃ রেনেসাঁস এর যুগ থেকেই ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে ক্ষমতার লড়াইএ ইতালীয় উপদ্বীপ অন্যতম কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। ইতালির উপর প্রথমে স্পেনের এবং পরে অষ্ট্রিয়ার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজবংশেরও প্রভাব ছিল মিসিলিও নেপলনস রাজ্যে। বলাবাহুল্য দক্ষিণ ইতালির এই রাজ্যদ্বয়একত্রে দুই মিসিলি রাজ্য (Kingdom of the two Soicilies) নামে পরিচিত ছিল।

নেপোলিয়ন যুগ :

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অধীনস্থ ইতালি রাজ্যে উত্তর ও মধ্য ইতালির নগররাষ্ট্রগুলির শাসনভার অর্পিত হয়েছিল নেপোলিয়নের সৎপুত্রের উপর। একইসময় ইতালির দক্ষিণাংশে নেপোলিয়নের ভগ্নীপতি মুরাট (Joachim Murat) এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নেপোলিয়ন ইতালিতে এক আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন এবং এর ফলশ্রুতুতে ইতালিবাসীরা উদারনীতিবাদ ও স্বাধীনতার ধারণার সাথে পরিচিত হয়েছিল। এছাড়া নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ইতালির আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস ইতালীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের সঞ্চার করেছিল। এই জাতীয়তাবাদী আদর্শে আনুপ্রানীত হয়েই 'কার্বোনারী' (জলন্ত অঙ্গার) নামে এক গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমিতির লক্ষ্য ছিল বিদেশী নিয়ন্ত্রণ থেকে ইতালির মুক্তি এবং সংবিধানিক সরকার গঠন।

নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ভিয়েনা বন্দোবস্ত মারফৎ ইতালির উপর সার্বিভাবে অষ্ট্রিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে অস্ট্রিয়ার রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী মেটারনিখের প্রভাব ইতালিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বলাবাহুল্য মেটারনিখ ইতালিতে প্রাক্ নেপোলিয়ন যুগের অবস্থা ফিরিয়ে আণতে চেয়েছিলেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এর ফলে উত্তর ইতালির লোম্বার্দি ও ভেনেসিয়াতে অস্ট্রিয়ার সরাসরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মধ্য ইতালিতে পার্মা, মডেনা, টাস্কানী প্রভৃতি স্থানে অস্ট্রীয় হ্যাপসবার্গ বংশীয়দের শাসন পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। পোপ রোমের শাসনাধিকার লাভ করেছিলেন। দক্ষিন ইতালির সিমিলি ও নেপলসে বুরবোঁ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, মেটারনিখের সাথে পোপ ও দুই সিসিলি রাজ্যের বুরবোঁ শাসক প্রথম ফার্দিনান্দের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মেটারনিখ যুগে যে প্রতিক্রীয়াশীল শাসনব্যবস্থা চালু হয়েছিল তাতে ইতালিবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কারণ, তারা ইতিমধ্যে জাতিয়তাবাদী চেতনা ও স্বাধিনতার বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। একমাত্র সার্ভিনিয়ার রাজা প্রথম ভিক্টর ইমানুয়েল ইতালিবাসীর স্বার্থ রক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তিনিও শীঘ্র অস্ট্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল।

মেটারনিখের রক্ষণশীলতার যুগেই ইতালিতে মধ্যবিত্ত শ্রেনী, চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদারনৈতিক ভাবনায় ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই উদারনৈতিক ভাবনায় দুটি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছিল, এক, সংবিধানানিক সংস্কার এবং দুই, জাতিয় ঐক্য। কিন্তু কঠোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতালির উদারনীতিবাদীদের অন্তরাল থেকে তাদের কার্য পচরিচালনা করতে হত। তাই কার্বোনারী, ফ্রিম্যাসনথ (Free Masons), ফেডারেটি (Fedarati)র মত গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। নেপলস ও মিসিলিতে কার্বোনারী দলের বহুল সমর্থন ছিল।

১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব :

১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে দুই সিসিলি রাজ্যের রাজা ফার্দিনান্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহেদর ফলশ্রুতিতে ফার্দিনান্দ নেপলসে উদারপন্থীদের সংবিধানের দাবি মেনে নিয়ে ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে মেটারনিখ নেপলসে ফার্দিনান্দের স্বৈরাচারী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য দ্রুত প্রাশিয়ার রাজা এবং রাশিয়ার সম্রাটের কাছ থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনের জন্য বৈদেশিক হস্তক্ষেপের নীতি কার্যকর করার সমর্থন আদায় করে নিয়েছিলেন। এরপরেই অস্ট্রিয়া নেপলসে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিল। অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীর হাতে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়েছিল এবং প্রস্তাবিত সংবিধানও বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে পিডমন্টে এক সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ হয়েছিল এবং পরিস্থিতির চাপে ভিক্টর ইমানুয়েল ও তাঁর ভ্রাতা চার্লস অ্যালবার্ট এর অণূকূলে পদত্যাগ করেছিলেন। বলাবাহুল্য চার্লস অ্যালবার্ট উদারনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক ছিলেন। তিনি একটি সংবিধান ও জারি করেছিলেন কিন্তু অস্ট্রিয় বাহিনী পুনরায় হস্তক্ষেপ করায় পিডমন্টে স্বৈরতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব :

১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব মধ্য ইতালির জনগণের মধ্যে এক নতুন আশা ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। এখানকার উদারপন্থী বিপ্লবীরা ফ্রান্সের নতুন রাজা লুই ফিলিপের কাছ থেকে সাহায্য লাভের আশা করেছিল। যদিও প্রত্যাশিত সাহায্য তারা পায় নি। যাইহোক, পোপের রাজ্যেই প্রথম বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। বিদ্রোহীরা পোপের রাজ্য গণতন্ত্র ও জাতিয়তাবাদের প্রতীক হিসাবে লাল, সাদা ও সবুজ রঙের ত্রিবর্ণ ইতালীয় পতাকা উত্তোলণ করেছিলেন। পার্মা ওমোভেনাতে হ্যাপসবার্গ শাসকদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। যদিও অস্ট্রিয়ার বাহিনী পুনরায় এই বিদ্রোহগুলি দমন করেছিল।

টিপ্পনী

৪.২.১. যোসেফ ম্যাৎসিনি :

ইতালির জাতীয়তাবাদীরা ইতালির ঐক্যের ব্যাপারে সহমত পোষণ করলেও সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার মতাদর্শ ও পথ নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করত। বলাবাহুল্য, সমকালীন ইতালিতে ম্যাৎসিনির প্রজাতান্ত্রিক মতাদর্শ ছিল সব চেয়ে বৈপ্লবিক। যোসেফ ম্যাৎসিনি (১৮০৫ - ১৮৭২) জেনোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের পুত্র ছিলেন। তিনি কার্বোনারী দলের তরুণ সদস্য হিসাবে ১৮২০ - ২১ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহগুলিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। যাইহোক, ম্যাৎসিনি জনগণের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর প্রদর্শিত পথের মূল কথাই ছিল - 'ঈশ্বর জনগণ ও মানবতা'। বলাবাহুল, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আপাততদৃষ্টিতে ধর্মীয় মনে হলেও পোপতন্ত্রের প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা ছিল না। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি ইতালির যুবশক্তিকে প্রজাতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের লক্ষ্যে উপণীত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ম্যাৎসিনি একসময় উল্লেখ করেছিলেন যে, 'The tree of liberty does not fructify unless it is lalnted by the hands of citizens and rendered fertile by the blood of citizens and guarded by the swords of citizens' বলাবাহুল্য বক্তব্যে একদিকে ছিল ঐক্য ও স্বাধীনতার শ্লোগান অণ্যদিকে ছিল মুক্তি, সাম্য এবং মানবতার আদর্শ।

১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব :

১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে বিপ্লব সংঘটিত হবার পূর্বেই জানুয়ারীতে ইতালির দুই সিসিলি রাজ্যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এরপ্রেক্ষিতে নেপলসের রাজা দ্বিতীয় ফার্দিনান্দ একটি উদারনৈতিক সংবিধান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফ্রেবুয়ারি বিপ্লবের পর ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মার্চ মাসে পিডমন্টের রাজা চার্লস অ্যালবার্ট একটি সংবিধান গ্রহণ করেছিলেন যেখানে করদাতাদের ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে

টিপ্পনী

গঠিত পার্লামেন্টে মন্ত্রিসভার দায়িত্ব, সামন্ততান্ত্রিক সুবিধার বিলোপ এবং ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এছাড়া ভিয়েনায় মেটারনিখের পতনের সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে অস্ট্রিয়া অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে বিদ্রোহের আগুণ জ্বলে উঠেছিল। সেনাপতি র‍্যাডেটস্কি (Radetzky) কর্তৃক পরিচালিত অস্ট্রিয় বাহিনী মিলান থেকে বিওতাড়িত হয়েছিল এবং জনগণ চেয়েছিল সার্ভিনিয়া - পিডমন্ট এর মধ্যে লোম্বার্ডি অন্তর্ভুক্ত হোক । ভেনিসে দানিয়েল ম্যানিন এর নেতৃত্বে একটা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লোম্বার্ডি থেকে অস্ট্রিয়া বিতাড়িত হলে চার্লস অ্যালবার্ট উত্তর ইতালির বাকি অঞ্চলগুলিকে অষ্ট্রিয়ার অধিকার থেকে মুক্ত করার জন্য অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। দুই সিসিলি, পোপের রাজ্য, টাস্কানী ও লোম্বার্ডি অ্যালবার্টের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু এই রণোদ্যমন ছিল স্বল্পস্থায়ী। ১৮৪৮ খ্রিঃ মে মাসে পোপ ঘোষণা করেছিলেনযে, তাঁর পক্ষে ক্যাথলিক অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। দুই সিসিলি রাজ্যের বিদ্রোহ রাজা দ্বিতীয় ফার্দিনান্দ দমন করলে দুই মিসিলিও অ্যালবার্টকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। ঘটনাক্রমে ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জুলাইমাসে চার্লস অ্যালবার্ট কাস্টোজা (Custoza) র যুদ্ধে অস্ট্রিয় সেনাধ্যক্ষ র‍্যাডটস্কির কাছে পরাজিত হয় এবং অস্ট্রিয়া লোম্বার্ডি পুনর্দখল করে। যদিও ইতালির চরমপন্থীরা সহজে নিবৃত্ত হয় নি। তারা ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিদ্রোহ ঘোষনা করে পোপের রাজ্যে । পোপ নেপলসে পলায়ন করেন এবং যোসেফ ম্যাৎসিনির নেতৃত্বে 'রোমান প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। সিসিলি ও টাস্কানীতেও প্রজাতন্ত্রীরা সফল হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে চার্লস অ্যালবার্ট পুনরায় নতুন উদ্যম নিয়ে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবতীর্ণ হন। কিন্তু নোভারা (Novarra) র যুদ্ধে অস্ত্রিয় বাহিনীর হাতে তিনি আবার পরাজিত হন। শেষপর্যন্ত হতোদ্যম হয়ে তিনি তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল এর অনুকূলে পদত্যাগ করেন । এরপর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভ্রাতুস্পুত্র লুই নেপোলিয়ন, যিনি ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন, রোমে হস্তক্ষেপ করছেন । বলাবাহুল্য, সংবিধানকে অগ্রাহ্য করে, তৃতিয় নেপোলিয়ন রোমে এক সমারিক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন । ম্যাৎসিনির অনুগামীরা যোসেফ গ্যারিবল্ডির ফরাসী বাহিনীকে বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ করেছিল। যদিও শেষপর্যন্ত তারা ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাসে পরাজিত হয় । পোপ নবম পারাস ক্ষমতা ফিরে পান এবং উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধোচারণ করতে থাকেন। অস্ট্রিয়ার সহায়তায় টাস্কানীর শাসকের ক্ষমতায় ফিরে আসে এবং সিলিতে ফার্দিনান্দের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভেনিসে প্রজাতন্তরের পতন ঘটে। এইভাবে একমাত্র সার্ভিনিয়া পিডমন্ট ছাড়া ১৮৪৮ এর বিপ্লব ইতালির সর্বত্র ব্যার্থ হয়েছিল । বলাবাহুল্য, সার্ভিনিয়া পিডমন্টেই একমাত্র সংবিধান বজায় ছিল । পরবর্তি কালে এটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়িয়েছিল। ১৮৪৮ - ৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ব্যর্থতার সত্ত্বেও ইতালির জাতীয়তাবাদী আবেগ

হ্রাস পায় নি। বিপ্লবীদের মধ্যে কিছু ছিল প্রজাতন্ত্রী এবং বেশিরভাগই প্রাদেশিক সরকার ও যাজকতন্ত্রের বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এরূপ এক জাতীয়তাবাদী ছিলেন দানিয়েল ম্যানিন। ম্যানিন ইতালীয় জাতীয় সমিতি (italian National Society) নামে যে সংগঠনের পরিচালক ছিলেন সেই সংগঠনের পক্ষ থেকেই দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল এর অধীনে ঐক্যবদ্ধ ইতালি রাষ্ট্র গড়ে তোলার কথা প্রচার করা হয়েছিল। এই আদর্শ সফল জাতীয়তাবাদীদের আকৃষ্ট করেছিল।

টিপ্পনী

৪.২.২. কাভুরের উত্থান :

১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের পর ইতালিতে একমাত্র সার্বিনিয়া পিডমন্ট রাজ্যেই আধুনিক উদারনৈতিক রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর পিছনে মুখ্য অবদান ছিল কাউন্ট ক্যামিলো ডি কাভুর (Coun Camillo Di Cavour) এর। বলাবাহুল্য ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে পিডমন্টের এক অভিজাত পরিবারে কাভুরের জন্ম হয়েছিল। শিক্ষা শেষ করে কাভুর সামরিক বিভাগে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। ইংরেজী গ্রন্থাদির পাঠ এবং পরবর্তীকালে ব্রিটেন ভ্রমণের প্রেক্ষিতে তাঁর মধ্যে উদারনৈতিক আদর্শের প্রতি গভীর অণুরাগের সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া কাভুর বাস্তববাদী হওয়ায় তিনি সেইসময়ে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।

১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে সেন্সর প্রথা শিথিল হলে কাভুর ইল রিসর্জিমেন্টো নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।এই পত্রিকা মারফৎ তিনি কিছু সংস্কার কার্য এবং ইতালির ঐক্যের কথা প্রচার করতে শুরু করেছিললেন। তিনি চেম্বার অব ডেপুটিস বা প্রতিনিধি সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সকলকে প্রভাবিত করেছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কৃষি ও বানিজ্য মন্ত্রীপদ লাভ করেন এবং এর দুই বছর পর প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন। ইংল্যান্ডের অণুকরণে তিনি এক জণকল্যাণকর রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন। সার্ডিনিয়া পিডমন্টের আগে থেকেই সংসদ ব্যাবস্থাযুক্ত সরকার বলবৎ ছিল। কাভুরের নির্দেশনায় রাজ্যে বাণিজ্য ও শিল্পে উন্নয়ন ঘটেছিল। প্রসঙ্গত, তিনি শুল্ক হ্রাস করেছিলেন এবং কারখানা স্থাপন ও যন্ত্রের ব্যবহারে উৎসাহ দিয়েছিলেন। রাস্তাঘাট ও রেলপথের সম্প্রসারণ করে তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য কাভুর শুধুমাত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি সাম্যের আদর্শেও বিশ্বাস করতেন। এই সাম্যের আদর্শ সার্ভিনিয়ার করব্যবস্ধার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

কাভুর ছিলেন একজন বাস্তববাদী রাজনীতিক। তাই তিনি ইতালির ঐক্যকরণের জন্য ডান, বাম, মধ্যপন্থী সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা করেছিলেন। তিনি কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না এবং পরিস্থিতি অনুসারে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। প্রজাতন্ত্রীদের বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি তিনি আস্থাশীল ছিলেন না । তিনি চার্চের প্রভাব হ্রাস করেছিলেন এবং জেসুইটের বহিষ্কার ও মঠপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দমন করেছিলেন । বলাবাহুল্য, কাভুর সার্ভিনিয়ার নেতৃত্বে ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন । কারণ আধুনিক উদারনৈতিক রাষ্ট্র হিসাবে সার্ডিনিয়াই ছিল এর জন্য উপযুক্ত।

টিপ্পনী

ইতালির স্বাধীনতাযুদ্ধ :

উত্তর ও মধ্য ইতালির ঐক্যসাধন :

ইতালিচর ঐক্যসাধনের জন্য ম্যাৎসিনি ইতালিবাসীকে 'একাগ্রতার সাথে এককভাবে এগিয়ে চলার' যে নীতি অণুসরণের কথা বলেছিলেন কাভুরের কাছে তা বাস্তব সম্মত ছিল না । কাভুর জানতেন ইতালির ঐক্যের প্রধান বাধা অস্ট্রিয়াকে অপসারণের কাজ এককভাবে ইতালিবাসীর পক্ষে সম্ভবনয় । তাই তাঁর উদ্যোগে ইতালির ঐক্যের স্বার্থে সার্ডিনিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে অংশ গ্রহণ করেছিল । কাভুর আশা করেছিলেন যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়া রাশিয়ার পক্ষ নেবে। কিন্তু অস্ট্রিয়া এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকায় সার্ডনিয়া বিশেষ সুবিধা পায় নি । যাইহোক, কাভুর যুদ্ধের সমাপ্তির পর ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসে শান্তি সম্মেলনে ইতালির উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যের প্রশ্নটিকে উত্থাপন করে ইতালির সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে তুলে ধরেছিলেন । এছাড়া তিনি ঐক্যবদ্ধ ইতালি রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে ইতালীয় উপদ্বীপ থেকে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়ন করতে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের কাছে সাহায্য প্রার্থনাও করে ছিলেন।

তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে করছিলেন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সার্ডিনিয়াকে সাহায্য করলে তিনি ফরাসী উদারপন্থীদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হবেন। এছাড়া তিনি সার্ডিনিয়া থেকে কিছু সুবিধা আদায়েরও আশা করেছিলেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তৃতীয় নেপোলিয়ন কতকগুলি কারণে ইতালিকে সাহায্য করতে ইতঃস্তত বোধ করেছিলেন, যেগুলি হল -

- অস্ট্রিয়া কঠিন প্রতিপক্ষ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝুঁকি ছিল।
- ঐক্যবদ্ধ ইতালির ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার প্রবণতা ছিল।
- ঐক্যবদ্ধ ইতালি পোপতন্ত্রের ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে এই আশঙ্কায় অনেক ফরাসী ক্যাথলিক নেপোলিয়নের বিরোধীতা করেছিল।

১৮৫৮ খ্রিঃ এ জানুয়ারী মাসে জনৈক ইতালীয় বিপ্লবী ফেলিস অর্সিনি (Felice Orsini)তৃতিয় নেপোলিয়নের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ এই অপ্রীতিকর ঘটনা ফ্রান্সের সঙ্গে পিডমন্টের হৃদ্য সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্র কোন

সমস্যা সৃষ্টি করেনি। অর্সিনি কারাগার থেকে তৃতীয় নেপোলিয়নের কাছে ক্ষমপ্রার্থী হলে নেপোলিয়ন ইতালির ঐক্য আন্দোলনে সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাসে প্লম্বিয়ার্স নামক স্থানে এক গোপন বৈঠক নেপোলিয়ন প্রস্তাব দেন যে, ফ্রান্সে সার্দিনিয়াকে সাহায্য করবে এবং এই দুটি রাজ্য সার্ডিনিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হবে। অণ্যদিকে মধ্য ইতালির ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি এবং পোপের রাজ্যের কিছু অংশ নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা হবে। ইতালির দক্ষিণাংশের কোন পরিবর্তন করা হবে না এবং রোমের উপর পোপের পূর্ণকর্তৃত্ব বজায় থাকবে। এই সাহায্যের বিনিময়ে ফ্রান্সন নিস (ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর) এবং স্যাভয় (আল্পীয় প্রদেশ) লাভ করবে। এরপর নেপোলিয়ন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার নিরপেক্ষ থাকাকে হাতিয়ার করে রাশিয়ার কাছ থেকে এই অস্ত্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন। পরিশেষে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে সার্ডিনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল এর কন্যা ক্লোটিল্ড এর সাথে তৃতীয় নেপোলিয়নের জ্ঞাতিভাই প্রিন্স ভিক্টর নেপোলিয়নের বিবাহ সম্পন্ন হলনে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে প্লম্বিয়ার্স এর চুক্তি (Pact of Plombiers) আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হয়। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে পিডমন্ট ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং পরিকল্পনা মত ফ্রান্সের সহযোগিতায় পিডমন্ট অস্ট্রিয়াকে ম্যাজেন্টা (Magenta) ও সোলফেরিনো (Solferina)র যুদ্ধে পরাজিত করে।

পিডমন্টের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পার্মো, মকোডেনা এবং টাস্কানীতে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। এর ফলে এই সব রাজ্যের রাজারা সিংহাসন হারায় এবং জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতা দখল করে নেয়। তারা সার্ডিনিয়া রাজ্যের মধ্যে পোপের রাজ্যসহ মধ্য ইতালির এই রাজ্যগুলির অন্তর্ভূক্তির দাবি জানায়। তৃতীয় নেপোলিয়ন এরূপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ফরাসী ক্যাথলিকরা পোপের রাজ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সম্রাটের হস্তক্ষেপের জন্য নেপোলিয়নকে দোষ দিতে থাকে। এরই মধ্যে প্রাশিয়া রাইন নদীর তীরে সৈন্য সমাবেশ করলে এবং অস্ট্রিয়ার বাহিনী ভেনেসিয়াতে অতিরিক্ত সেনাসাহায্য লাভ করলে পরিস্থিতি ফ্রান্সের প্রতিকূলে চলে যেতে শুরু করে। এইসময় প্রাশিয়ার সাথে কোন যুদ্ধে না জড়িয়ে তৃতীয় নেপোলিয়ন আকস্মিকভাবে সার্ডিনিয়ার সাথে কোন আলোচনা না করেই ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সাথে ভিল্লাফ্রাঙ্কার (Villafranca) শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। বলাবাহুল্য তৃতীয় নেপোলিয়নের এই পদক্ষেপ সার্ডিনিয়ারের পক্ষে শুভ ছিল না।

ভিল্লাফ্রাঙ্কার চুক্তিতে স্থির হয়েছিল যে, -

- সার্ডিনিয়া লোম্বার্ডী লাভ করবে।
- অস্ট্রিয়ার হাতে ভেনেসিয়া থাকবে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- মধ্য ইতালির বিতাড়িত শাসকদের ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে।
- পোপের সভাপতিত্বে একটি ইতালীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে।

এই চুক্তি সম্পাদনের জন্য তৃতীয় নেপোলিয়নন ইতালির জাতীয়তাবাদী ও ফরাসী উদারপন্থীদের কাছে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। কাভুর এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। এরফলে সার্ডিনিয়ার রাজার উপরেই ইতালির ঐক্যসাধনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। বলাবাহুল্য, সার্ডিনিয়ার রাজা ভিল্লনাফ্রাঙ্কার চুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। পরে অস্ট্রিয়ার সাথে পিডমন্ট সার্ডিনিয়া রাজ্যের জুরিখের সন্ধি (Treaty of Zurich) স্বাক্ষরিত হয়। প্রসঙ্গত পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার রাজ্যের সাথে লোম্বার্ডের সংযোজনের মধ্যে দিয়েই ইতালির ঐক্যসাধনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটেছিল।

ভিল্লাফ্রাঙ্কার চুক্তি মধ্য ইতালিনর জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে পুরনো শাসকদের গ্রহণ না করার মানসিকতাকে আরও দৃঢ় করেছিল। তারা শ্লোগান তুলেছিল যে, "ইতালির নিজের ব্যাপার নিজেই সামলাবে"। এছাড়া মধ্য ইতালি ও পোপের রাজ্যের একাংশের মানুষজন গণভোটের আয়োজন করে এবং সার্ডিনিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার পক্ষে ভোট দেয়। প্রথমে তৃতীয় নেপোলিয়ন এতে স্বীকৃতি দেননি। ঘটনাক্রমে কাভুর স্বেচ্ছায় তাঁর পদে ফিরে আসেন এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথে দর কষাকষি শুরু করেন। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ভিল্লাফ্রাঙ্কার চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে তৃতীয় নেপোলিয়ন ও দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল তুরিন চুক্তি (Treaty of Turin) স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী সার্ডিনিয়া ফ্রান্সকে স্যাভয় ও নিস প্রদান করলেও পরিবর্তে সার্ডিনিয়ার সাথে লোম্বার্ডী ছাড়াও পার্মা,মোভেনা, টাস্কানি এবং পোপের রাজ্য রোমাগ্না (Romagna) র সংযুক্তির ব্যাপারে ফ্রান্সের সমর্থন আদায় করে নেয়। বলাবাহুল্য, সার্ডিনিয়ার সাথে পোপের রাজ্যাংশ সহ মধ্য ইতালির ডাচিগুলির সংযুক্তির মধ্য দিয়ে ইতালির ঐক্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

৪.২.৩. দক্ষিণ ইতালির আন্দোলন ও গ্যারিবল্ডীর ভূমিকা :

উত্তর ও মধ্য ইতালির ঐক্যসাধনের পর দক্ষিণ ইতালির সিসিলি ও নেপলস রাজ্যদুটিকে বৃহত্তর ইতালির সাথে যুক্ত করার সম্ভাবণা তৈরি হয়েছিল। দক্ষিণ ইতালিতে জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রসারে যে ব্যাক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন যোসেফ গ্যারিবল্ডী (Joseph Garibaldi 1870 - 1882)। গ্যারিবল্ডী ছিলেন নিসের অধিবাসী এবং তিনি সার্ডিনিয়ার নৌবাহিনীতে নাবিক বৃত্তি করতেন। ইয়ং ইতালি দলের জাতীয়তাবাদী ও প্রজাতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্যাভয় এর বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। এবং এই অপরাধে তাঁর প্রাণদন্ডের আদেশ হয়েছিল। যদিও তিনি দক্ষিণ আমেরিকা পালিয়ে গিয়েছিলেন। দক্ষিণ

আমেরিকাতে তিনি প্রবাসী ইতালীয়দের সংগঠিত করে দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বলাবাহুল্য, গ্যারিবল্ডী দীর্ঘ ১৪ বছর পর ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ইতালিতে ফিরে আসেন এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সার্ডিনিয়ার যুদ্ধ অংশ গ্রহণ করেন ও রোমান প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করেন। কিন্তু ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রীরা ব্যার্থ হলে তিনি পুণরায় নিউহির্কে চলা যান এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এরপর ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইতালিতে প্রত্যাবর্তণ করে স্বদেশভূমির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন।

টিপ্পনী

সেই সময় দক্ষিণ ইতালিতে দ্বিতীয় ফার্দিনান্দের উত্তরাধিকারী দ্বিতিয় ফ্রান্সিস এর চরম প্রতিক্রিয়াশীল শাসন বলবৎ ছিল। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে দুই সিসিলি রাজ্যের জনগণ উত্তর ও মধ্য ইতালির আন্দোলননে উৎসাহিত হয়ে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীরা সংগ্রামী নেতা গ্যারিবল্ডীর সাহায্য চায় এবং এরই প্রেক্ষিতে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে মে মাসে বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে গ্যারিবল্ডী তাঁর বিখ্যাত 'লালকোর্তা'ক বাহিনীর সহস্র অণুচর নিয়ে সিসিলির 'মার্সালা' নগরীতে উপস্থিত হন। প্রবল জণসমর্থন তাঁর পক্ষে সমবেত হয়। কিন্তু সার্ডিনিয়ার সরকার ও দুই সিসিলি রাজ্যের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাই কাভুর কূটনৈতিক স্বার্থে গ্যারিবল্ডীর অগ্রগতির বিরোধিতা করলেই গোপোনে তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। সিসিলির রক্ষী বাহিনী তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল এবং তিন মাসের মধ্যে গ্যারিবল্ডি ও তাঁর লালকোর্তা বাহিনী সিসিলির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল। এরপর গ্যারিবল্ডী নেপলস অধিকারে অগ্রসর হয়েছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস পলায়ন করেন এবং গ্যায়েটা (Gaeta) তে আশ্রয় নেন।

আলোচ্য সময়ে গ্যারিবল্ডীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তিনি নিজেকে সিসিলি ও নেপলসের 'সর্বাধিনায়ক; বলে ঘোষণা করেছিলেন। এছাড়া তিনি রোম অভিযান এবং দ্বিতিয় ভিক্টর ইমানুয়েল এর হাতে দক্ষিণ ইতালি তুলে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছিলেন। তবে গ্যারিবল্ডীর রোম অভিযান বিপজ্জনক ছিল। কারণ, ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে রোমে তৃতীয় নেপোলিয়নের ফরাসী বাহিনী মোতায়েন ছিল এবং অণুগত ক্যাথলিকরাও পোপের রাজ্য রোম আক্রমণে বিরোধীতা করেছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে কাভুর ও দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং পোপের রাজ্যে সার্ডিনিয়ার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী নেপলসে 'লালকোর্তা' বাহিনীর সাথে মিলিত হয়। এরপর পোপের বিরোধীতা সত্ত্বেও কাভুর সার্ডিনিয়ার মধ্যে রোম ও তার প্রতিবেশি রাজ্যগুলি ব্যাতীত পোপের রাজ্যের অন্তভুক্তির কথা ঘোষণা করেন। গ্যারিবল্ডী দুই সিসিলি রাজ্য রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের হাতে তুলে দেন। রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস আত্মসমর্পন করেন এবং নির্বাসিত হন। পোপের রাজ্য মার্চেস (Marches) ও আম্ব্রিয়া (Umbria) তে গণভোট অনুষ্ঠিত

টিপ্পনী

হয় এবং রাজ্যদুটি পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার সাথে সংযুক্তিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। এরইপ্রেক্ষিতে ইতালির ঐক্য আন্দোলনের তৃতীয় পর্বের সমাপ্তি ঘটে। এরপর আর কোন বাধা ছিল না। কারণ, অস্ট্রিয়া ইতালির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার মত অবস্থায় ছিল না। ব্রিটিশ জণমত ইতালির ঐক্যসাধনের পক্ষে ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়নের কাছে ইতালীর এই সাফল্য অভাবনীয় ছিল। যাইহোক একমাত্র তৃতীয় নেপোলিয়নই রোমে তাঁর শক্তিশালী প্রতিরোধ বজায় রাখেন এবং সার্ডিনিয়াকে পোপের রাজ্যের অবশিষ্ঠাংশ দখলে সাবধান করে দেন।

রোম ও ভেনেসিয়া ব্যাতিত ঐক্যবদ্ধ ইতালি রাষ্ট্রের প্রথম পার্লামেন্ট আহত হয় ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে। এই পার্লামেন্ট দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়লকে পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার রাজা হিসাবে উল্লেখ না করে ইতালির রাজা হিসাবে উল্লেখ না করে ইতালির রাজা হিসাবে ঘোষণা করে। এর ছয়মাস পরই কাভুর মারা যান।

অগ্রগতির পরিমাপ কর :

১. ইতালিতে রাজনৈতিক ঐক্য না থাকার পিছনে যে কোন দুটি কারণ উল্লেখ কর।

২. যোসেফ ম্যাৎসিনি কে ছিলেন ?

৩. কাভুর কে ছিলেন ?

৪.৩. জার্মাণীর ঐক্যসাধন :

পবিত্র রোমাণ সাম্রাজ্য :

ঊনবিংশ শতকে ইতালির মত জার্মাণীরও রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব ছিল। ষোড়শ শতকে পবিত্র রোমানক সাম্রাজ্য জার্মানীভাষী মানুষজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। যদিও তত্ত্বগতভাবে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে খ্রিষ্টীয় শাসকবৃন্দ ও জনগণের উপর পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক আধিপত্য ছিল। যাইহোক এই সময়পর্বে জার্মাণদের মধ্যে এক সার্বজনীন ভাষা, ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চার হয়েছিল। তারা মনে করেছিল যে, তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি পুরাতন হয়েগেছে এবং তার সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু সেকানে বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে এই সংস্কারের পদ্ধতি ও লক্ষ্য নিয়ে বিবাদ ছিল। সেখানকার আঞ্চলিক রাজপুরুষ, ডিউক, প্রিন্স, নাইটরা নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত ছিল। এছাড়া ধর্মীয় সংস্কারের প্রেক্ষিতে জার্মাণবাসী প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে ও আবার লুথারপন্থী ও কেলভিনপন্থীদের বিভাজন ছিল। প্রত্যেকটা জার্মাণরাষ্ট্র জার্মাণ জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে খ্রিষ্টধর্মের নিজ নিজ বিশ্বাসের প্রতি বেশি অনুগত ছিল।

ষোড়শ শতকের সূচনায় যখন একদিকে জার্মাণ শহর গুলিতে পুঁজিবাদের

বিকাশ ঘটেছিল এবং স্পেনীয় ও পর্তুগীজ সামুদ্রিক বাণিজ্য থেকে মুনাফা লাভ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটেছিল তখন অণ্যদিকে আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দিয়েছিল। ত্রিশবছরের যুদ্ধ (১৬১৮ - ১৬৪৮) এর পর স্বাধীন জার্মাণ প্রিন্সদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তারা সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল। জার্মাণ প্রিন্সরা আঞ্চলিক সভার বিলোপ করে স্বৈরাচারী শাসণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এছাড়া কিছু প্রিন্স সমরাভিযান কিংবা বৈবাহিক স্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল। বলাবাহুল্য, এই স্বাধীন স্বাধীন জার্মাণ রাজ্যগুলি শক্তিশালী হতে শুরু করলে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অষ্টাদশ শতকে অস্ট্রিয়া ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জার্মাণ রাজ্য। অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশের প্রতিভু পবিত্র রোমান সম্রাটের মুকুট ধারণ করতেন। কিন্তু অস্ট্রিয়ার মধ্যে বোহনেমিয়া ও হাঙ্গেরীর মত একেবারে আলাদা ধরণের অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্রান্ডেনবার্গ-প্রশিয়ায় শাসন করত হোহেনজোলার্ন বংশ। এছাড়া ব্যাভেরিয়া, স্যাক্সনী ও হ্যানোভার (Hanover) এর মত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যও ছিল।

টিপ্পনী

নেপোলিয়নীয় যুগে জার্মাণী :

ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তাঁর রাজত্বকালে জার্মাণীতে নাইটদের শাসনাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখন্ডের অবলুপ্তি ঘটিয়ে এবং অধিকাংশ স্বাধীন নগরীর অস্তিত্ব মুছে দিয়ে স্বাধীন জার্মাণ রাজ্যের সংখ্যা তিনশ থেকে কমিয়ে ঊনচল্লিশটি করেছিলেন। এর মধ্যে রাইন নদীর পূর্বদিকে কিছু নগর ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। যাইহোক, এইভাবে ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ৩৯ টি রাষ্ট্র নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন রাইন রাষ্ট্রসংঘ (Confederation of Rhine)। উত্তর ও পশ্চিম জার্মাণীতে প্রাশিয়া সহ কিছু জার্মাণ রাজ্য নিয়ে একটা বড় রাজ্য গড়ে তোলা হয়েছিল, যার শাসক ছিলেন নেপোলিয়নের ভ্রাতা জনেরোম (Jerome)। বলাবাহুল্য, জার্মাণীতে নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপের ফলে সেখানে সামন্ততন্ত্রও ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ ঘটেছিল, আইনেদর দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান বলে ঘোষিত হয়েছিল এবং কোভ নেপোলিয়নের নীতি ও কর্মপন্থা কার্যকর হয়েছিল।

ভিয়েনা শান্তি সম্মেলন :

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পরাজয়ের পর ভিয়েনা শান্তি সম্মেলন আহত হয়েছিল। এই সম্মেলনে জার্মানী সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তাতে জার্মানীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির পুনঃস্থাপন বা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যেদর পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করা হয়নি। বরং ভিয়েনা বন্দোবস্ত অণুযায়ী ৩৯ টি রাজ্য নিয়ে জার্মাণ রাষ্ট্রসংঘ

টিপ্পনী

(German Confedertion) এবং 'ডায়েট' নামে একটি প্রতিনিধি সভা গঠন করা হয় । জার্মান রাষ্ট্রসংঘে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় । এই সময়ে অস্ট্রিয়াতে রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স ক্লেমেন্স মেটারনিখের কর্তৃত্ব ছিল। বলাবাহুল্য মেটারনিখ ছিলেন পুরাতনতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং পরিবর্তন বিরোধী । তিনি ঐক্যবদ্ধ জার্মাণীকে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করতেন। তাই ডায়েট এর সাহয্যে তিনি রাষ্ট্রসংঘে রক্ষণশীলনীতি কঠোরভাবে প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছিলেন । যদিও দক্ষিণ জার্মাণীর কিছু রাজ্য নেপোলিয়নের আইন বলবৎ রেখেছিল এবং সনদ ও প্রদান করেছিল। কিন্তু জার্মাণ প্রিন্সরা সংবাদপত্র ও পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন এবং উদারপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পুলিশ ব্যবস্থাকে কঠোর করা হয়েছিল।

উত্তর ও মধ্য জার্মানীতে রক্ষণশীল শাসন কঠোরভাবে কায়েম করা হয়েছিলল । প্রাশীয়া ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে আঞ্চলিক শুল্কের বিলুপ্ত কচরে রাজ্যেদর অভ্যন্তরে অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে উদারনৈতিক চিন্তাভাবনা সক্রিয় ছিল এবং ছাত্ররা গুপ্ত সমিতি গঠন করছিল । মধ্যবিত্ত শ্রেনী চেয়েছিল সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে। অণ্যদিকে নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা সমাজ সংস্কার চেয়েছিল। ১৮১৯ খ্রিঃ এ জার্মাণ রাষ্ট্রসংঘের উপর কার্লসবাড ডিক্রি জারি করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের গতিবিধির উপর নজর রাখা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পূরণ এবং রাজতন্ত্র বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল ও ক্লাবগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল । এইভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গ জার্মাণ রাষ্ট্রসংঘের উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ রেখেছিল।

১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব :

১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব জার্মাণীতে গভীরভাবে অনুভূত হয় নি। ক্ষুদ্র জার্মাণ রাজ্যগুলিতেই এর প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। হ্যানোভার, স্যাক্সনী ও হেসে (Hense) তে স্থানীয় শাসকেদরা উদারপন্থী আন্দোলনকারীদের চাপে উদারনৈতিক সংবিধান প্রবর্তন করেছিলেন কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি । তবে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের প্রেক্ষিতে জার্মাণীতে প্রাশীয়ার নেতৃত্বে 'জোলভেরাইন; বা জার্মাণ শুল্ক সংঘ গঠন সম্পূর্ণ হয়েছিল। ১৮৪০এর দশকে সাঁ সিমোওঁ, ফুরিয়ার এবং ক্যাবেট (Cabet) এর সমাজতান্ত্রিক ভাবনা জার্মাণীতে গুরুত্ব পেয়েছিল। জাতিয় শুল্কনীতি সংক্রান্ত একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। জজার্মাণ ও অস্ট্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে উদারপন্থীরা অধ্যাপকদের নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিল। তারা জাতীয় ঐক্য এবং চূড়ান্ত স্বাধীনতার আদর্শ তুলে ধরেছিল, যদিও তারা ছিল একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট :

১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে ফ্রেবুয়ারী বিপ্লবের ফলে অস্ট্রিয়াতে মেটারনিখতন্ত্রের পতন ঘটলে প্রাশীয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম এর কাছে একটা সংবিধান প্রণয়নের দাবি জানায়। এছাড়া তারা দাঙ্গা করে এবং ব্যারিকেড রচনা করে। এর প্রেক্ষিতে রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন এবং উদারনৈতিক মন্ত্রিসভা ও সংবিধান সভা গঠনের কথা ঘোষণা করেন।এর সাথে তিনি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথাও ঘোষণা করেন। বিপ্লবীদের এই সাফল্য জার্মাণীর ছোট রাজ্যগুলিকে উৎসাহিত করে এবং সেখানেও সংবিধানের দাবি তোলা হয় ও সংবিধান গৃহিতও হয়। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের শেষ দিকে জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যের পার্লামেন্টে এর নির্বাচিত ৫০০ জন প্রতিনিধি নিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্টে এক অস্থায়ী অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনেই সমগ্র জার্মানী থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় সংসদ গঠন করে। ফ্রাঙ্কফুর্টে এই জাতীয় সংসদের অধিবেশন হয় বলে জার্মাণীর ইতিহাসে এই পার্লামেন্ট ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট নামে খ্যাত । এই পার্লামেন্টে উদারপন্থী আইনজীবি, অধ্যাপক ও ব্যবসায়িদের প্রাধান্য ছিল।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট শ্লেজউইগ ও হলস্টেইন (Holstein) ডাচি দুটিকে জার্মাণীর সাথে যুক্ত করার জন্য প্রাশীয়াকে ডেনমার্কের সাথ যুদ্ধ করার পরিকল্পনা দিয়েছিল। বলাবাহুল্য, ডেনমার্ক ও জার্মাণীর মধ্যে অবস্থিত এই ডাচি দুটিকে ডেনমার্ক রাজা সপ্তম ফ্রেডারিক নিজ রাজ্যের মধ্যে অন্তভুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে প্রাশিয়া ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন প্রোটোকল (London Protocal) এর মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান ঘটলেও এই সমঝোতায় দুই পক্ষই সন্তুষ্ট হয় নি।

প্রতি বিপ্লব :

১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগে জার্মাণী, অস্ট্রিয়া, বোহেমিয়া, ইতালি ও হাঙ্গেরিতে হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে প্রতি বিপ্লব আন্দোলন শুরু হয়েছিল । প্রাশীয়ার রক্ষণশীলরা, যারা মুখ্যত ছিল ভূস্বামী ও যাজক, সংবিধান সভায় প্রুশীয় উদারপন্থীদের কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য চাপ দিতে শুরু করেছিল। প্রুশীয় উদারপন্থীরা চেয়েছিল অভিজাতন্ত্রের বিলোপ সাধন ও রাজাকে নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধানে পরিণত করতে। এছাড়া তারা ভীয়েনায় বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য সৈন্য প্রণ করতে চেয়েছিল । এরূপ পরিস্থিতিতে রাজা চতুর্থ ফ্রেডরিক উইলিয়াম তৎপরতার সাথে তাঁর উদারপন্থী মন্ত্রীদের পদচ্যুত করে রক্ষণশীলদের নিযুক্ত করেন এবং সেনাবাহিনীর সাহায্যে সংবিধানসভা ও বার্লিনের জনগণকে ভীতিপ্রদর্শণ করেন। অতঃপর তিনি সংবিধান সভা ভেঙে দেন এবং একটা সংবিধানের খসড়া তৈরি করেন , যেখানে রাষ্ট্রের সকল

টিপ্পনী

ক্ষমতা রাজা ও মন্ত্রীদের হাতে ন্যাস্ত হয়। এছাড়া রাজার উচ্চশ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিত্তশালী অংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সংসদের সাথে পরামর্শ নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়।

টিপ্পনী

উদারপন্থীরা ফ্রাঙ্কফুর্টে ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধানে প্রাশিয়ার রাজাকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর নেতৃত্ব গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছিল। কিন্তু চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম এব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। আসলে সামান্য প্রজাদের কাছ থেকে রাজমুকুট গ্রহণ করতে তাঁর আপত্তি ছিল। তাঁর দৃষ্টিতে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ছিল একটি বৈপ্লবিক সংগঠন, তাই মুকুট প্রদানের কোন অধিকারই তার ছিল না। যাইহোক চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম মুকুট গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের অস্তিত্বও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরুপ জার্মাণ ফ্রিন্সদের সিংহাসনচ্যুত করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। যদিও প্রুশীয় বাহিনী এই প্রচেষ্টা ব্যার্থ করে জার্মাণ প্রজাতন্ত্রীদের বন্দী অথবা নির্বাসিত করা হয়।

এতৎসত্ত্বেও চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম জার্মাণির ঐক্য ভাবনার বিরোধী ছিলেন না। তিনি প্রাশীয়ার নেতৃত্বে নতুন জার্মাণ রাষ্ট্রসংঘ গড়ে তোলার জন্য অস্ট্রিয়াবাদে অনান্য জার্মাণ রাজ্যগুলিকে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই আহ্বানে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিই সাড়া দিয়েছিল এবং ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে তারা এরফুর্ট (Erfurt) পার্লামেন্টে মিলিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, অস্ট্রিয়া এই রাষ্ট্রসংঘ গঠনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল এবং হ্যানোভার ও দক্ষিণ জার্মাণি অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করেছিল। এর প্রেক্ষিতে অস্ত্রিয়া ও প্রশিয়ার মধ্যে সংঘাত আসন্ন হয়ে উঠেছিল। যদিও প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে না গিয়ে সমঝোতা করে নিয়েছিল। শেষপর্যন্ত ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে চতুর্থ ফ্রেডরিক উইলিয়াম এবং মেটারনিখের উত্তরসূরি সোয়ার্জেনেবার্গ (Schwarzenberg) এর মধ্যে ওলমুজ এর সন্ধি (Treaty of Olmuz) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এইও সন্ধি শর্তানুসারে প্রাশীয়া জার্মাণীর ঐক্যের পরিকল্পনা ত্যাগ করে এবং অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বে জার্মাণ রাষ্ট্রসংঘের পুনরুত্থান মেনে নেয়। বলাবাহুল্য, এই চুক্তি প্রাশিয়ার কাছে অত্যন্ত অপমানজনক ছিল। কিছুদিন পরে রাষ্ট্রসংঘের ডায়েট ফ্রাঙ্কফুর্ট জার্মাণ জাতির মৌলিক অধিকারের ঘোষণাপত্রের পরিবর্তন করেছিল।

৪.৩.১. বিসমার্কের ভূমিকা :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
172

ইতালির দৃষ্টান্ত এবং ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে কাভুরের যুদ্ধ জার্মাণীতে জাতীয় ঐক্য আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তবে জার্মানির ঐক্যের পরিকল্পনায় ভিন্নতা ছিল, কেউ চেয়েছিল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র আবার অণ্যেরা চেয়েছিল রাষ্ট্রসংঘ। এছাড়া কেউ চেয়েছিল অস্ট্রিয়ার নেতৃত্ব, কেউ আবার প্রাশিয়ার নেতৃত্ব। যদিও কেউই নিশ্চিত ছিল না যে কিভাবে অস্ট্রো-প্রুশিয়া সম্পর্কের সমাধান

হবে। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার দূর্বলতা প্রকাশ্যে এসেছিল এবং এরফলে তার পক্ষে জার্মাণির ঐক্য সাধনে নেতৃত্ব দেওয়া প্রকৃতপক্ষে সম্ভব কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়ে ছিল। ফলতঃ প্রাশিয়ার নেতৃত্বের সমর্থনেই জনমত সংগঠিত হচ্ছিল, বিশেষত প্রুশিয় রক্ষণশীলরা এ বিষয়ে সক্রিয় হয়েছিলেন। তাদের স্মরণে ছিল কিভাবে চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন এবং জার্মাণির ঐক্য পরিকল্পনাকে ত্যাগ করেছিলেন।

টিপ্পনী

বিসমার্কের ক্ষমতায় উত্তরণ :

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং প্রাশীয়ার শাসনভার তাঁর ভ্রাতা প্রথম উইলিয়ামের হাতে অর্পিত হয়েছিল। প্রথম উইলিয়াম ছিলেন রক্ষণনশীল ও ধর্মপ্রবণ। তিনি রাজার দৈব সত্ত্বায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সামরিক ব্যাপারে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। বলাবাহুল্য , তিনি সৈণ্যবাহিনীর সংস্কার সাধনের কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি জেনারেলল হেলমুখভন মোল্টকে (Helmuth Von Moltke) কে সেনাবাহিনীর প্রধান এবং আলব্রেট ভন রুন (Albedrt Von Roon) কে যুদ্ধমন্ত্রি হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। প্রথম উইলিয়ামের রাজত্বকালে বছরে বাধ্যতামূলকভাবে মানুষের সেনাবাহিনীতে যোগদানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সেনাবাহিনীতে যোগদানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সেনাবাহিনীর সরঞ্জামেরও আধুনিকীরণ করা হয়েছিল।

ফ্রাঙ্কো ইতালীয় বাহিনীর কাছে অস্ট্রিয়ার পরাজয় এবং তৃতীয় নেপোলিয়ন কর্তৃক নিস ও স্যাভয় দখলের পর ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়নের অস্ট্রিয়া আক্রমণের সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে প্রাশীয়া রাইন নদীর উপর নজরদারী করার কথা ভেবেছিলে । এছাড়া তৃতীয় নেপোলিয়নের 'জাতিয় সীমানা' (National Bounndaries) র শ্লোগান প্রুশীয় বাহিনীর সংস্কারকে জরুরী করে তুলেছিল। প্রথম উইলিয়াম প্রাশীয়ার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু প্রুশীয় ডায়েট এর নিম্ন কক্ষ এর বিরোধীতা করেছিল। উদারপন্থীরা চেয়েছিল প্রাশিয়াতে একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এবং তারা ভেবেছিল প্রাশীয়ার সামরিক সংস্কারে আর্থিকভাবে বাধা সৃষ্টি করলে রাজা বশ্যতা স্বীকার করবেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে রাজা নিম্নকক্ষ ভেঙে দেন এবং নতুন নির্বাচনের আদেশ দেন। প্রসঙহগত নবনির্বাচনের ফল প্রগতিপন্থীদের পক্ষে যায় এবং তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। বলাবাহুল্য, প্রগতিপন্থীরা রাজাকে দিয়ে উদারপন্থী নীতি কার্যকর করতে চেয়েছিল। এরফলে এক অচলাবস্থা তৈরি হয়। এই পরিস্থিতর মোকাবিলার জন্য রাজা প্রথম উইলিয়াম অটোফন বিসমার্ক আহ্বান করেন।

বিসমার্ক ছিলেন প্রাশীয়ার এক ভূস্বামী অভিজাত পরিবারের সন্তান। তিনি অভিজাততন্ত্রের ঐতিহ্য নিয়েই লালিত পালিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মধ্যে

স্বদেশপ্রেম ছিল গভীর। ছানাবস্থায় তিনি ছিলেন নিম্নমানের এবং তাঁর মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব ছিল। তাই তিনি সরকারী চাকরিতে বেশি দিন স্থায়ী থাকতে পারেন নি। যাইহোক, বিসমার্ক ছিলেন উগ্র রাজতন্ত্রী এবং ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজা চতুর্থ উইলিয়াম যখন সংবিধান প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তখন তিনি এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন।

টিপ্পনী

বিসমার্কের বাস্তব রাজনীতি :

বিসমার্ক বাস্তব রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং উদারপন্থীদের হাত থেকে প্রাশিয়ার প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে সংবিধানকে সমর্থন করলেও প্রশিয়াতে রক্ষণশীল দল গঠনে সক্রিয় ছিলেন। এই রক্ষণশীলরা ছিল উদারপন্থীদের বিরোধী ১৮৫১ থেকে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রাশীয়ার প্রতিনিধি হিসাবে ফ্রাঙ্কফুর্টে জার্মাণ ডায়েটের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই পর্বে জার্মাণ রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয়েছিল এবং একইসাথে অস্ট্রিয়ার প্রতি তাঁর বিদ্বেষও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে পর্পন্ত তিনি পিটার্সবার্গ এ প্রাশীয়ার রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত থাকার সময় রাশিয়া সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয়েছিল এবং তিনি জারেদর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। তিনি কিছুমাস প্যারিসে রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং সেখানে তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিত্র সঠিকভাবে পরিমাপ করেছিলেন। যাইহোক, ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে রাজা প্রথম উইলিয়াম প্রাশীয়ার সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য ভনরুণের পরামর্শে বিসমার্ককে বার্লিনে আহ্বান করেছিলেন।

১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে অটোকন বিসমার্ক প্রাশীয়ার প্রধানমন্ত্রীপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রথমেই তিনি প্রুশীয় পার্লামেন্টে প্রগতিপন্থীদের সাথে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এই চেষ্টা ফলপ্রদ হয়নি। ১৮৬৩ খ্রিঃ এ প্রগতিপন্থীরা বিসমার্কের অপসারণের দাবিতে বাজেটের জন্য ভোট প্রদানে অস্বীকার করেছিল। এরপর বিসমার্ক নিম্নকক্ষকে নাড়িয়ে উচ্চকক্ষে বাজেট মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন এবং বর্ধিত হারে কর আদায় করে সামরিক সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন।

অস্ট্রিয়ার সাথে সম্পর্ক :

প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পর বিসমার্ক অস্ট্রো প্রুশীয় সম্পর্কের ব্যাপারে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি জানতেন এরফলে অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ হতে পারে, কারণ অস্ট্রিয়া সহজে জার্মাণীতে তার দৃঢ় অবস্থান ছাড়বে না। বিসমার্ক অনুধাবণ করেছিলেন যে, অসহত্রিয়ার সাথে যুদ্ধ হলে প্রাশীয়া সামরিক শক্তির সাহায্যে জার্মাণি থেকে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করে জার্মাণীর ঐক্য সম্পন্ন করবে এবং প্রাশীয়া ঐক্যবদ্ধ জার্মাণির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৮৬০ এর দশকে বিসমার্ক তার এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যই সকল পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বিসমার্কের কাছে যুদ্ধ ছিল লক্ষ্য অর্জণের হাতিয়ার। যদিও তিনি কূটণীতি বেশী পচ্ছন্দ করতেন। একজন দক্ষ কারিগরের মত বিসমার্ক সঠিক সময়ে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর হাতিয়ার প্রয়োগ করেছিলেন। তাই দেখা যায় ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে পোল্যান্ডে গণবিদ্রোহ দেখা দিলে বিসমার্ক সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিলেন রুশ জারের সমর্থন আদায়ের জন্য। বলাবাহুল্য তিনি জারকে বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে আলভেন্সলেবেন কনভেনশন (Alvensleben Convention) স্বাক্ষর করেছিলেন। এছাড়া একই বছর অস্ট্রিয়া জার্মাণ রাষ্ট্রসংঘের সংস্কারের প্রস্তাব দিলে প্রাশীয়া তাতে অংশগ্রহণে অসম্মত হয়েছিল।

টিপ্পনী

অস্ট্রো প্রুশীয় যুদ্ধ :

বিসমার্ক উদারপন্থীদের বিরোধের জবাব তাঁর বিদেশনীতির মাধ্যমে দিতে চেয়েছিলেন। বিসমার্কের কাছে এই সুযোগ আসে তখন জার্মাণ রাষ্ট্রসংঘের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডেণমার্কের রাজা শ্লেজউইগ ও হলস্টেইন ডাচি দুটিকে দখল করে ডেনমার্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। এরপ্রেক্ষিতে প্রশিয়া অস্ট্রিয়ার সাথে যৌথভাবে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এইযুদ্ধে ডেনমার্কের পরাজিত হয় এবং ডাচি দুটিকে অস্ট্রিয়া ও প্রশিয়ার মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত বিসমার্ক জানতেন যে সমগ্র উত্তর জার্মাণ রাষ্ট্রসংঘকে প্রশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে হলে অস্ত্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে ইউরোপীয় রাজনীতিতে অস্ট্রিয়াকে মিত্রহীন করতে সচেষ্ট হন। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে পোল বিদ্রোহ দমনে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে সমর্থন জানিয়ে বিসমার্ক রাশিয়ার মিত্রতা ইতিমধ্যে আদায় করে নিয়েছিলেন। এছাড়া বিসমার্ক তৃতীয় নেপোলিয়নকে রাইন অঞ্চল প্রদানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফ্রান্সের নিরপেক্ষতা আদায় করে নিয়েছিলেন। এইভাবে দেখা যায় যখন অস্ট্রিয়া জার্মাণির উপর তার অধিকার না ছাড়ার কথা ঘোষণা করে তখন বিসমার্ক যুদ্ধ প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন।

১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শ্লেজইউগ হলস্টেইন ডাচিদুটিকে কেন্দ্র করে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে বিতর্ক দেখা দিলে তা যুদ্ধে আকার নেয়। এই যুদ্ধে সাত সপ্তাহ চলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করেছিল। এই জয়ের মধ্য দিয়ে প্রাশীয়া অস্ট্রিয়াকে অপসৃত করে প্রধান জার্মাণ রাষ্ট্র হিসাবে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেছিল। এছাড়া ক্ষুদ্র জার্মাণ রাজ্যগুলি প্রাশিয়ার সাথে জোটবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিল।

স্যাজেয়ার যুদ্ধ (Battle of Sadowa) প্রশিয়ার কাছে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের

টিপ্পনী

পর বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার প্রতি নম্রতা প্রদর্শণ করে তাঁর বাস্তববাদী রাজনীতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। বলাবাহুল্য অস্ট্রিয়ার কোন ভূখন্ড এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দাবি না করে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। তবে জার্মাণ ভূখন্ড অধিকারের ব্যাপারে তিনি সজাগ ছিলেন। তাই দেখা যায়, যুদ্ধের পর জার্মাণ রাষ্ট্রসংঘ থেকে অস্ট্রিয়া স্বেচ্ছায় নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল এবং রাষ্ট্রসংঘ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। মেইন নদীর উত্তরে সমস্ত অঞ্চল নিয়ে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে নতুন 'উত্তর জার্মাণ রাষ্ট্রসংঘ' গঠিত হয়েছিল। দক্ষিণের ক্যাথলিক রাজ্যগুলিতে স্বশাসন বজায় ছিল। তবে তারা প্রাশীয়াচর সাথে জোট গঠন করেছিল।

বিসমার্ক এরপর পার্লামেন্টের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, পার্লামেন্টেকে তাঁর নির্ধারিত শর্তাবলী গ্রহণে বাধ্য করতে হলে একমাত্র জাতীয়তাবাদকেই হাতিয়ার করতে হবে। বলাবাহুল্য অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধের পর তিনি উত্তর জার্মাণ কনফেডারেশন বা অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধের পর তিনি উত্তর জার্মাণ কনফেডারেশন বা রাষ্ট্রসংঘের জন্য একটি নতুন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানও গ্রহণ করেছিলেন। এই সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে কনফেডারেশনের প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব স্থানীয় সরকার থাকবে, কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা সর্বসম্মতভাবে কনফেডারেশনের সভাপতিত্ব করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক কেবলমাত্র সভাপতির কাছেই দায়বদ্ধ থাকবেন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে সামরিক বাহিনী ও বিদেশনীতি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। একটি দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা ও গঠন করা হয়েছিল।এরপর বিসমার্ক প্রাশীয়ার সীমান্তকে সুরক্ষিত করার জন্য প্রুশীয় পার্লামেন্টের কাছে বিশেষ নিরাপত্তা বিল জারি করার দাবি জানিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে বিসমার্কের পক্ষে যুদ্ধখাতে অনুদান বৃত্তি মঞ্জুরী সহজ হয়েছিল। যাইহোক, উত্তরের জার্মাণ রাজ্যগুলির ঐক্যসাধন এবং একটি আইনসভা গঠন ছিল বিসমার্কের এক বড় সাফল্য। বলাবাহুল্য, উদারপন্থীদের কাছে এই সাফল্য ছিল কল্পনাতীত ; তাই তারা এরপর বিসমার্কের সাথে সহযোগীতা করতে সম্মত হয়েছিল।

জার্মাণীর সম্পূর্ণ ঐক্যসাধন :

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো প্রুশীয় যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের পক্ষে মিত্র জোগাড় করা সম্ভব হয় নি। কারণ, স্যাভোয়ার পরে প্রাশীয়া অস্ট্রিয়ার প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ করায় অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সমর্থনে প্রাশীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত ছিল না। অণ্যদিকে রোমে ফরাসী বাহিনী মোতায়েন থাকায় তৃতীয় নেপোলিয়নের পক্ষে ইতালির সাহায্য লাভ সম্ভব ছিল না। সুতরাং রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিসমার্কের পক্ষেই ছিল। এছাড়া দক্ষিণ জার্মাণ রাজ্যগুলি প্রাশীয়াকে সমর্থন করেছিল। সর্বপরি প্রাশীয়ার সেনাপতি মোল্টকে এর দক্ষতা এবং উন্নত সমরাষ্ট্রের সাথে ফরাসী বাহিনীর কোন তুলনা ছিল না। যাইহোক ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে

সেভানে ফরাসীরা পরাজিত হবে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের প্রথম পর্বের অবসান ঘটে এবং এর ফলশ্রুতিতে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তবে বিসমার্ক ভবিষ্যতে ফরাসী আক্রমণ থেকে জার্মণীকে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা না করা অবধি ফ্রান্সের সাথে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন না। বলাবাহুল্য, ফ্রান্সের কাছ থেকে আলসাস ও লোরেন দখলের মাধ্যমেই প্রাশীয়ার পক্ষে এই সুরক্ষা সম্ভব ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসানের পর ফ্রান্সের নতুন প্রজাতান্ত্রিক সরকার কোন অঞ্চল ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত চলেছিল। যাইহোক, শেষপর্যন্ত ফরাসীরা আত্মসমর্পণ করে এবং ১৮৭১ খ্রিঃএ ১০ মে 'ফ্রাঙ্কফুর্ট সন্ধি' দ্বারা ফ্রাঙ্কো প্রুশীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সন্ধির শর্তানুযায়ি ফ্রান্স তার আলসাস ও লোরেন প্রদেশ জার্মানীর হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া ফ্রান্স যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঁচ বিলিয়ন ফ্রাঁ দিতে স্বীকৃত হয়েছিল, এবং ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত উত্তর ফ্রান্সে জার্মাণ বাহিনী মোতায়েন রাখা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। প্রসঙ্গত ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বাহিনী মোতায়েন ছিল।

ফ্রাঙ্কো প্রুশীয় যুদ্ধের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য ছিল যে, এই যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জার্মাণির ঐক্য সম্পূর্ণ হয়েছিল। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যের সমন্বয়ে নতুন জার্মাণ সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম নতুন জার্মাণ সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়েছিলেন এবং চ্যান্সেলার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন বিসমার্ক।

জার্মাণী ও ইতালির ঐক্য আন্দোলনের পারস্পরিক তুলনা :

জার্মাণী ও ইতালির ঐক্যসাধন পক্রিয়ায় যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তা হল :-

সাদৃশ্য :

- ইতালি ও জার্মাণী দুই রাষ্ট্রেই ঐক্যসাধন সম্পূর্ণ হয়েছিল যুদ্ধের মাধ্যমে।
- দুইদেশের ঐক্যকরণের পথে প্রধান বাধা ছিল অস্ট্রিয়া।
- দুই দেশের ঐক্য আন্দোলনে একই ধরনের ঝুঁকি গ্রহণ, প্ররোচণা ও কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল।

বৈসাদৃশ্য :

- ইতালির ঐক্য আন্দোলনে স্যাভয় রাজবংশের নেতৃত্বে সর্বসম্মত ছিল। অণ্যদিকে প্রাশীয়ার হোহেনজোলার্ণ রাজবংশকে জার্মাণির ঐক্য আন্দোলেনের নেতৃত্ব গ্রহণে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।
- প্রাশীয়া সামরিক দিক দিয়ে পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার তুলনায় অনেকবেশি শক্তিশালী

টিপ্পনী

ছিল। তাই তারপক্ষে আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার মতো বৈদেশীক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয় নি।

- প্রাশীয়া ঐক্যের ব্যাপারে উদারনীতিবাদ অপেক্ষা অনেকবেশি নির্ভর করেছিল জোলভেরাইন বা শুল্কসংঘের উপর তার অর্থনৈতিক নেতৃত্বের উপর। এছাড়া জার্মাণীর ঐক্যসাধনের জন্য প্রাশীয়া সামরিক শক্তির উপর বেশি নির্ভর করেছিল, যেখানে ইতালিতে জণগণের একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল।
- সর্বপরি এটা বলা হয়ে থাকে যে, প্রাশীয়ার নেতৃত্বে জার্মাণি রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়নি বরং জার্মান রাষ্ট্রগুলি বাধ্য হয়েছিল প্রাশীয়ার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে। তাই এটা ছিল আরোপিত ঐক্য। অণ্যদিকে পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ইতালির রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

টিপ্পনী

অগ্রগতি পরিমাপ কর :

১. ভিয়েনা শান্তি চুক্তি বা বন্দোবস্ত কবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ?

২. বিসমার্ক কবে প্রাশিয়ার কূটনৈতিক বিদেশী দৌত্য কর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন ?

৩. জার্মাণী ও ইতালির ঐখ্য আন্দোলনের দুটি সাদৃশ্য লেখ।

৪.৪. ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রতি চীনাদের প্রতিক্রিয়া : তাইপিং বিদ্রোহ

আফিম যুদ্ধে পরাজয়ের পর চীনাদের এই তারণার বিলুপ্তি ঘটেছিল যে, বীশ্বে তাদের দেশই সবথেকে উন্নত সভ্যতা এছাড়া যুদ্ধের পর চীনের ঐতিহ্যশালী জীবনধারা, শাসনধারা ও চিন্তাভাবণার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তণ এসেছিল। বস্তুত চীনাদের কাছে আফিম যুদ্ধে পরাজয় ও তার প্রেক্ষিতে চীনের ঐশ্বরিক সাম্রাজ্য ও স্বর্গীয় শাসনের ধারণার অবসান যথেষ্ট অপমানজনক ছিল। বলাবাহুল্য, উনিশ শতকের মধ্যভাগে বিদেশী শক্তির আগ্রাসনের ফলে চীন শুধুমাত্র সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, তার সাথে চীনের অভ্যন্তরে আর্থ সামাজিক সমস্যাও দেখা দিয়েছিল। আসলে চীনে দীর্ঘদিন শান্তির পরিবেশ বজায় থাকায় দেশের অভ্যন্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু সেই পরিমাণে খাদ্য শষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি। চাষযোগ্য জমিও কিছু বিত্তশালী মানুষের হাতেই নিবদ্ধ ছিল। চীনের বেশিরভাগ মানুষ ছিল দরিদ্র কৃষক এবং এদের কিছু জনের নিজস্ব জমি থাকলেও অধিকাংশ ছিল ভূস্বামীর অধীনস্থ ভূমিহারা কৃষক। এর উপর দুর্ভিক্ষের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং আফিমের নেশা খাদ্যশষ্যের উৎপাদন হ্রাস করেছিল। রাজকোষ পূর্ণ করার জন্য রাজদরবার সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা বৃদ্ধি করেছিল এবং এরফলে জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এরূপ পরিস্থিতি চীনের এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল এবং স্বর্গীয় বিধান অনুসারে মাঞ্চু রাজবংশ চীনে শাসনের অধিকার হারিয়েছিল । জনগণ তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। বলাবাহুল্য, প্রথম আফিম যুদ্ধের আগেই চীনের দক্ষিণভাগে কিছু বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল পাশ্চাত্যের সাথে চীনের উত্তরোত্তর যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে।

৪.৪.১. তাইপিং বিদ্রোহ :

টিপ্পনী

তাইপিং বিদ্রোহ ছিল একাধারে কৃষক অভ্যুত্থান, নতুন ধর্মীয় জাগরণ এবং মাঞ্চুবিরোধী আন্দোলন। এছাড়া এই বিদ্রোহকে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ ও বলা যায়, করাণ প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষ এই বিদ্রোহে প্রান হারিয়েছিল।এই বিদ্রোহ চীনের ১৮ টি প্রদেশের মধ্যে ১৬ টি প্রদেশে ব্যাপ্ত হয়েছিল এবং মাঞ্চু বংশকে প্রায় উচ্ছেদ করে দিয়েছিল।

হুং-শিউ-চুয়ান (Hung-Hsiu-Chuan, 1814-1864) নামে চীনের কোয়াংট্যাং প্রদেশের একজন হাক্কা কনফুসীয় পন্ডিত ছিলেন তাইপিং বিদ্রোহের নেতা । উচ্চ রাজকর্মচারীপদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য হুংবেশ কয়েকবার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসেছিলেন । কিন্তু প্রতিবারই তিনি অকৃতকার্য হয়েছিলেন । বলাবাহুল্য ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয়বার ব্যর্থতার পর হুং অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পীড়িত অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, এক সৌম্য দর্শন বৃদ্ধ তঁ!আকে কণিষ্ঠ ভাই বলে ডাকছেন এবং তিনি তাঁকে সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুস্থ হওয়ার পর তিনি প্রচার করেন যে তাঁর সঙ্গে যিশুখ্রিষ্টের সাক্ষাৎ দর্শন হয়েছে। প্রভু যিশু তাঁকে ছোটভাই বলে মেনে নিয়েছেন এবং পৃথিবীকে দুর্নীতিমুক্ত করে স্বর্গীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি চিংবংশকে উৎখাত করে চিনে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন । প্রসঙ্গত হুং তাঁর কিছু আত্মীয়সহ খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।

১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে হুং কিওয়াংসি প্রদেশে চলে যান এবং সেখানে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার শুরু করেন। বলাবাহুল্য তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ঈশ্বর উপাসনা সমিতি বা 'God Worshipping Society' গঠন করেছিলেন । হুংও তাঁর তিন অনুগামী ফেং ইউনশান (Feng Yunshan), ইয়াং শিউংচিং (Yang Xiuquing) এবং শিয়াও-চাও-কুই (Xiao Chaqui)ছিলেন এই ধর্মীয় সংগঠনের মুখ্য পরিচালক । ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে হুং এই সমিতির প্রধান নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং ফেং, ইয়াং ও শিয়াও যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্র রূপে মনোনীত হয়ছিলেন। হুং তাঁর প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কোয়াংসি প্রদেশের জিন-তিয়েন গ্রামে । বলাবাহুল্য অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথমদিকে তাঁর

টিপ্পনী

অনুগামীদের মধ্যে আর্থ সামাজিক দিক দিয়ে অবহেলিত শহরেণীর মানুষ যেমন - খনি শহরমিক, কাঠকয়লা বিক্রেতা, দরিদ্র কৃষক প্রমুখদের আধিক্য ছিল। এদরা ক্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে সমিতিতে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ শিক্ষিত ও বিত্তমান মানুষেরাও এই সমিতির সদস্য পদ গ্রহণ করেছিল । প্রসঙ্গত, এই সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেছিল। প্রসঙ্গত এই সমিতির সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল হাক্কা গোষ্ঠীর মানুষ। চীনের অন্যান্য গুপ্ত সমিতিও হ্যংকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল।

১৮৫০খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে মাঞ্চুসরকার হ্যংকে তাঁর প্রধান কার্যালয় থেকে উৎখাত করার জন্য সৈণ্য প্রেরণ করেছিল। এই সময় দুর্ণীতিগ্রস্ত মাঞ্চুসেনারা কাঠকয়লা বিক্রেতাদের কাছ থেকে অসাধু উপায়ে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করে। যদিও ঈশহবর উপাসনা সমিতির অণ্যতম সদস্য এই কাঠকয়লা বিক্রেতাদের তৎক্ষণাৎ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে জয় নিশ্চিত করে। এভাবেই তাইপিং বিদ্রোহের সূচনা হয় । ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে হ্যং মহতী শান্তিরস্বর্গরাউজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিলেন । এরপর জিনতিয়েন থেকে তাইপিং বিদ্রোহীরা উত্তর দিকে অগ্রসর হয় এবং যাত্রাপোথে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি দখল করতে থাকে। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে চীনের বিখ্যাত শহর নানকিং তাদের দখলে আসে। নানকিং এদর নাম পরিবর্তন করা রাখা হয় তিয়ানজিং (স্বর্গীয় রাজধানী) এবং তাকে স্বর্গীয় রাজ্যের রাজধানী করা হয়। হ্যং নানকিং এ স্থায়ী হন। নানকিং থেকে বিদ্রোহীরা যুগপৎভাবে দুইদিকে অগ্রসর হয়। হ্যং উত্তর দিকে একটা দল প্রেরণ করেন বেজিং দখলের জন্য এবং পশ্চিমদিকে একটা দল প্রেরিত হয় আজনহুই, সিয়াংসি, হুবেই ও হুনান দখল করার জন্য। বিজ্ঞ সমরনেতা সেং কুয়ো ফান (Tseng Kuo Fan) এর নেতৃত্বে হুনানা বাইনী তাইপিং বিদ্রোহীদের পশ্চিমদিকের অভিযান রোধ করে। অণ্যদিকে দশ বছর ধরে যুদ্ধ চলার পর তাইপিং সেনাপতি শি-ডা-কাই শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পন করলে এবং ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রাণদন্ড হলে উত্তর দিকে অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে । মাঞ্চুবাহিনী ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে নানকিং দখল করে নেয়। রাজধানীর পতন ঘটলে হ্যং এর সমস্ত আশা বিনষ্ট এবং ১৮৬৪ খ্রিএ তিনি আত্মহত্যা করেন । বলাবাহুল্য হ্যং এর মৃত্যুর পরই আক্ষরিকভাবে তাইপিং বিদ্রোহের সমাপ্তি হয়েছিল । যদিও তাঁর পুত্র স্বর্গীয় রাজা হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করে আরও কিছু বছর বিদ্রোহ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

তাইপিং নীতি এবং কর্মপন্থা :

তাইপিং বিদ্রোহের প্রায় সমস্ত নীতি এবং কর্মপন্থা মাঞ্চুদের থেকে আলাদা ছিল। মাঞ্চুরা যেখানে চিরাচরিত চৈনিক ঐতিহ্যের অনুসারী ছিল সেখানে তাইপিংরা ছিল এর বিরোধী । মাঞ্চুদের থকে নিজেদেরকে আলাদা বোঝানোর উজন্য তারা মাঞ্চুদের বাধ্যতামূলক কেশবিন্যাস অণুসরণ করত না। তাইপিংরা চুলের বেণী কেটে দিয়ে লম্বা চুল রাখত। এই জন্য তাদেরকে ‘চাংগমাও’ বা লম্বা কেশধারী বিদ্রোহী

হিসাবে উল্লেখ করা হত। যাইহোক, তাইপিংদের মূলনীতি ওও প্রতিষ্ঠান গুলি হল -

১. ধর্মীয় মতবাদ : তাইপিং বিদ্রোহীরা খ্রিষ্টধর্মের প্রোটেস্ট্যন্ট ধর্মমত অণুসরণ করত এবং তারা ছিল মূর্তি পূজার বিরোধী। তাইপিং খ্রিষ্টধর্মে ঈশ্বরের গভীর ভক্তি এবং ঈশ্বরের উপাসনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। বলাবাহুল্য, হুং জবাইবেলের বাণীর অর্থ যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ঠিক সেইভাবেই তিনি তাইপিং ধর্মের মূল নীতিগুলিকে নির্ধারণ করে ছিলেন। বস্তুত এটা ছিল খ্রিষ্টান এবং কনফুসীয় ভাবধারার এক অদ্ভুত মিশ্রণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে , হুং এদর দশ আদেশ এর মধ্যে মাতা পিতার সেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা মূলতঃ কনফুসীয় মতবাদেরই অণূকরণ। এছাড়া কনফুসীয় ও তাওবাদ এর ন্যায় তাইপিংরাও অণ্যধর্মও দর্শনের প্রতি সহনশীল ছিল না। তারা প্রায়শ অণ্যধর্মের মন্দির, মূর্তি এবং সন্তদের স্মৃতি চিহ্ন ধ্বংস করত।

২. রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শ : তাইপিং স্বর্গরাজ্য ছিল একধরণের সামরিক দিব্যতন্ত্র। হুং ছিলেন স্বর্গীয় রাজা এবং স্বর্গীয় বিধান অণুযায়ী তিনি শাসন পরিচালনা করতেন। 'The Land System of Heavenly Kingdom' নামে একটি দলিল ছিল তাইপিংদের সংবিধান। বলাবাহুল্য তাইপিংদের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং স্থাণ আগে স্বর্গীয়, পবিত্র প্রভৃতি উপসর্গ যোগ করা হত। তবে হুং এর শাসন আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠিত রাজ্য খ্রিষ্টধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও খ্রিষ্টধর্মের মূল শাখাগুলি হুং এর খ্রিষ্টধর্মকে খ্রিষ্টান মত বিরোধী বলে উল্লেখ করে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

৩. প্রশানসন : হুং শি চুয়ান ছিউলেন স্বর্গীয় রজ্যের প্রধান শাসক বা স্বর্গীয় রাজা। তাঁর হাতেই কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যাস্ত ছিল। হুং এর চারজন সহযোগী অণুচর যাঁরা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করতেন তাঁদের বলা হত চার এলাকার রাজা বা Kings of Four Quarters এবং King of the Yi (সহকারী)। ইয়াং শিউ ছিলেন পূর্বের রাজা ; শিয়াও চাও কুই ছিলেন পশ্চিমের রাজা, ওয়েই চ্যাং হুই ছিলেন উত্তরের রাজা, কেং ইউশান ছিলেন দক্ষিণের রাজা এবং শি-ডা-কাই ছিলেন সহকারী রাজা। এই পাঁচজন রাজার মধ্যে পশ্চিম ও দক্ষিণের দুইরাজা ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে তাইপিং সেনা যখন উত্তরে নানকিং এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন সংঘর্ষে মারা গিয়েছিলেন। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দ উত্তরের রাজা অণ্যায়ভাবে পূর্বের রাজাকে হত্যা করেছিল। পরে উত্তরের রাজাকে হত্যা করা হয়েছিল। সহকারি রাজাকে চিং কর্তৃপক্ষ বন্দী করেছিল এবং ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রাণদন্ডে দন্ডিত হয়েছিলেন। হুং ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে আত্মহত্যা করেছিল।

৪. নৈতিক অনুশাসন : তাইপিংরা শ্রেণীহীন সমাজ গঠন এবং গৃহ ও কর্মক্ষেত্র নারী পুরুষের সমানধিকারের কথা ঘোষণা করেছিল। তারা আফিম এবং তামাকের নেশা,

টিপ্পনী

টিপ্পনী

জুয়াখেলা, গণিকাবৃত্তি, বহুবিবাহ, দাসপ্রথা, ও নারীদের সাথে ব্যাভিচার প্রভৃতি নিষিদ্ধ করেছিল। এগুলি ছিল জঘণ্যতম অপরাধ এবং এরজবন্য কঠোর শস্তির বিধান ছিল। তাইপিং মতাদর্শ অনুযায়ী সকল পুরুষ ভাই এবং সকল নারী ভগিনি রুপে সমাদৃত হত। এরফলে নারী পুরুষ দুটি পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

৫. সিভিল সর্ভিস পরিক্ষা : তাইপিংরা রাষ্ট্রীয় আমলাদের চয়নের চিরাচরিত চীনা সিভিল সার্ভীস পরীক্ষার প্রথা অনুসরণ করত। তবে পরীক্ষা সিলেবাস কনফুসীয় ঐতিহ্য অনুসারী ছিল না। সিলেবাসের মধ্যে বাইবেল এবং তাইপিং মতাদর্শ সহধান পেয়েছিল এছাড়া পরীক্ষা এবং সরকারী কাজে তাইপিংরা চিরাচরিত ধ্রুপদী ভাষার পরিবর্তে দৈনন্দিন ভাষার ব্যবহার শুরু করেছিল। সর্বপরি চীনের ইতিহাসে এই প্রথমবার নারীরা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

৬. বর্ষপঞ্জিকা : তাইপিংরা চিরাচরিত চীনা চান্দ্র বর্ষপঞ্জিকার পরিবর্তে নতুন ধরণের বর্ষপঞ্জিকা চালু করেছিল। তাইপিং ক্যালেন্ডারে ৩৬৫ দিন ছিল। বারোতম মাসে পর্যায়ান্বিত ভাবে ৩১ দিন এবং ৩০ দিন থাকত। এর ফলে প্রতিচারবছর তিনটি করে অতিরিক্ত দিন এবং প্রতি চল্লিশ বছরে অতিরিক্ত ত্রিশ দিন তৈরি হল। তাই প্রতি চল্লিশ বছরে একবছর বারোমাসে ২৮ দিন করে মাস হিসাব করে সমন্বয় করার পরিকল্পবনা করা হয়েছিল।

৭. অর্থনৈতিক পরিকাঠামো : তাইপিং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মূখ্যত ছিল সমতাভিত্তিক চরিত্রের। তাইপিংরা জমি ও সম্পত্তির ব্যাক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার উচ্ছেদ করেছিল। 'ঈশ্বর উপাসনা সমিতি'র সদস্যরা তাদের জমি এবং সম্পত্তি বিক্রি করে সেই অর্থ পবিত্র কোষাগারে জমা করেছিল। তারপর রাষ্ট্রের তরফ থেকে জমিগুলিকে সদস্যদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে পুণবর্ন্টন করার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। এছাড়া তাইপিং সরকার নিজস্ব মুদ্রা প্রচলন করেছিল।

৮. সামরিক কাঠামো : তাইপিংরা সামরিক বাহিনীর সৈণ্যদের তাইপিং মতাদর্শের সাহায্যে উদ্বুদ্ধ করত। সেনাবাহিনীর সংগঠন ছিল প্রসারিত এবং জটিল। বিখ্যাত মিং জেনারেল Gi Jiguang এর কৌশলের উপর ভিত্তি করে সামরিক বাহিনী সংগঠিত হয়েছিল। এছাড়া সামরিক ও অসামরিক প্রশাসন পরস্পর বিতাড়িত ছিল। কৃষকরা সৈণ্যবৃত্তি এবং কৃষিকাজ দুই দায়িত্বই পালন করত। সৈণ্যরা কঠোরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। পুরুষ ও নারী সৈণ্যদের আলাদা বাহিনী ছিল।

৪.৪.২.তুং চি পুনঃ প্রতিষ্ঠা :

দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের সময় যখন ইঙ্গ ফরাসী যৌথ বাহিনী বেজিং এর দিকে অগ্রসর হয়েছিল এবং ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে দুটি রাজকীয় উদ্যান অগ্নিদগ্ধ করেছিল তখন চিং সম্রাট সিয়েন কেং জেহলে গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে পালিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানেই

তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। তবে মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পাঁচ বছরের একমাত্র পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন এবং শাসনকার্য পরিচালনায় তাঁকে সাহায্য করার ও পরামর্শ দানের জন্য আটজ রাজপুরুষ নিয়ে গঠিত একটি গোষ্ঠীকে নিযুক্ত করেছিলেন। যদিও বালক সম্রাট তুং চি (Tongzhi, 1862 - 1875) র সিংহাসন আরোহনের পরই তাঁর মাতা তথা বিধবা সাম্রাজ্ঞী জু - সি (Tzu-hsi) সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলেন।

টিপ্পনী

Xinyou Coup :

বালক সম্রাট তুংচির সিংহাসন আরোহনের সময় শাসনকার্য পরিচলনার জন্য আটজন রাজপুরুষকে নিয়ে একটি রাজকীয় কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু এই কাউন্সিলের কেবলমাত্র রাজাকে সাহায্য ও পরামর্শ দানের ক্ষমতা ছিল, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা রাজকীয় সীল ব্যবহারের ক্ষমতা ছিল না। কনফুসীয় নীতি অনুসারে মৃত সম্রাটের পত্নী জু-আন ও বালক সম্রাটের মাতা জুসি, যাঁরা বিধবা সাম্রাজ্ঞী (Empress Dowager) নামে পরিচিতি ছিলেন, তাঁদের হাতেই স্বাভাবিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল। যদিও মৃত সম্রাটের উপপত্নী হওয়ায় রাজপরিবারে জুসির মর্যাদা জু-আন এর থেকে কম ছিল। তাই জু-সি ক্ষমতা হরণ করার এক চক্রান্ত করেছিলেন। বলাবাহুল্য, প্রশাসন বা রাজনৈতিক ব্যাপারের জু-আন এর কোন আগ্রহ ছিল না। তাই প্রশাসনের প্রকৃত ক্ষমতা বিধবা রানী জু-সির হাতেই চলে গিয়েছিল। জি-সি প্রয়াত সম্রাটের ভ্রাতা প্রিন্স কুং গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে ওঅধিষ্ঠিত করে তাঁর উপর আটজন রাজপুরুষকে ক্ষমতাচ্যুত করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, তুচ্ছ ও ভিত্তিহীন অভিযোগে জু-সি এই রাজপুরুষদের তাদের পদ থেকে অপসারিত, নির্বাসিত এবং কিছুক্ষেত্রে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করেছিলেন। এইভাবে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে একটা প্রাসাদ বিপ্লব ঘটিয়ে জু-সি প্রশাসনের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলেন। এই বিপ্লবই Xinyou Coup' নামে পরিচিত। যাইহোক, এরপরই প্রিন্স কুংকে প্রান্তিয় করে জুসি নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসহ প্রশাসন ও রাজপরিবারেদর কেন্দ্রীয় চরিত্র পরিণত হয়েছিলেন। সম্রাট তুং চির মৃত্যুর পর জু-সি তাঁর এক ভগিনীর চারবছরের পুত্রকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই নতুন সম্রাট 'কোযাংসু'উপাধি নিয়ে চীনের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত সম্রাট কোয়াংসুর রাজত্বকালে জু-সি অন্তরালে থেকে চীনের প্রশাসণ পরিচালনা করেছিলেন। যাইহোক এইভাবে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছর জু-সি চীনে শাসন করেছিলেন।

তুং চি পুনঃ প্রতিষ্ঠা :

চীনা সম্রাট তুং চির রাজত্বকালে চিং সরকার রাজমাতা জুসির সক্রিয় সমর্থনে মাঞ্চু রাজবংশ ও সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বেশ কয়েকটি গঠনমূলক

টিপ্পনী

কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল।বলাবাহুল্য, রাজমাতা জু-সির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিলক দেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত বিদ্রোহগুলির মোকাবিলা করা এবং একদক্ষ ও উন্নত আমলাতন্ত্র গড়ে তোলা । এক উন্নত আমলাতন্ত্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় তিনি দূর্নীতিগ্রস্ত রাজকর্মচারীদের শাস্তি প্রদান এবং আমলাতান্ত্রিকপদ বিক্রি করার প্রথা বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়া তিনি চিংবিরোধী অভ্যুত্থান গুলি দমণ করার জন্য সুশিক্ষিত হান রাজকর্মচারীদের সমরবিভাগে জেনারেল পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তাইপিং বিদ্রোহ দমন করার মধ্য দিয়ে চিংবংশের পতন রোধ করা গেললে চীনে আবার মাঞ্চুশাসন ফিরে আসে এবং কিছু সময়ের জন্য শান্তি ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু চীনা শাসক ও চীনা রাজদরবারের বিজ্ঞ রাজকর্মচারীরা চারটি বিষয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। প্রথমত, তাইপিং, নিয়েন ও মুসলিম বিদ্রোহের মত মাঞ্চুবিরোধী অভ্যুত্থান চীনে এক দশকেরও বেশী সময় ধরে লেছিল এবং সরকার তা দমন এ ব্যার্থ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তাইপিং বিদ্রোহ চিংবংশের পতনকে প্রায় নিশ্চিত করে তুলেছিল। চিং সরকার শেষপর্যন্ত বিদেশী সেনাবাহিনীর সামরিক সহায়তায় এই বিদ্রোহ দমন করতে পেরেছিল । তৃতীয়ত, বিদেশীরা চীনকে তাদের সামরিক শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার বাধ্য করেছিল এবং তার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল অসম চুক্তি । চতুর্থত, ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইঙ্গ ফরাসী যৌথ আক্রমণে চিং বংশ অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়গুলি চিংবংশের পতনোন্মুখ অবস্থাকে তুলে ধরেছিল এবং প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল চিংবংশের সামরিক দুর্বলতা ও কূটনৈতিক ব্যর্থতা । তাই সকলেই চিংবংশের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল।

রাজপরিবারের যেসব সদস্য ও পন্ডিত রাজকর্মচারীরা খুব কাছ ধেকে প্রত্যক্ষ করেছিল তারা পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষতা দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। তারা উপলব্ধি করেছিল যে, চীনকে শক্তিশালী করতে এই বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নেওয়া দরকার । ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে চীনের পন্ডিত রাজপুরুষরা চিং রাজদরবারে পাশ্চাত্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ এবং তার সাহায্যে বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব উত্থাপণ করেছিল। তারা প্রস্তাবপত্রে এ প্রসঙ্গে চীনের 'আত্মশক্তি' বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছিলেন। প্রিন্স কুং ছিলেন বাস্তবাদী। তাই তিনি এই চিন্তাভাবনায় সম্মত ছিলেন। বিধবা সাম্রাজ্ঞী জু-সি ও চীনকে শক্তিশালী করতে ও সাম্রাজ্যে শান্তিরক্ষা করতে এই ভাবনাকে সমর্থন করেছিলেন। বলাবাহুল্য, বিদেশীদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকার নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল । এছাড়া অনাণ্য কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তাইপিং বিদ্রোহ দমনের পর ৩০ শতাংশ কৃষিকর হ্রাস। তুংচি রেস্টোরেশন বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলতে এই সমস্ত সাময়িক সফল প্রচেষ্টা গুলিকেই বোঝায়, যা চীনে কিছু সময়ের জন্য শান্তি ও স্থিতাবস্থা এনেছিল। বিধবা সাম্রাজ্ঞী জু-সি এই কর্মসূচিকে সম্রাট তুং-চির নাম দিয়ে ছিলেন ;

কারণ তাঁর আমলেই এই পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল।

অগ্রগতি পরিমাপ কর :

১. তাইপিং বিদ্রোহকে কেন বিশ্বের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ গুলির মধ্যে গণনা করা হয় ?

২. হ্যুং শিউ চুয়ান কে ছিলেন ?

৪.৫. জাপান : মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা :

টিপ্পনী

১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে জাপানে এক নতুন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আলোচ্য সময়ে শোগুন শাসনের অবসানে সম্রাটের রাজধানী ফিয়োটো থেক এডো (Edo) তে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং এডোর নতুন নামকরণ হয়েছিল টোকিও। বলাবাহুল্য, জাপানে শোগুন যুগের অবসানের পর এই যে নতুন শাসনপর্বের সূচনা হয়েছিল তা তরুণ সম্রাট মেইজি (জ্ঞানদীপ্তি) র নাম অনুসারে মেইজি যুগ হিসাবে পরিচিত হয়।

প্রাথমিক পরিবর্তন :

মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলশ্রুতিতে জাপানে শোগুন ও সম্রাটেদর দ্বৈতশাসন ব্যবস্ধার অবলুপ্তি ঘটে। শোগুন পদ অবলুপ্ত হয় এবং সম্রাটই আইনত ও কার্যত উভয়রূপেই দেশের অধীশ্বর হিসাবে বরণীয় ও স্বীকৃত হন। এছাড়া জাপানে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য সভ্যতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। সর্বপরি শোগুণোত্তর যুগে জাপানের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা প্রবাহিত হয় নতুন খাতে, যে জীবনধারা ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত।

১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে জাপানের নতুন সরকার দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। প্রথমত, মার্চ মাসে দেশের বিস্তৃত অঞ্চল থেকে জনপ্রতিনিধি আহ্বান করে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এপ্রিল মাসে সম্রাট শাসন সংক্রান্ত একটি শপথ গ্রহণ করেছিলেন। এই শপথ ঘোষিত হয়েছিল একটি সনদের আকারে (Five Charte Oath)। এই সনদ নতুন সরকারের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ডাইমোরা তাঁদের জমি ও প্রজা সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করেছিলেন তাঁদের জমিদারী এলাকা সরকারী জমি হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। এছাড়া ডাইমোরা স্থানীয় গভর্ণর বা রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের জন্য সরকার ধেকে পেনসনের ব্যবস্থা করে হয়েছিল। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে জমিদারী এলাকাগুলিকে প্রিফেকরার (Prefecture) এ রূপান্তরিত করা হয়েছিল। প্রারম্ভিক পর্বে প্রায় ২৫০টি জমিদারী এলকাকে নতুনভাবে ৭২ টি প্রফেক্চার এবং ৩ টি মিউনিসিপ্যালিটি হিসাবে গঠন করা হয়। পরে ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের প্রিফেক্চার এর সংখ্যা হ্রাস করে ৪৩ করা হয়েছিল।

টিপ্পনী

১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মেইজি নেতা ওকুবো তোসিমিচি (Okubo Toshimichi) কিডো তাকাযোশি (Kido Takayoshi), ইটাগাকি তাইসুকে (Itagaki Taimuke), হিটো হিরোবুমি, ইনৌয়ে কি)Inoue Ki) এবং অন্যনরা একটি প্রতিনিধি সভা গঠনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য ওসাকা শহরে মিলিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনে স্থির হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে একট নির্বাচিত আইননসভা আহ্বানের প্রস্তুতি হিসাজবে বর্তমানে একটি সেনেট সভা স্থাপিত হবে এবং বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ওসাকাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা সরকারীভাবে অণুমোদিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, সম্রাট সেনেট সভাকে সংবিধানের খনসড়া তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে জাপানের সংবিধান রচিত হয়েছিল। এই সংবিধান প্রণয়নের মধ্য দিয়েই জাপানে রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তর পর্বের সমাপ্তি ঘটেছিল। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে জাপানে প্রথম ডায়েট (Diet) এর অধিবেশন আহ্বানের মধ্য দিয়েই নতুন ব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছিল।

৪.৫.১. মেইজি সংবিধান :

১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে জাপানে সাতটি অধ্যায় সম্বলিত মেইজি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, মেইজি সংবিধান রচিত হয় মূলত দুটি আদর্শে অণূসরণে, যথা - সম্রাটের পুনর্বাসনের আদর্শ এবং সামন্ততান্ত্রিক আদর্শ। প্রথম আদর্শ অণুযায়ি সম্রাট বিরাজিত থাকবেন সমগ্র প্রশাসনিক ক্ষমতার এবং যাবতীয় অনুগ্রহ প্রদর্শনের উৎসস্বরূপ। দ্বিতীয় আদর্শ আনুসারে সম্রাটের সংবিধানিক ক্ষমতা সমূহ সম্রাট স্বয়ং প্রয়োগ না করে তাঁর পরিবর্তে প্রয়োগ করবেন তাঁর প্রতিনিধিগণ। যাইহোক, মেইজি সংবিধানে প্রথম অধ্যায়ে সম্রাটের সংবিধানিক পদমর্যাদা ও শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা আলোচিত হয়েছে।এখানে বলা হয়েছে যে, জাপানী রাজবংশ ও জাপানি সম্রাট পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় এবং সম্রাট রাষ্ট্রের চরম শক্তির উৎস ও আধার। সম্রাট বিভিন্ন পরশাসনিক বিভাগের সংগঠন স্থির করবেন, সকল সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের নিয়োগ করবেন এবং তাদের পদচ্যুত করতে পারবেন। তাদের বেতন ও পেনসন নির্ধারণের ক্ষমতাও তাঁর থাকবে। সম্রাট তত্ত্বগত ভাবে হবেন স্থলবাহিনী, ও নৌবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ। এছাড়া ডায়েতের সম্মতিক্রমে সম্রাট আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। এমনকি ডায়েতের অধিবেশন না থাকা কালে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে সম্রাট নিরাপত্তা রক্ষার্থে অর্ডিনান্স জরি করতে পারবেন। তবে সংবিধান প্রদত্ত শাসন ক্ষমতা সম্রাট ইচ্ছামত প্রয়োগ করতে পারতেন না। কাউন্সিল অব মিনিস্টার বা মন্ত্রিসভা এবং প্রিভিকাউন্সিল নামক দুটি সংবিধানিক উদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে সম্রাট তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন। বলাবাহুল্য, সংবিধান প্রবর্তনের আগেই এই দুটি পরিষদ গঠিত হয়েছিল। যাইহোক, সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে এইদুটি পরিষদ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। প্রসঙ্গত

জাপানের সংবিধানিক ব্যবস্থায় একটি নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল ডায়েট নামে প্রতিনিধি সভা। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে এই আইনসভা বা ডেয়েটের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর বর্ণনা আছে। জাপানের আইনসভা ছিল দুই কক্ষ বিশিষ্ট - উচ্চকক্ষ বা House of Peers এবং নিম্নকক্ষ বা House of Representatives। উচ্চকক্ষে সম্রাট পরিবারের সদস্যরা, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও উচ্চপদস্থ অভিজাত শ্রেণী মনোনীত হতেন। নিম্নকক্ষের সভ্যরা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। ডায়েটের অধিবেশনে সম্রাটের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। যাইহোক, সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে জণগণের অধিকার ও কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছিল। এছাড়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যথাক্রমে বিচার বিভাগ ও অর্থনৈতিক বিভাগ নিয়ে আলোচনা রয়েছে এবং শেষ তথা সপ্তম অধ্যায়ে সম্পূরক নিয়মাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য যেসমস্ত অভিজ্ঞ, প্রবীণরা রাজনীতিক রাজদরবারে প্রশাসনিক পরামর্শ প্রদান করতেন তাঁর অভিহিত ছিলেন জেনরো (Genro) নামে। এই জেনরোর জন্য সংবিধান অতিরিক্ত কিছু প্রতিবিধান দেওয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গত নয়জন জেনারোর মধ্যে আটজ ছিলেন সামুরাই শ্রেণির অন্তর্গত এবং এর মধ্যে চারজন করে ছিলেন সাতসুমা ও চোসু গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আর একজন জেনরো ছিলেন অভিজাত বংশীয় (ফুগো)। যাইহোক ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে শেষ জেনরোর মৃত্যুর সাথে সাথে এই প্রথার অবসান ঘটেছিল।

মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাৎপর্য :

মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জাপানে যে রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে জাপানে মেইজি যুগ (১৮৬৮ -১৯১২) এর সূচনা হয়েছিল এবং জাপানের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তণ এসেছিল। মেইজি সরকার যেসব নীতি গ্রহণ করেছিল তার প্রেক্ষিতে জাপানের আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণ ঘটেছিল। যদিও মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পিছনে মুখ্যত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দায়ী ছিল, কিন্তু এর ফল ছিল অনেক বেশি বৈপ্লবিক।

১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে জাপানে যে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে তার অবসান ঘটে। এছাড়া টোকগাওয়া শোগুনতন্ত্রের পতনের সাথে সাথে জাপানে সামন্ততান্ত্রিক যুগের ও অবসান ঘতে এবং সম্রাট মেইজির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে জাপাকনে এক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। মেইজি অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রেক্ষিতে জাপানে দ্রুত শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণ ঘটতে শুরু করে। এরফলে জাপান প্রথমে আঞ্চলিকভাবে পরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী এক রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। বলাবাহুল্য, মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

জাপান পশ্চিমীদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্রুত আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিক হয়েছিল এবং একটা সময় নিজশক্তি বৃদ্ধি করে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সমকক্ষতা অর্জন করেছিল। এরই ফলশ্রুতিতে জাপান পূর্বে যেসমস্ত অসমচুক্তির মাধ্যমে বিদেশী শক্তিগুলিকে অতিরাষ্ট্রীয় অধিকারসহ বিচারসংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করেছিল তা ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত হয়েছিল। সর্বপরি ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে ইঙ্গ জাপান মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে জাপান পশ্চিমী শক্তিবর্গের সাথে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। বলাবাহুল্য, জাপানের সামরিক ও অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণ তার প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলির কাছে সর্বনাশা হয়েছিল। সামরিক শক্তির বৃদ্ধির দরুণ জাপান একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। চীন ও কোরিয়ার কিছু অংশ জাপানেদর উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয় চীন জাপান যুদ্ধে (Sino - Japanese War, 1937 - 45) চীনের বহুক্ষতি ও জীবন নষ্ট হয়েছিল। পশ্চিমীদের মত জাপানও তার উপনিবেশিকের জনজাতির উপর নির্মম আচরণ করত। এছাড়া সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসাবে জ আপান পূর্ব এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। বলাবাহুল্য, রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪ - ১৯০৫) এ জাপানের বিজয় তাকে বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জাপানের সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটেছিল। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে জাপানের নাগরিকদের একতা বড় অংশ বৃহৎ শিল্প সমৃদ্ধ নগরগুলিতে বাস করত। যাইহোক, সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য বিলুপ্ত হয়েছিল এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্যের নানা জিনিস জাপান গ্রহণ করেছিল। এছাড়া জাপানে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এর ফলে জাপানে শিক্ষিত মানুষেদর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। জাপানে কনফুসীয়বাদের পরিবর্তে শোন্টিধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্রাট ছিলেন শিল্টোধর্মের প্রধান।

৪.৫.২. মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রভাব :

মেইজি শাসকরা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাজার অর্থনৈতিক বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য ছিল উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্প স্থাপন। তোকুগাওয়া যুগের শেষ দিকে জাপানে চাল বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত থাকলেও মুদ্রা প্রধান বিনিময়ের মাধ্যমে পরিনত হয়েছিল। বড় দূর্গ শহরগুলিতে ফিয়োটোও ও অন্যান্য জায়গার দক্ষ হস্তশিল্পজাত বস্তুর সমৃদ্ধ ব্যবসা চলত। শিল্পপে শ্রম বিভাজনও পরিলক্ষিত হয়েছিল। এক শ্রেণীর মানুষ কাঁচামাল উৎপাদন করত এবং অপর শ্রেণি তা দিবে শিল্পজাত বস্তু উৎপাদন করত। যদিও এই বিভাজন গৃহস্থালী শিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাণিজ্যিক মূলধণ ব্যবসায়ী ও ফুসীদজীবিদের হাতেই নিবদ্ধ ছিল। ১৮৫৪ খ্রিঃ এ জাপান বৈদেশিক বানিজ্যের জন্য

উন্মুক্ত হওয়ার পর টোফুগাওয়া শোগুনতন্ত্র এবং সাৎসুমা ও চোসু গোষ্ঠীর মতো কিছু গোষ্ঠী জাহাজ নির্মাণ ও অস্ত্র তৈরির মতো সামরিক শিল্পের সূচনা করেছিলেন। বাণিজ্যিক অর্থনীতিরও বিকাশ ঘটেছিল। অনেক ধনী বণিক বিপুল পরিমাণ মুলধন সঞ্চয় করে রেখেছিলেন, যা জাপানের শিল্পায়ন সহায়ক হয়েছিল। অনেক প্রাক্তন ডাইমো বড় অঙ্কের সরকারী পেনসন পেতেন। তাঁদের হাতেও মূলধন সঞ্চিত হয়েছিল এবং তাঁরাও ছিল মুলধন সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তবে ব্যবসায়ী পুঁজিপতিরা যারা পশ্চিমী ধাঁচে শিল্প গড়ে তোলার মতো আর্থিক অবস্থায় ছিল তারা শিল্প স্থাপনে ঝুঁকির কথা চিন্তা করে কিছুটা ইতঃস্তত বোধ করেছিল। তাই সরকার ব্যসায়ীদের কাছ থেকে ঋণ এর মাধ্যমে এবং কৃষকদের কাছ থেকে ভূমি কর রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে মুলধন সংগ্রহ করে শিল্পস্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল। ব্যাক্তিগত পুঁজি মূলতঃ ব্যবসা কিংবা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মধ্যেই লগ্নী করা হয়েছিল, কারণ এটা একইসাথে ঝুঁকিহীন এবং লাভজনক ছিল। শিল্পের সাথে যুক্ত সরকারী নীতি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে শিল্পের বিকাশ ঘটার পর মেইজি সরকার কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর শিল্প জাইবাৎসু নামে পরিচিত কিছু পুঁজিপতি পরিবার গোষ্ঠীর নিকট বিক্রি করতে শুরু করেছিল। সরকারের এই শিল্পনীতির ফলাফল ছিল বিবিধ। প্রথমত, শিল্পের উপর সরকারে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রন হ্রাস পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, শিল্পগত এবং আর্থিক মূলধন এক শ্রেণীর মানুষের হাতেই নিবদ্ধ হয়েছিল। তৃতীয়ত, যদিও জাপানকে বিদেশী মুলধন জোগাড় করতে হয়েছিল, তৎসত্ত্বেও জাপানের অর্থনৈতিক কাঠামো বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ ছাড়াই গঠিত হয়েছিল। এর ফলে চীনের মত জাপানকে বৈদেশিক ঋণ এবং আর্থিক সাম্রাজ্যবাদের শিকার হতে হয় নি।

মেইজি সরকারের ভূমি কর নীতি কৃষকদের উপর ব্যাপক প্রায় ফেলেছিল। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে টোকুগাওয়া শাসনপর্বের তিনটি মুখ্য ভূমিকর নীতির পরিবর্তন করা হয়েছিল। প্রথমত, উৎইপাদিত ফসলের পরিবর্তে জমির বাজারদর বা মূল্যের উপর ভিত্তি করে কর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তিন শতাংশ হারে কর সুনির্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং তৃতীয়ত, দ্রব্যের (বিশেষত চাল) এর বদলে নগদে কর প্রদান করা নির্দিষ্ট হয়েছিল।এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণের প্রেক্ষিতে জমির উপর কৃষকের মালিকাণা স্বত্ত্ব গৃহীত হয়েছিল, কারণ সরকার জমির ব্যাক্তিগত মালিকানাস্বত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিল। ভূমি কর সংস্কারের ফলে সরকার উপকৃত হয়েছিল। সরকার তিন শতাংশ হারে ভূমি কর নির্দিষ্ট করায় সঠিক ও নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা গিয়েছিল। সরকার ভূমিকর বাবদ আয় থেকে শিল্পে লগ্নী করতে পেরেছিল। তবে দরিদ্র কৃষকদের কাছে করের হার বা মাত্রা বেশ উচ্চ ছিল। টোকুগাওয়া যুগে ভূমি করের ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদন কম হলে কর ও কম প্রদান করতে হত। এই ব্যবস্থা কৃষকদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু মেইজি যুগে ফসল উৎপাদন না হওয়ার চরম মুল্য দিতে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

হত কৃষকদের। এই নতুন করব্যবস্থার ফলে ফসল উৎপাদন না হলে কৃষক জমি বিক্রি কিংবা বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছিল। এইসব কৃষকরা ধনী কৃষকদের মজুর হিসাবে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। বলা বাহুল্য মেইজি যুগে কৃষি সংস্কারের লক্ষ্যে অন্যান্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষির জন্য নতন জমির সন্ধান, চাষের জন্য নতুন ধরণের প্রযুক্তি গ্রহণ এবং নতুন ধরণের বীজ এর ব্যবহার প্রভৃতি। এই নতুন পদক্ষেপগুলি গ্রহণের ফলে কৃষিজাত উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এর সাথে সাথে মেইজি যুগে একাধিক কৃষক বিদ্রোহ ও সংঘটিত হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সরকার ভূমিকর হ্রাস করে ২.৫ শতাংশ করেছিল। অণ্যদিকে, জাপানে বেশিরভাগ জমি ধনী কৃষকদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল।

সামরিক সংস্কার :

মেইজি যুগে জাপান জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সমরবাহিনীর আধুনিকীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। মেইজি সরকারের অনেক নেতা সামুরাই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁরা ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সমরবাহিনীর প্রধান ছিলেন। তাই পাশ্চাত্যের সাথে সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল। এছাড়া তাঁরাই এক গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাপানে সম্রাটের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই তাঁরা সরকার পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর গুরুত্বের কথা অনুধাবন করেছিলেন। টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্র এবং সাৎসুমা ও চোসু গোষ্ঠীর মত কিছু পশ্চিমী গোষ্ঠী ইতিপূর্বে যে সমস্ত সামরিক সংস্কার মূলক পদক্ষেপ নিয়েছিল তার মধ্যে দিয়েই জাপানে সামরিক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের সূত্রপাত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, শোগুন একাধিক গোলাবারুদের কারখান স্থাপন করেছিলেন, সাৎসুমা গোষ্ঠীর জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল এবং চোসু গোষ্ঠী ইউরোপীয় ধাঁচে একটা সৈণ্যবাহিনী গড়ে তুলেছিল।

মেইজি যুগে জাপানে সামরিক সংস্কারের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছিল সমকালীন এক শ্লোগানে। এই শ্লোগানটি ছিল 'ফুকোকু কোয়োহেই' এর অর্থ ছিল 'সমৃদ্ধ রাষ্ট্র, শক্তিশালী বাহিনী'। প্রথমদিকে মেইজি সরকারকে সৈণ্যবাহিনীর জন্য পশ্চিমী গোষ্ঠীগুলির উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। তবে শীঘ্র সরকার এক স্বাধীন সেনাবাহিনী সংগঠন করতে শুরু করেছিল। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের নীতি (Conscription law) গ্রহণ করে এক জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করা হয়ে ছিল। এই আইনের মাধ্যমে কুড়ি বছর বয়স্ক শক্তিশালী পুরুষদের সমর বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। স্থির হয়েছিল যে তারা তিনবছর সৈণিক হিসাবে এবং চার বছর সংরক্ষিত সেণা হিসাবে কাজ করবে। এই বাহিনী আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত ছিল এবং ফরাসী সামরিক উপদেষ্টা দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়েছিল। নৌবাহিনীর গড়ে তোলার জন্যেও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। বলাবাহুল্য নৌবাহিনী গড়ে তোলার জন্য ইংরেজ উপদেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল।

মেইজি সরকার ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে টোকিওতে এবং ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ওসাকাতে অস্ত্রাগার তৈরি করেছিল। আধুনিক জাপানি সমরবাহিনীর এক অণ্যতম স্থপতি মাসুজিরো ওমুরা ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে কিয়োটোতে জাপানের প্রথম সামরিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ছিলেন। জাপানি সামরিক শিক্ষানবিসদের ইউরোপ ও আমারিকার সামরিক বিদ্যালয় প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছিল। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামাগাতা আরিতোমো ও সাইগো সুগুমিচি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন Corps of the Imperal Guard' এখানে সাৎসুমা, চোসু ও তোসা গোষ্ঠী থেকে সেনা নিয়োগ করা হত। যাইহোক, একইবছর যুদ্ধ কার্যালয় পরিবর্তীত হবে যুদ্ধ দপ্তর ও নৌদপ্তর পরিণত হয়েছিল। সম্রাট তত্ত্বগতভাবে সেণাবাহিনী অধ্যক্ষ ছিলেন।

মেইজি যুগে জাপানি সমাজে পুরারণ শ্রেণীবিন্যাসের অবলুপ্তি এবং সকলের সেণাদলে বাধ্যতামূলক যোগদান এদর মত সংস্কার জণগণের সমর্থন পায়নি। বাথভতামূলকভাবে সেণাদলে যোগদানের নীতিতে কৃষকরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তাই এই পদক্ষেপ গ্রহণের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহী হয়েছিল। একই ভাবে সামুরাইরাও তাদের সামরিক মর্যাদা ও শ্রেণীগত সুবিধা হারানোর ফলে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। বলাবাহুল্য, জাপানে শোগুণতন্ত্রের উচ্ছেদের পিছনে আন্দোলনকারিদের মূল শ্লোগান ছিল 'সোন্ন-জো-ই'। অর্থাৎ সম্রাটকে শ্রদ্ধা কর এবং বিদেশীদের বিতাড়িত কর। তাই কিছু মানুষের মনে হয়েছিল পাশ্চাত্যের অনুকরণে জাপানের সমাজ জীবনের দ্রুত পরিবর্তণ 'বিদেশীদের বিতাড়িত কর' (জো-ই) এই ভাবাদর্শের বিরোধী ছিল। অথচ তারা এই ভাবাদর্শে অণুপ্রানীত হয়েই শোগুণতন্ত্রের উচ্ছেদ করেছিল। সকল শ্রেণির যোগ্য নাগরিকদের সেনাদলে যোগদানের নীতি সমাজে সমুরাই শ্রেণীর অস্তিত্বকেই অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছিল। ফলতঃ সামরিক সংস্কারের প্রেক্ষিতে অনেক সামুরাই তাদের জীবিকা হারিয়েছিল। এবং বিদ্রোহী হয়েছিল। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এটো সিমপেই ও সিমা যোশিটাকে এর নেতৃত্বে পরিচালিত সাগা বিদ্রোহ এবং ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত সিনপুরেন বিদ্রোহ ছিল সামুরাইদের বিদ্রোহের অণ্যতম দৃষ্টান্ত। বলাবাহুল্য সিনপূরেন বিদ্রোহ অন্যান্য বিদ্রোহকে উৎসাহিত করেছিল এবং এর ফলে স১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে আকিজুকি বিদ্রোহ দেখা দিবেছিল। এমনকি রাজরক্ষীরাও বিদ্রোহ করেছিল।

যাইহোক, এই সব বিদ্রোহকে দ্রুত দমন করা হয়েছিল। জাপানের আধুনিক সামরিক বাহিনী গঠনের এক অণভতম স্থপতি এবং পরবর্তিকালে জাপানে সমরমন্ত্রী ইয়ামাগাতা আরিটিমো নতুন জাতীয় বাহিনীর আনুগত্যের প্রতি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তাই ১৮৮০-র দশকে সামরিক বাহিনীর পুণর্গঠন করা হয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের পর সেনাবাহিনীকে জার্মাণ উপদেষ্টা দ্বারা প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল। এছাড়া সেণাবাহিনীকে দৃঢ় শৃঙ্খলা এবং কঠোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। পূর্বে সম্রাট সামরিক ব্যাপারে অসামরিক আধিকারিকদের সাহায্য নিতেন। কিন্তু এখন যুদ্ধ

টিপ্পনী

দপ্তর এবং সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকরাই সামরিক ব্যাপারে সম্রাটকে পরামর্শদাতার ভূমিকা গ্রহণ করে। সেণাবাহিনীর মধ্যে আনুগত্যের ধারণাকে দৃঢ় করার জন্য পুরনো সামুরাই শ্রেণীর শৌর্য, বীরত্বের ধারনাকে তুলে ধরা হয়েছিল। এছাড়া সম্রাটের প্রতি সেনাবাহিনীর প্রশ্নাতীত আণুগত্য বজায় রাখার জন্যয় ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামগাতা নামে একগুচ্ছ নির্দেশীকা জারি করেছিলেন।

টিপ্পনী

অগ্রগতি পরিমাপ কর :

৯. ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জাপান সরকার কোন দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল?

১০. মেইজি সংবিধান কবে প্রবর্তিত হয়েছিল ? এই সংবিধানে কতকগুলি অধ্যায় ছিল ?

১১. মেইজি সংবিধান কিসের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল ?

১২. জাপানের দ্রুত পরিবর্তণের পিছনে যেসব কারণ দায়ী ছিল, তার মধ্যে দুটি কারণ উল্লেখ কর।

৪.৬. সংক্ষিপ্তসার :

- রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ইতালি এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইতালি খন্ড বিখন্ড হয়ে যায় এবং আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপূর্ণ এক ভৌগলিক সত্তায় পরিণত হয়।
- মধ্যযুগে ইতালিতে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহরগুলির মধ্যে ছিল মিলান, ভেনিস, জেনোয়া ও ফ্লোরেন্স। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এই নগরগুলি প্রাচীন কালের গ্রীক নগরগুলির ন্যায় স্বশাসনের অধিকার আদায় করে নিয়েছিল।
- পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সাথে ইতালির একটা ক্ষীণ যোগসূত্র ছিল।বলাবাহুল্য, কিছু ইতালীয় দেশপ্রেমীদের অদম্য আকাঙ্খা এবং সাধারণ ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটা সত্ত্বেও একটা রাজতন্ত্রের অধীনে ইতালির রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি।
- ইতালিতে রাজনৈতিক ঐক্যের অভাবে পিছনে যে কারণগুলি দায়ী ছিল, তা হল (ক) মধ্যযুগীয় জার্মাণ সম্রাট ইতালির উপর প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি সফল হন নি। যদিও এর প্রেক্ষিতে ইতালিতে দুটি পরস্পর বিরোধী সংঘাতকারী দলের সৃষ্টি হয়েছিল। (খ) রোম ও তার প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে পোপ একইসাথে ধর্মীয় ও পার্থিব সমস্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোগ করতেন। (গ) ইতালির নগরগুলির বাণীজ্যিক বিকাশ নগরগুলির মধ্যে বানিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি করেছিল।

- নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অধীনস্থ ইতালি রাজ্যে উত্তর ও মধ্য ইতালির নগররাস্ট্রগুলির শাসনভার অর্পিত হয়েছিল নেপোলিয়নের সৎপুত্রের উপর।
- নেপোলিয়ন ইতালিতে এক আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন এবং এর ফলশ্রুতিতে ইতালিবাসীর উদারনীতিবাদ ও স্বাধীনতার আদর্শের সাথে পরিচিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য নেপোলিয়নীয় ভাবধারার অনুপ্রবেশের ফলেই ইতালিতে 'কার্বোনারী' (জ্বলন্ত অঙ্গার) নামে এক গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমিতির লক্ষ্য ছিল বিদেশী নিয়ন্ত্রণ থেকে ইতালির মুক্তি এবং সংবিধানিক সরকার গঠন।
- নেপোলিয়নের পতনের পর ৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ভিয়েনা বন্দোবস্ত মারফৎ ইতালির উপর সার্বিকভাবে অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের পর ইতালিতে একমাত্র সার্ভিনিয়া পিডমন্ট রাজ্যেই আধুনিক উদারনৈতিক রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।এর পিছনে মুখ্য অবদান ছিল কাউন্ট ক্যামিলো ডি কাভুর এর। ১৮১০ খ্রিনষ্টব্দে পিডমন্টের এক অভিজাত পরিবারে জন্ম হয়েছিল।
- দক্ষিণ ইতালিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন যোসেফ গ্যারিবল্ডী (১৮০৭ -১৮৮২)। গ্যারিবল্ডী ছিল নিস এর অধিবাসী এবং তিনি সার্ডনিয়ার নৌবাহিনীতে নাবিক বৃত্তি করতেন।
- ঊনবিংশ শতকে ইতালির মত জার্মানিতে রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব ছিল। ষোড়শ শতকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য জার্মানভাষী মানুষজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। যদিও তত্ত্বগতভাবে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে খ্রিষ্টীয় শাসকবৃন্দ ও জনগণের উপর পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক আধিপত্য ছিল।
- নেপোলিয়নীয় যুগে স্বাধীন জার্মাণ রাজ্যের সংখ্যা তিনশ থেকে কমে ঊনচল্লিশটি হয়েছিল।
- নেপোলিয়নের পতনের পর ভীয়েনা সম্মেলনে জার্মানীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পুনঃস্থাপন বা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করা হয় নি। বরং ভিয়েনা বন্দোবস্ত অনুযায়ী ৩০ টি রাজ্য নিয়ে জার্মাণ রাষ্ট্রসংঘ এবং 'ডায়েট' নামে এক প্রতিনিধি সভা গঠন করা হয়েছিল।
- বিসমার্ক ছিলেন প্রাশীয়ার এক ভূস্বামী (জাঙ্কার) অভিজাত পোরিবারের সন্তান। তিনি অভিজাত তন্ত্রের ঐতিহ্য নিয়েই লালিত পালিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মধ্যে স্বদেশপ্রেম ছিল গভীর।
- ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো প্রুশীয় যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল।এই যুদ্ধে ফ্রান্সের পক্ষে মিত্র

টিপ্পনী

জোগাড় করা সম্ভব হয় নি । কারণ,স্যাভোয়ার পরে প্রাশীয়া অস্ট্রিয়ার প্রতি বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করায় অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সমর্থনে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে প্রস্তু ছিল না।

- হ্যুং শিউ চুয়ান (১৮১৪ - ১৮৬৪) নামে চীনের কোয়াংট্যাং প্রদেশের একজন হাক্কা কনফুসীয় পন্ডিত ছিলেন তাইপিং বিদ্রোহের নেতা।

টিপ্পনী

- তাইপিং বিদ্রোহীদের প্রায় সমস্ত নীতি এবং কর্মপন্থা মাঞ্চুদের থেকে আলাদা ছিল। মাঞ্চুরা যেখানে চিরাচরিত চৈনিক ঐতিহ্যের অনুসারী ছিল সেখানে তাইপিংরা ছিল এর বিরোধী।
- কনফুসীয় নীতি অনুসারে মৃত সম্রাটের পত্নী জু-আন ও বালক সম্রাটের মাতা জু-সি, যারা বিধবা সাম্রাজ্ঞী নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের হাতেই স্বাভাবিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল। যদিও মৃত সম্রাটের উপপত্নী হওয়ায় রাজপরিবারে জু-সির মর্যাদা জু-আন এর থেকে কম ছিল।
- সম্রাট তুংচির মৃত্যুর পরক জু-সি তাঁর এক ভগিনীর চারবছরের পুত্রকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই নতুন সম্রাট 'কোয়াং সু' (শাসনকালে ১৮৭৫ - ১৯০৮) উপাধি নিয়ে চীনের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। যাইহোক, এইভাবে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জু-সি প্রায় চল্লিশ বছর চীনে শাসন করেছিলেন।
- মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলশ্রতিতে জাপানে শোগুন ও সম্রাটের দ্বৈতশাসনের ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটেছিল । সম্রাটই দেশের প্রকৃত অধীশহবর হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিলেন।
- ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে জাপানে সাতটি অধ্যায় সম্বলিত মেইজি সংবনিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য মেইজি সংবিধান রচিত হয় মূলতঃ দুটি আদর্শের অণূসরণে, যথা সম্রাটের পুনর্বাসনের আদর্শ এবং সমন্ততান্ত্রিক আদর্শ।
- মেইজি শাসকরা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাজার অর্থনৈতিক বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য ছিল উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্প স্থাপন।
- জাপানের দৈনন্দিন জীবনেও পাশ্চাত্যকরণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। নতুন সরকার ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে জাপানের পুরনো শ্রেণীবিভক্ত সামাজিক কাঠামোর অবলুপ্তি ঘটিয়েছিল । এছাড়া ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে সরকার সকল যোগ্য নাগরিকের বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদানের নীতি এবং ডাইমোদের দুর্গগুলি ধ্বংস করার নীতি গ্রহণ করেছিল।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
194

- সময়ের অগ্রগতির সাথে মেইজি সংস্কার এবং পাশ্চাত্য করণ সুফল দিয়েছিল ।

এরই প্রেক্ষিতে কয়েকদশকের জাপান এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে তার পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

৪.৭. শব্দপরিচিতি :

যোসেফ ম্যাৎসিনি : ম্যাৎসিনি ছিলেন ইতালির এক জনপ্রিয় রাজনীতিক, সাংবাদিক এবং ইতালির ঐক্য আন্দোলনেদর গুরুত্বপূর্ণ নেতা।

কাউন্ট ক্যামিলো ডি কাভুর : কাউন্ট কাভুর ছিলেন ইতালির বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্। ইতালির ঐক্য আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালণ করেছিলেন।

অটোফন বিসমার্ক : বিসমার্ক ছিলেন প্রাশীয়ার এক রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ্। জার্মাণী ও ইউরোপীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল।

তাইপিং বিদ্রোহ : তাইপিং বিদ্রোহ ছিল একাধারে কৃষক বিদ্রোহ, নতুন ধর্মীয় জাগরণ এবং মাঞ্চু বিরোধী আন্দোলন। এই বিদ্রোহকে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধও বলা যায়।

হ্যুং-শিউ চুয়ান : হাক্কা কনফুসীয় পন্ডিত হ্যং শিউ চুয়ান ছিলেন চীনে তাইপিং বিদ্রোহের নেতা। তিনি চিংবংশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন।

মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা : মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল ১৮৬৬ -৬৯ খ্রিষ্টাব্দে জাপানে সংঘটিত এক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব। এর প্রেক্ষিতে জাপানে শোগুনতন্ত্রের পতন ঘটেছিল এবং সম্রাটের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৪.৮. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী :

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১. ইতালির ঐক্যের অভাবের মুল কারণগুলি আলোচনা কর?

২. ইতালির ঐক্য আন্দোলনে যোসেফ ম্যাৎসিনি কি ভূমিকা নিয়েছিলেন?

৩. দক্ষিণ ইতালির ঐক্য আন্দোলন ও গ্যারিবল্ডীর ভূমিকা আলোচনা কর।

৪. তাইপিং বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন? তাইপিং বিদ্রোহের গুরুত্ব আলোচনা কর।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর :

১. ইতালিতে কাউন্ট কাভুরের উত্থান আলোচনা কর।

২. জার্মাণি ঐক্য আন্দোলন বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

৩. জার্মাণী ও ইতালির ঐক্য আন্দোলনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর।

৪. বিসমার্ক কে ছিলেন? তিনি কিভাবে ক্ষমতায় উত্তরণ করেছিল?

৫. মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাৎপর্য আলোচনা কর। এর প্রভাব কি ছিল

টিপ্পনী

NOTES

NOTES

NOTES